ইন্টারনেট সংস্করণ: www.ekashtipathar.com

প্রথম বর্ষ □ সপ্তম সংখ্যা □ ১৬ নভেম্বর ২০১২ □ ৩০ টাকা

কালের কষ্টিপাথর

বাঙালিমননে নবতরঙ্গ

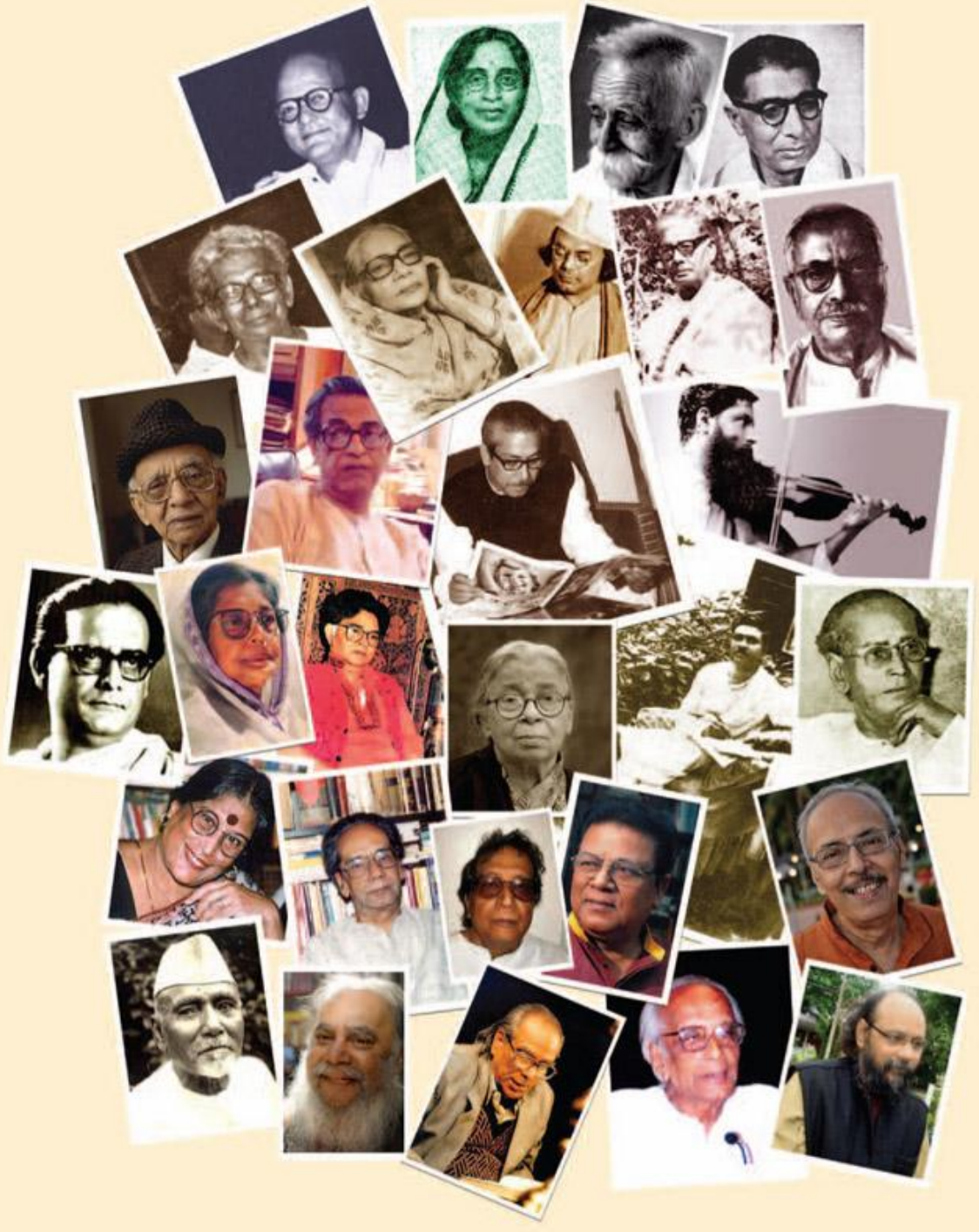

ছোটদের জন্মদিনে শ্রেষ্ঠ উপহার

ছেলেবেলা

- ✓ বাড়ির ছোটদের বা তাদের বন্ধুদের সামনের জন্মদিনেই আগামী একবছরের জন্য প্রতি মাসের 'ছেলেবেলা' উপহার দিতে পারেন।
- ✓ একবছরের গ্রাহকমূল্য (ডাকব্যয় সহ) ১৫০ টাকা (ক্যুরিয়ারে পেতে চাইলে ২৬০ টাকা) চেকে বা মানি অর্ডারে Swarnakshar Prakasani Pvt. Ltd.-এর নামে নীচের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিলে আমরাই উপহার প্রাপকের নাম লেখা গিফট কার্ড সহ 'ছেলেবেলা' পাঠাবার ব্যবস্থা করব।
- ✓ চেকের সঙ্গের চিঠিতে বা মানি অর্ডার ফর্মের একেবারে নীচের দিকে আপনার নাম-ঠিকানা আর উপহার প্রাপকের নাম ও জন্মতারিখ অবশ্যই লিখে দেবেন। উপহার প্রাপকের ঠিকানা অন্য হলে তার ঠিকানাও লিখতে হবে।
- ✓ যে মাসে জন্মদিন তার অন্তত একমাস আগে আমাদের দপ্তরে টাকা পৌঁছতে হবে। চেক বা মানি অর্ডার পাঠাবেন এই ঠিকানায়:

Swarnakshar Prakasani Pvt. Ltd.
29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-700 019

Subscribe online: www.swarnakshar.in

ফোন: ২২৮০ ৮৮১৮ **ফ্যাক্স:** ২২৮৭ ৬৪৪৮ **ই-মেল:** chhelebela@swarnakshar.in

অনলাইন গ্রাহক হতে www.swarnakshar.in লগ অন করুন

www.ekashtipathar.com

কালের কষ্টিপাথর

বাংলার নতুন পাক্ষিক ● বাঙালিমননে নবতরঙ্গ

পশ্চিমবাংলা, আসাম ও ত্রিপুরায় বইয়ের দোকানে
এবং পত্রিকাস্টলে পাওয়া যাচ্ছে।

এখন কলকাতায়ও সর্বত্র পাবেন
প্রতি সংখ্যা ৩০ টাকা

ঘরে বসে নিয়মিত পত্রিকা
পেতে অনলাইন গ্রাহক হোন
www.swarnakshar.in

এক বছরের ২৪টি সংখ্যার গ্রাহকমূল্য ৭০০ টাকা চেকেও পাঠাতে পারেন। এই নামে, এই ঠিকানায়:
Swarnakshar Prakasani Pvt. Ltd.
29/1-A, Old Ballygunge Second Lane, Kolkata-700 019

স্বর্ণাক্ষর

Phone: 2280 8818, 2283 2320 **Fax:** 2287 6448 **E-mail:** kashtipathar@swarnakshar.in **Website:** www.swarnakshar.in

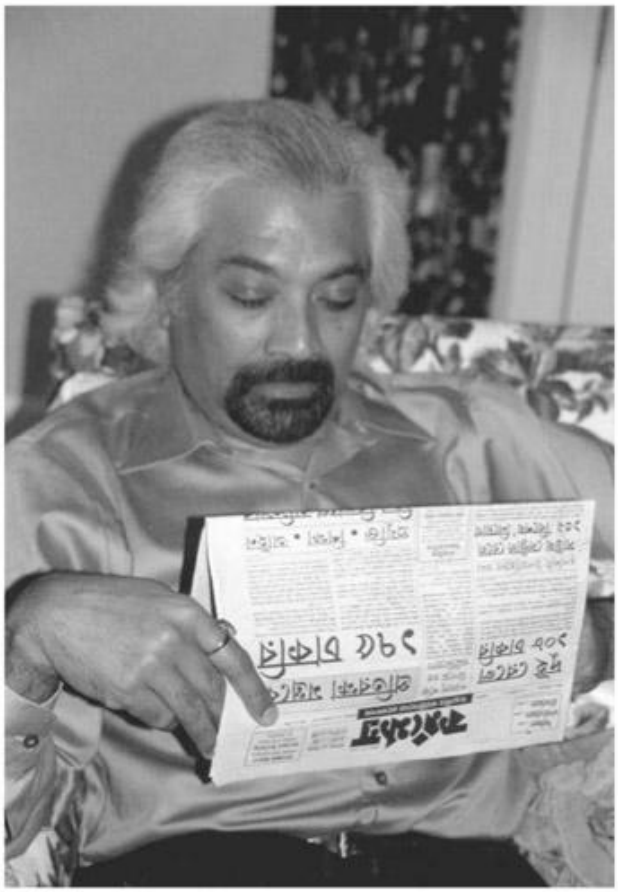

সাম পিত্রোদা: আমেরিকার ওয়ার্ল্ড টেল লিমিটেডের কর্ণধার, অঁত্রেপ্রেনারশিপ ও টেলি-কমিউনিকেশনস্-এ বিশ্ববন্দিত ব্যক্তিত্ব। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের বিভিন্ন কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা। ভারত সরকারের টেলিকম কমিশনের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান। 'রিসার্জেন্স অব বেঙ্গল' কর্মসূচির উপদেষ্টা।

'একবার ভেবে দেখুন গোটা ভারতকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করতেই কত রকম যোগ্যতার কত লোকের দরকার। এরকম আরও নানা ক্ষেত্রে, ধরুন কৃষিনির্ভর শিল্প ফুড প্রসেসিংয়ে, লক্ষ লক্ষ কাজ আছে। আপনি 'কর্মক্ষেত্র'-য় প্রকাশিত যেসব কর্মপরিকল্পনার কথা বললেন, যেমন পাকা তেঁতুল প্যাকেট করা, বা তরমুজের রস বোতলবন্দী করা, কিংবা পাটের জিনিসপত্র বানানো— এগুলো তো গ্রামে গ্রামে শুরু হওয়া দরকার। উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ, বিপণন ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইনফরমেশন টেকনোলজির সুফল এইসব কাজেও প্রয়োগ করা উচিত। সরকারের ভূমিকা এইখানেই। আর পরিকাঠামো জোগানোয়। বাকি সব নিজেদেরই করতে হবে। কাজের জাত বিচার করে যাঁরা বসে থাকবেন তাঁদের জীবন নিয়ে ভাবনায় কোনও ভুল হচ্ছে কি না সেটাই আগে ভাবা দরকার।'

৫ জুলাই, ২০০১-এ বস্টনে একান্ত সাক্ষাৎকারে 'কর্মক্ষেত্র'-র প্রধান সম্পাদককে সাম পিত্রোদা

কর্মক্ষেত্র

বাঙালির কর্মজীবনের প্রবেশপথ

ইন্টারনেটে কর্মক্ষেত্র: www.ekarmakshetra.com

Subscribe Online:
www.swarnakshar.in

ইন্টারনেট সংস্করণ: www.ekashtipathar.com

কালের কষ্টিপাথর

প্রথম বর্ষ। সপ্তম সংখ্যা। ১৬ নভেম্বর ২০১২। ৩০ কার্ত্তিক ১৪১৯

সূ চি প ত্র

স্ম র ণ

সুনীলকে নিয়ে এখন লেখার সময় নয় : উৎপলকুমার বসু ৯
সুনীল আকাশ : বেলাল চৌধুরী ১০
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়-এর প্রতি : হিন্দোল ভট্টাচার্য ১২
নীরাকে নিবেদিত : কৌশিক বন্দ্যোপাধ্যায় ১২

বর্ণময় সিরাজ : শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় ২১
কণ্ঠস্বরের দার্ঢ্য আজও কানে বাজছে : অমরেন্দ্র চক্রবর্তী ২৪

কেন লিখি : জ্বলদর্চি সংকলন ২৬

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ■ মহাশ্বেতা দেবী ■ সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ
শঙ্খ ঘোষ ■ অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ■ অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ■ শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় ■ বুদ্ধদেব গুহ
পবিত্র সরকার ■ সুবোধ সরকার ■ অনিল ঘড়াই

আলোকপাত ১৯
ই এম ফরস্টারের রবীন্দ্রনাথ : নিত্যপ্রিয় ঘোষ

যে কথা বলা হয়নি। পর্ব ৭। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ
বটুকদা, শেরজঙ্গ, বন্যকুক্কুট ও মার্কস ২২

মহাজনসঙ্গ। পর্ব ১৩। অমিতাভ চৌধুরি
নীহাররঞ্জন রায় ৩৭

বরণীয় লেখকের স্মরণীয় সঙ্গ। পর্ব ৭। সবিতেন্দ্রনাথ রায়
দাদাঠাকুর শরৎচন্দ্র পণ্ডিত ৪৮

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কে লেখা চিঠি। পর্ব ৭।
মৃণাল সেন ■ নবনীতা দেব সেন ■ হুমায়ূন আহমেদ ■ সোমনাথ হোর
শামসুর রাহমান ■ জয় গোস্বামী ■ বাণী বসু ■ প্রবোধচন্দ্র সেন ১৩

কাজের বাংলা। পর্ব ৭। সুভাষ মুখোপাধ্যায় ৭৭

আমলাহি। পর্ব ৭। তপন বন্দ্যোপাধ্যায়
ছোটলোক-বড়লোক ৮০

হেঁয়ালির ছন্দ। পর্ব ৭। দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ৯৬

কবিতা-পরিচয়। পর্ব ৭
'সুন্দর': শঙ্খ ঘোষ ৬৭
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ■ অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত
কবিতা-পরিচয় প্রশ্নমালা, কবির উত্তর ■ তুষার রায় ৭১

ক বি তা র পা তা

আমি কী চোখে দেখি শালাকে : সুবোধ সরকার ৭২
সুবোধ সরকারের স্বনির্বাচিত সাতটি কবিতা ৭২
পিয়াস মজিদের ছ'টি কবিতা ৭৫
সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নবীন কবিতা ৭৬

ধা রা বা হি ক

আমার ছবিজীবন। পর্ব ৩। **শুভাপ্রসন্ন** ৬০
একাত্তরের দিনগুলি । পর্ব ৭। **জাহানারা ইমাম** ৩৯
গীতবিতান ছুঁয়ে বলছি। পর্ব ৭। **সমরেশ মজুমদার** ৪৫
বিষাদগাথা। পর্ব ৭। **অমরেন্দ্র চক্রবর্তী** ৫৫
নেকড়ের চোখ। পর্ব ৫। **দানিয়েল পেনাক** ৯২
অনুবাদ মৈত্রেয়ী নাগ

ভ্র ম ণ ক থা

আসমুদ্রককেশাস। পর্ব ৬। অমরেন্দ্র চক্রবর্তী ৮৭

নি য় মি ত

সম্পাদকীয় ৫ চিঠি ৬ ক্ষণের বচন ৮ শব্দবক্র ৮ সাহিত্যের খবর ৮৫
খোলা খাতা ৮২
আজকের বাঙালির বাঙালিয়ানা : অমিত কুশারী
বই-ঠেক ৮৩
দ্য ব্রাদার্স কারামাজভ। আলোচক: মৈত্রেয়ী নাগ
পুরনো অ্যালবাম ৫৪

কালের কষ্টিপাথর

সম্পাদক : অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

২৯/১-এ, ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৯
ফোন: সম্পাদকীয় বিভাগ: ২২৮৩-৫৫২৬
বিজ্ঞাপন ও সার্কুলেশন: ২২৮৩-২৩২০, ২২৮০-৮৮১৮
ফ্যাক্স: ২২৮৭-৬৪৪৮ E-mail: kashtipathar@swarnakshar.in
Website: www.swarnakshar.in

স্বর্ণাক্ষর প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে অমরেন্দ্র চক্রবর্তী কর্তৃক, স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস প্রাঃ লিঃ, দোলতলা, দোহারিয়া, পোঃ গঙ্গানগর, উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা- ৭০০ ১৩২ থেকে মুদ্রিত ও ২৯/১-এ, ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৯ থেকে প্রকাশিত।
Published for Swarnakshar Prakashani (P) Ltd. by Amarendra Chakravorty at 29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-700 019 and Printed by him at Swapna Printing Works (P) Ltd., Doltala, Doharia, P.O. Ganganagar, North 24 Parganas, Kolkata-700 132.

স্বর্ণাক্ষর প্রকাশনীর বই, পত্রিকা, ভ্রমণ-ভিসিডি

Buy Online ▸ www.swarnakshar.in

তুতুল
মহাশ্বেতা দেবী

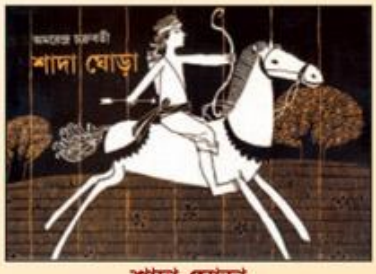

শাদা ঘোড়া
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

চলো দেখে আসি
কানাইলাল চক্রবর্তী

আমাজনের জঙ্গলে
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

গৌর যাযাবর
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

হীরু ডাকাত
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

কথামালা: ছড়ায় ঢালা
পবিত্র সরকার

বকবকম
সুভাষ মুখোপাধ্যায়

সেরা ভ্রমণ কাহিনী
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত

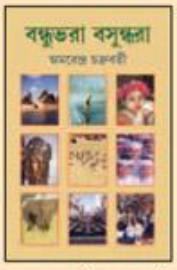

বন্ধুভরা বসুন্ধরা
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

ইছামতীর মশা
শঙ্খ ঘোষ
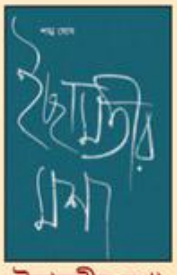
ভ্রমণের নবনীতা
নবনীতা দেব সেন

দুচাকায় দুনিয়া
বিমল মুখার্জি

দেশে দেশে
প্রতাপকুমার রায়

সুইজারল্যান্ডের পাঁচ পাহাড়ে
দক্ষিণ থাইল্যান্ড

Read / Subscribe Online ▸ www.swarnakshar.in

ভ্রমণ

ছেলেবেলা

To be launched shortly

পেশাপ্রবেশ

কর্মক্ষেত্র

স্বর্ণাক্ষর

স্বর্ণাক্ষর প্রকাশনী প্রাঃ লিঃ, ২৯/১-এ, ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৯
ফোন: ২২৮৩-২৩২০ ফ্যাক্স: ২২৮৭-৬৪৪৮ ই-মেল: books@swarnakshar.in
ওয়েবসাইট: www.swarnakshar.in • www.bhraman.com
www.ebhraman.com • www.echhelebela.com • www.ekarmakshetra.com

আরও অনেক বই, পত্রিকা ও ভিসিডি-র জন্য লগ ইন করুন: www.swarnakshar.in

কবি যদি দুঃখ পায়, কলকাতাও দুঃখ পেতে থাকে।
শক্তি চট্টোপাধ্যায়

উৎসর্গ

দেবেশ রায়

তিস্তাপারের মহাকাব্য থেকে মানুষের জীবনচরিতে প্রবেশের পথ দেখিয়ে আপনি বাঙালির চিরসাহিত্যসঙ্গী হবার গৌরব অর্জন করেছেন। এই সংখ্যার 'কালের কষ্টিপাথর' আপনাকে উৎসর্গ করে আমরা ধন্য।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় এমন বহুধাবিস্তৃত ও প্রবল প্রাণচ্ছটাময় হয়ে আমাদের মধ্যে ছিলেন যে তাঁর সহজ স্বতঃস্ফূর্ত ভালোবাসার স্মৃতি বহুদিন বহুজনের মনে অক্ষয় হয়ে থাকবে। বর্তমান লেখকের সামান্য জীবনেও এমন অনেক অসামান্য ঘটনার স্বাক্ষর ধরা আছে। তরুণ প্রজন্মের কবি ও অসংখ্য লিটল ম্যাগাজিনের সম্পাদক তো তাকে নিত্য নতুন করে হারাবেন। কিছুদিন কেউ কেউ হয়তো অভ্যাসবশে ফোনে লেখার আবদার জানাতে গিয়ে আচমকা থেমে যাবেন কিংবা আর কখনওই ফোন বা সাক্ষাৎ সম্ভব নয়— এই দুর্বিষহ খেয়ালে মর্মাহত হবেন।

লেখকের প্রকৃত জন্ম তাঁর মৃত্যুর পরে জেনেও সুনীলসান্নিধ্যধন্যদের মনের শূন্যতাবোধ অচিরে নির্মূল হবার নয়।

লেখকের জন্মের অনুষঙ্গে অন্য একটি ঘটনার অবতারণা এখানে কিছুটা বাহুল্য হলেও পুরোটা বাদ দিতে পারলাম না।

ঘটনাটা এই।

যতদিন লিখেছেন বছরে একটি করে উপন্যাস লিখেছেন এমন একজন সচেতন, স্বল্পালোচিত লেখক রমাপদ চৌধুরী তাঁর কর্মজীবনে রবিবাসরীয় আনন্দবাজারে খ্যাত-অখ্যাত অসংখ্য লেখকের ছোটগল্পের মধ্যে 'ধুলো' নামেও একটা গল্প ছেপেছিলেন। কিছুদিনের মধ্যেই কিঞ্চিৎ প্রশংসা রটবার সংবাদ জানিয়ে রবিবাসরীয় সম্পাদক গল্পটির অখ্যাত লেখককে বলেছিলেন, 'কবিতা-টবিতা ছেড়ে শুধু গল্প লিখুন।'

'গল্প লিখলে ছাপবে কে?' বলে সেই অর্বাচীন লেখক তার সমসাময়িক লেখক-বন্ধুদের কয়েকজনেরই গল্পসংকলনের পাণ্ডুলিপি নিয়ে প্রকাশকের দরজায় নিষ্ফল ঘোরাঘুরি, আবার অন্যদিকে প্রথিতযশা প্রবীণতম কবির লিখিত-প্রশংসাধন্য, সে-বছরের রবীন্দ্র-পুরস্কৃত, একটি প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার ও অচিরেই বিস্মরণযোগ্য এক লেখকের বইয়ের বিপুল প্রচারের উল্লেখ করে প্রকাশনার পক্ষপাতদুষ্ট পরিবেশ ব্যাখ্যা করায় রমাপদ চৌধুরী গভীর বিশ্বাস নিয়ে বলেছিলেন, 'লেখকের মৃত্যুর পর কে কোথাকার কর্ণধার বা কে কিসের বর্মধারী সব তুচ্ছ হয়ে যায়, কোথাও তার কোনও চিহ্ন থাকে না, থাকে শুধু কয়েকটা ছাপা অক্ষর।'

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় কয়েকটা নয়, কয়েক সমুদ্র ছাপা অক্ষর রেখে গেলেন।

শোক ও স্মৃতিচারণের শেষে অমরত্বে অবিশ্বাসী এই লেখকের রেখে যাওয়া অক্ষরসমুদ্রে অনেকেই নিশ্চয় ডুবুরি হবেন। শুধু সুনীলের এই যুগেই নয়, পরবর্তী যুগেও। বাংলা সাহিত্যে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রকৃত অবদান বা অমৃতমন্থন স্পষ্ট হতে সেইসময় তো লাগবেই।

সাহিত্যের চিরকালীন পাঠক ততক্ষণ অপেক্ষা করে থাকবে।

আপাতত দুই বাংলার হৃদ্বিজয়ী, দশভুজ লেখক, আমাদের প্রিয় কবি ও শার্টের বোতামের মতোই হৃদয়ের কপাটখোলা, স্বাধীনচিত্ত, স্পষ্টভাষী, সাহিত্যসংগ্রামী মানুষটিকে শোকভারাক্রান্ত হৃদয়ে আমরা বিদায় জানাই।

চিঠি

দুই কবির সেতুবন্ধ

বিকাশ দাসের চিঠি

'কালের কষ্টিপাথর' (প্রথম বর্ষ: ষষ্ঠ সংখ্যা)-এ 'কবিতা-পরিচয়' বিভাগে বিনয় মজুমদার আলোচিত জীবনানন্দ দাশ-এর 'অদ্ভুত আঁধার এক' প্রসঙ্গে একটা কথা আপনাকে জানাতে চাই।

আজ থেকে প্রায় বছর চল্লিশ আগে বিষ্ণুপুর রামানন্দ কলেজের ছাত্রী আমার নাতনিকে Yeats'-এর 'The Second Coming' কবিতাটা একটু বুঝিয়ে দিতে গিয়ে হঠাৎই খেয়াল হল, আরে, জীবনানন্দের 'অদ্ভুত আঁধার এক'-এর সঙ্গে আশ্চর্য মিল।

তখন দুটি কবিতাই আবার ভালো করে পড়ে বুঝলাম জীবনানন্দ-এর কবিতাটি Yeats'-এর 'The Second Coming' প্রাণিত লেখা।

তারপর তা নিয়ে একটি আলোচনা লিখি, অনেক পরে স্থানীয় একটি পত্রিকায় তা ছাপা হয়।

আমার আরও আশ্চর্য মনে হয়েছে যে জীবনানন্দ দাশ-এর কবিতাটি যে Yeats'-এর কবিতা দ্বারা প্রাণিত তা কোনও সমালোচকই আজ পর্যন্ত খেয়াল করলেন না।

আপনার যদি জানা থাকে যে কেউ খেয়াল করেছেন কিংবা তা নিয়ে আলোচনা করেছেন, তা হলে অনুগ্রহ করে জানাবেন।

আমার বয়স বর্তমানে ৮৪, ডি ভি সি-তে কাজ করতাম, ১৯৮৭ সালে অবসর নিই। '৮৮ সালে শেষবার হিমালয়ে যাই ('৫৫ থেকে '৮৮— ৩৩ বার হিমালয় ভ্রমণ করি)।

বর্তমানে অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর সৌজন্যে মানস-ভ্রমণ করি।

দেওয়ানবাটি, গড়দরজা, পোঃ বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া-৭২২ ১২২

■ *যতদূর মনে পড়ছে, অরুণকুমার ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'উত্তরসূরী' পত্রিকার কোনও সংখ্যায় এ-বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছিল। যদি না ভুল হয়, এই প্রবন্ধের লেখক ছিলেন অশ্রুকুমার সিকদার।* —**সম্পাদক**

শুভা

বেলাল চৌধুরীর চিঠি

'কালের কষ্টিপাথর'-এ এখনকার প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী শুভাপ্রসন্নর লেখা 'আমার ছবিজীবন' ধারাবাহিক পড়তে পড়তে বহুকাল আগের আমার স্মৃতি উছলে উঠল।

বিগত শতাব্দের ষাটের দশকের মাঝামাঝি মহাষ্টমীর রাতে পাকপাড়ার বিধান ছাত্রাবাসের ছাদে স্বপ্নের সওদাগর বাবু শ্রী ইন্দ্রনাথ মজুমদারের সঙ্গে জলচিকিৎসার জমজমাট আসরে আলাপ পরিচয়ের সূত্র ধরে পরবর্তীকালে জীবৎকালেই লেখকদের লেখক কমলকুমার মজুমদারের সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠতার শুরুই বলতে হবে। ক্রমে ক্রমে জানা গেল ইন্দ্রনাথ কমলকুমার মজুমদারের বিশেষ স্নেহভাজনই শুধু নন, বলতে গেলে কমলকুমার অন্ত প্রাণ। উল্লিখিত ঘটনার দিন থেকে একে একে টের পাওয়া শুরু হল ইন্দ্রদা মানুষটি বহুগুণে গুণান্বিত, বহু কলায় কলান্বিত। প্রবলভাবে ভোজনরসিক। যদিও তখন তিনি ওই ছাত্রাবাসের ওয়ার্ডেন। ছাত্রাবাসের ব্যয়ভার বহন করার জন্য যে চেক কাটতে হয় তাতে তখনকার মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল সেন কংগ্রেসের কিং মেকার অতুল্য ঘোষের স্বাক্ষরের পাশে তাঁরও সইয়ের দরকার হয়। সেই থেকে এক নাগাড়ে পরবর্তী চৌদ্দ বছর অবধি তার সঙ্গসুধা পান করা ছাড়াও আরও কত কত যে অভিজ্ঞতার ঝুলি পূর্ণ হয়েছে এককথায় বলা অসম্ভব। মেশামিশি শুরু হতে দেখা গেল পুরনো আর দুষ্প্রাপ্য বইয়েরও কারবারে তিনি কম যান না। আর সেই সঙ্গে কমলদার অভিনব কাজকারবারে ঝাঁপিয়ে পড়তে এক লহমা সময়ক্ষেপ করতে রাজি নন। সেই ভাবে আমি প্রথম যুক্ত হলাম কমলকুমারের অঙ্কবিষয়ক পত্রিকা 'অঙ্ক ভাবনা'র সঙ্গে। আমার কাজ ছিল একটি ইংরিজি বই থেকে অনুবাদ করা। কমলদা নিজে লিখতেন প্রাচীন ভারতের গণিতবিদ লীলাবতীর কাজ নিয়ে। ওসব প্রসঙ্গ নিয়ে আমি আমার বইতে বিশদভাবে আলোচনা করেছি।

এখানে যেটা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য সেটা হল ইন্দ্রদার সুবর্ণরেখা নামে বইয়ের দোকানের জন্য মহাত্মা গান্ধি রোডে টেমার লেনের মুখে একটি মেজেনিন ফ্লোরের খোঁজ পেয়ে সেখানেই হয়ে গেল আমাদের সার্বক্ষণিক আড্ডার জায়গা। ওখানে আগে ছিল পাড়ার ছেলেদের তাসা পার্টির অফিস। কী করে যে ইন্দ্রদা খুঁজে বের করেছিলেন সে এক আশ্চর্যের ব্যাপার।

ওখানেই আমার সঙ্গে প্রথম দেখা হয় কলেজ রো-র কিশোর, আজকের নামজাদা শিল্পী শুভপ্রসন্নর। শুভা সে-বয়সেই গুটি-গুটি পায়ে নাম যশ খ্যাতির দিকে এগিয়ে চলেছে। শুভার সঙ্গে পরিচয়ের পর থেকেই কী করে যে আমার সঙ্গে একটা প্রীতির সম্পর্ক গড়ে ওঠে তা আজ আর বিশদ করে বলতে না পারলেও আমি যে দিনে দিনে ওর গুণগ্রাহী হয়ে উঠেছিলাম তা আমার স্পষ্ট মনে আছে। কলেজ রোতে 'সন্তোষ' নামের একটি মিষ্টির দোকান ছিল। ওখানে আমি প্রায়শই রাধাবল্লভী খেতে যেতাম। আর যেহেতু ওই কলেজ স্ট্রিটপাড়া ঘিরে সারা দিনমান কাজে অকাজে ঘুরে বেড়াতাম তারই ফাঁকে ফোকরে ওর সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে সামান্য হলেও আমাদের প্রীতিসম্ভাষণ বিনিময় হত। একদিন জানলাম ওরা ভাটপাড়ার কুলীন ব্রাহ্মণ। শুভার তখনই এত সুকৃতি যে রুশ প্রেসিডেন্টের ভারত ভ্রমণের সময় দেখা গিয়েছে তাঁর পাশে শুভা বসে আছে। ভারতের রাষ্ট্রপতি ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণকে বহনকারী গাড়িতেও শুভাকে দেখা গিয়েছে। অর্থাৎ সমবয়সের শুভার ভেতরে কোনও গুণাবলী না থাকলে ও কী করে এতটা সমীহ আদায় করে নিয়েছিল! শুভা নিজেই ওসব প্রসঙ্গ নিয়ে লেখালেখি করেছিল অত্যন্ত বিনীত ভাবে।

শুভা যে আঁকাআঁকি করে বেশ খ্যাতিমান হয়ে উঠছে সেটা তো আমার নিজের চোখেই দেখা। কর্পোরেশনের সামনের পার্কে একসময় শিল্পীদের আঁকাআঁকির একটা মেলা বসল। সেখানে সামান্য অর্থের বিনিময়ে যে কেউ নিজের প্রতিকৃতি আঁকিয়ে নিতে পারত। শুভার

সামনেই দেখা যেত সর্বাপেক্ষা ভিড়। আমি সময় পেলেই মাঝে মধ্যে শুভার বাড়িতে ঢুকে পড়তাম। শুভা হয়তো বাড়ি নেই বা কোনও কাজে ব্যস্ত রয়েছে আমি তখন সামনে বসা ওর সৌম্যদর্শন পিতৃদেবের সঙ্গে নানা বিষয়ে কথাবার্তা বলতে বলতে সনাতন ধর্ম নিয়েও আলোচনায় মেতে উঠতাম। ওঁর কথার অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য এবং দর্শন আমাকে মুগ্ধ নিমোহিত করে রাখত।

এর ভেতরে একটা কথা না বললেই নয়। আমার বন্ধু অমল লাহিড়ীর মাতৃবিয়োগ হয়। অমল আর বুলু দুই ভাই কোনও একদিন আক্ষেপ করে বলছিল— বাড়িতে ওদের পরলোকগতা মায়ের কোনও ছবি নেই। কেবল শ্মশানে নিয়ে যাওয়ার সময় ঘাটের ওপর শায়িত অবস্থায় একটা ছবি রয়েছে। আর রয়েছে একটি চশমা যেটা তিনি পরতেন। সেটা দেখে যে-কোনও মাধ্যমে যদি একটা ছবি এঁকে দেওয়া যায় তাহলে মায়ের স্মৃতি হিসেবে সেটা পরিবারের কাছে অমূল্য বিবেচিত হবে। চট করে আমার শুভার কথা মনে হল। ছবির আমি যতটা বুঝি তাতে মনে হল শুভার হাতের ড্রয়িংটি অতিশয় জোরালো। ড্রয়িং ছাড়া তা তিনি যত বড় শিল্পীই হোন না কেন ছবিটা নিরর্থকতায় পর্যবসিত হতে বাধ্য। এককথায় শুভা শুধু রাজিই হল না, যথাসময়ে ছবিটি এঁকে দিল। বন্ধু অমলের রাশভারী পিতা পর্যন্ত স্বীকার করলেন যে ছবিটি যথাযথ হয়েছে। সেদিন যে শুভা আমার মুখ রেখেছিল সেটা আজও আমি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করি।

হ্যাঁ, সেই সময় আমি পত্রিকা সিন্ডিকেট নামের একটি প্রতিষ্ঠানে কাজ করতাম। একবার হল কী, আমাদের প্রকাশনার জন্য একজন ভালো মানের শিল্পীর প্রয়োজন। শুভাকে অনুরোধ করতেই শুভা এককথায় রাজি। স্বল্প সময়ের জন্য শুভার সঙ্গে সহকর্মী হিসেবে কাজ করতে আমি যথেষ্ট সম্মানিত বোধ করেছি।

শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গেও শুভার যথেষ্ট সখ্য গড়ে উঠতে সময় নেয়নি। দুজনে যৌথভাবে 'নীলিমা ও নৈরাজ্য' নামে একটি বই বের করেছিল। ৭৪ সালে আমি সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশে ফিরে গেলেও শুভার সঙ্গে আমার একটা আত্মিক যোগাযোগ রয়েই গিয়েছিল।

শুভা যখন যে কাজে হাত দেয় সেটা যে একটা মহাযজ্ঞ না হয়ে যায় না সেটা কাছে কিংবা দূরে থেকে সর্বদাই টের পেয়েছি। আমার অবর্তমানে শুভা 'আর্টস একর' বলে একটি অভিনব ও বিরাট কর্মশালা প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হয়েছিল। তাতে মৃণাল সেন, রবিশংকরের মতো বিরাট ব্যক্তিত্বরা হাত মেলান। চারদিকে সাড়া পড়ে গেলে কী হবে, বাঙালিদের যা স্বভাব— রবীন্দ্রনাথের কথায় 'বাঙালিরা দল করতে পারে না কিন্তু দলাদলিতে দড়', সে বদনাম মান্য করেই যেন সব ভণ্ডুল করে দিতে মেতে উঠল সবাই।

একবার যখন আমরা বাংলাদেশের কবি-সাহিত্যিকরা আমন্ত্রিত হয়ে কলকাতায় এসেছিলাম তখন আমাদের কবিজ্যেষ্ঠ শামসুর রাহমান, কবি ও স্থপতি রবিউল হুসাইন সমভিব্যহারে সবাই মিলে এক সকালে শুভার কলেজ রোর বাড়ি-কাম-স্টুডিওতে গিয়েছিলাম, শুভা তখন দুঃসময়ের সহমর্মী শিল্পী শিপ্রাকে বিয়ে করে গুছিয়ে বসেছে। ঘরে এসেছে একমাত্র কন্যা জোনাকি। সে-যাত্রায় শুভা আমাদের তার অনবদ্য শিল্পকর্ম ছাড়াও কিছু উপহার হাতে তুলে দেওয়াতে কী যে আনন্দ হয়েছিল তা আর বলার নয়।

এরপর আমি যখন আবার ভারতীয় হাই কমিশনের দুই বাংলার সাহিত্য-সংস্কৃতির সেতুবন্ধ 'ভারত বিচিত্রা'র প্রচ্ছদ আঁকিয়ে নিয়ে গিয়েছিলাম, সেটাও দারুণভাবে প্রশংসিত হয়েছিল তার শিল্পরুচির জন্য।

সেইসময় আমাদের নতুন হাই কমিশনার হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন শ্রীকৃষ্ণণ শ্রীনিবাসন। তিনি কেবল একজন দক্ষ কূটনীতিকই ছিলেন না, তিনি চাইতেন দুই দেশের মধ্যে শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির আদান প্রদান ও বিনিময় যেন সুদৃঢ় হয়। তাঁর আমলেই তাঁরই উদ্যোগে ঢাকা মিশনের আমন্ত্রণে শুভাকে সপরিবারে ঢাকাতে নিয়ে গিয়ে বেশ ক'টি শিল্প-প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল। শুভার চিত্রকলা বিপুলভাবে প্রশংসিত হয় ঢাকার শিল্পমহলে। পরবর্তীকালে শ্রীনিবাসন সাহেব দুর্মরভাবে শুভার শিল্পকর্মের অনুরাগী হয়ে ওঠে।

৮০-র দশকে প্রখ্যাত জার্মান লেখক কবি ও চিত্রকর গ্যান্টার গ্রাস যখন কলকাতায় এসেছিলেন তখন তিনিও শুভার কাজ দেখে শুধু চমৎকৃত হননি তিনি শুভার আতিথ্যও গ্রহণ করেছিলেন সোৎসাহে।

শুভাও তাঁর আমন্ত্রণে জার্মানি ঘুরে এসে একটি অনবদ্য ভ্রমণকাহিনি লিখেছে।

শুভা তার ইচ্ছে বা বিশ্বাস অনুযায়ী যাই লিখুক না কেন সেসবের মধ্যে কখনও কোনও মালিন্য থাকে না। আসলে শুভাপ্রসন্ন হচ্ছে হৃদয়বৃত্তির দিক থেকে অত্যন্ত উঁচুমনের মানুষ। কিন্তু সবকিছুর ওপরে ওর সৌজন্য ও ঔচিত্যবোধ।

শুভাপ্রসঙ্গের 'আমার ছবিজীবন', অন্য একটা পত্রিকায় পড়তে শুরু করে পত্রিকাটি ঢাকায় অনিয়মিত হয়ে যাওয়ার ফলে মাঝে মাঝে বিরতি পড়লে খুবই খারাপ লাগত। ব্যক্তিগতভাবে আমার প্রিয় সেই লেখাটি বন্ধু কবি অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর সাহিত্য পত্রিকা 'কালের কষ্টিপাথর'-এ পড়তে পেয়ে কী যে ভালো লাগছে সেকথাটা জানানোর জন্য কলম ধরা।

ঢাকা, বাংলাদেশ

বাংলা বাঙালি বাঙালিয়ানা

অবন্তী কাঁঠালের চিঠি

আপনার সম্পাদিত এ-পর্যন্ত প্রকাশিত 'কালের কষ্টিপাথর'-এর সবকটি সংখ্যাই আমার হস্তগত হয়েছে। বাংলার সাময়িক পত্রিকা-জগতের শেষতম উজ্জ্বল সংযোজন। বিষয়-বৈচিত্র্যে পুরাতনের সঙ্গে নবীনের পরিচয়-সাধনে, আধুনিকতায় যে ধারা প্রবাহিত হচ্ছে এর পাতায় পাতায়, তা সংবেদনশীল পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে ইতিমধ্যেই। সেই ধারা অব্যাহত থাকুক— এই কামনা করি।

এই প্রসঙ্গে সদ্যপ্রয়াত মনস্বী সাহিত্য-স্রষ্টা সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের 'যে কথা বলা হয়নি'-র মতো একটি নতুন ধারার দেখা আর মিলবে না, এ-কথা ভেবে মন ভারাক্রান্ত। আপনার মাধ্যমে প্রয়াত লেখকের স্মৃতির উদ্দেশে জানাই গভীর শ্রদ্ধা।

আপনার পত্রিকায় বাংলা, বাঙালি ও বাংলা ভাষাতত্ত্ব ও বাঙালিয়ানা সম্পর্কে লেখা দেখতে চাই।

টুরকু হাসদা-লপসা হেমব্রম মহাবিদ্যালয়
মল্লারপুর, বীরভূম

আলাউদ্দিন খাঁয়ের স্মৃতি

দীপক সেনের চিঠি

অমিতাভ চৌধুরির 'মহাজনসঙ্গ' নিয়মিত পড়ছি। অনেক না জানা কথা জানতে পারছি প্রবীণ সাংবাদিকের কাছ থেকে, এ এক বিরাট প্রাপ্তি। ১৬ সেপ্টেম্বর সংখ্যায় ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ-এর প্রসঙ্গ পড়ে আর একবার অনেক ভালোলাগায় মন ভরে গেল। ওঁকে নিয়ে আরও আলোচনা হওয়া উচিত, তা শুধু ওঁর সঙ্গীত-প্রতিভার জন্যই নয়, ওঁর নিখাদ ধর্মনিরপেক্ষ আশ্চর্য মানসিক গঠনের জন্যও। একই সঙ্গে নিষ্ঠাবান মুসলমান আবার কালীভক্ত ছিলেন। সারাজীবন ধরে সঙ্গীতের সাধনার মধ্য দিয়েই অরূপের সন্ধান করে ফিরেছেন। দীর্ঘকাল মাইহারে থেকেও মুখের কথায় পূর্ববঙ্গীয় টান বজায় ছিল আজীবন। নির্লোভ সরল মানুষটিকে নিয়ে হরিসাধন দাশগুপ্তের একটি মূল্যবান তথ্যচিত্র এখনও হয়তো ফিল্মস ডিভিশনের আর্কাইভে থেকে থাকবে। খুবই বেদনার কথা, যে মানুষটি পণ্ডিত রবিশঙ্কর, ওস্তাদ আলি আকবর, অন্নপূর্ণাদেবী, নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তিমিরবরণের মতো শিল্পীদের তৈরি করেছেন, অন্য অনেক মলিন বিস্মৃত ইতিহাসের মতো তাঁকেও আমরা ভুলতে বসেছি।

হাজরা রোড, কলকাতা

ক্ষণের বচন

৩৬

যত বেশি ক্ষমতার অধিকারী হবে
তত বেশি ফন্দিবাজ পূজিবে সরবে

৩৭

এত নিন্দা, গালমন্দ
যে করে তার এক গন্ধ?
এর চেয়ে বড় ক্ষতি নাই।
অন্ধজনে আলো দাও
দোষীজনে ভালো দাও—
এর চেয়ে বড় লাভ নাই।

৩৮

ফুলের নির্বাক ভাষাই আত্মপরিচয়
নেতা-মন্ত্রী নিজগুণ পাঁচমুখে কয়

৩৯

ক্রোধ হিংসা আস্ফালন নিজের বড়াই
কুয়াশায় ঢাকে পথ খাদ ও চড়াই

৪০

পারস্পরিক হিংসা ঘৃণা
বলুন, সইতে আর পারি না।
সার্বজনীন ভালোবাসা
বাঁচার একমাত্র আশা

৪১

আমার সমস্ত ভালো
অপরের সবটুকু কালো
ভাবতে ভাবতে জানতেও পাবে না
তোমার জীবনে কখন আঁধার ঘনালো

ক্ষণকথক

শব্দবক্র

৩৫। অপরগ

বিশেষণ; জুতো, মোজা, কানের দুল ইত্যাদি যা কিছু সাধারণত জোড়ায় জোড়ায় পরা হয়, তার একটি হারিয়ে গেলে অন্যটির যে দশা হয় > অমন সাধের উলের মোজা, মেশিনে কাচতে গিয়ে অপরগ হয়ে গেল!

৩৬। অপাট্য

বিশেষণ; যা কিছু পাট বা ভাঁজ করা যায় না > আপনার ছাতাটি কি পাট্য না অপাট্য?

৩৭। মহীলা

বিশেষ্য; হীল তোলা জুতো না পরলে যে নারীর নিজেকে অসম্পূর্ণ মনে হয়।

৩৮। নমীচিন

বিশেষণ; রুটিনমাফিক বা অপ্রত্যাশিত, শুভ বা অশুভ যে-কোনও রকম কাজ শুরু করার আগে যিনি ইষ্টনাম স্মরণ করবেনই করবেন > সদয়বাবুর মতো নমীচিন ব্যক্তি চট করে দেখা যায় না। সেদিন তাড়াহুড়ো করে বেরবার সময় ঠাকুর প্রণাম করে বেরতে ভুলে গিয়েছেন বলে বাসস্টপ থেকে আবার ফিরে এলেন। সেদিন অবশ্য আর কাজে যেতে পারেননি।

৩৯। খুঁৎমার্গ

বিশেষ্য; যে পথে চললে চারপাশের লোকজনের দোষ ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ে না।

৪০। আর্কিক

বিশেষণ; গড়ে প্রতি দুটি শব্দের পর 'আর কি' না বলে যিনি কথা চালিয়ে যেতে পারেন না > আমি তখন আর কি বাজারে যাচ্ছিলাম আর কি ফল কিনতে আর কি...

৪১। ওকের ডালি

বিশেষ্য; টেলিফোনে কথা বলার সময় যিনি প্রায় প্রতি বাক্যের সঙ্গে OK বলে থাকেন > ওকে, তাহলে ওই কথাই রইল...ঠিক সময় চলে যাব ওকে, রাখি তাহলে ওকে...

শব্দবক্রমুণি

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

৭ সেপ্টেম্বর ১৯৩৪-২৩ অক্টোবর ২০১২

সুনীলকে নিয়ে এখন লেখার সময় নয়

উৎপলকুমার বসু

সুনীলের সম্পর্কে লিখতে বসার বিপদ, একসঙ্গে অনেক পুরনো কথা মনে পড়ে যায়। এত দীর্ঘকাল এত কাছ থেকে যাকে দেখেছি, তাকে নিয়ে কি লেখা যায়? সে লেখার সময়ও তো এটা নয়। ওর নিজেরই একটা কথা খুব মনে পড়ে। প্রায়ই বলত, 'মহাকাল আমাকে মনে রাখবে কিনা, তা নিয়ে আমি বিন্দুমাত্র ভাবিত নই। এখন যা লিখলাম, সেটা পড়ে তুমি আনন্দ পাচ্ছ কিনা, সেটাই আসল কথা। আমি যদি পাঁচটা খারাপ গল্প আর তিনটে বাজে উপন্যাস লিখে থাকি, দুনিয়ায় কোনও মহাভারত অশুদ্ধ হবে না।' এটাই ছিল সুনীলের নিজস্ব দর্শন। সুনীল তার বেশিরভাগ লেখায় সাহিত্যের জটিলতার চেয়েও মানুষকে বেশি বিনোদন দিতে চেয়েছে।

আবার একবার এমনও বলেছে, 'এই যে সারাজীবন আঙুল পুড়িয়ে এত লিখে যাচ্ছি, এর সবই কি বৃথা?'

'কৃত্তিবাস' পত্রিকার জন্ম কিন্তু এরকম একটা আর্তির বীজ থেকে। তখন পাঠককে বিনোদন জোগানোর ভাবনা ছিল না সুনীলের মধ্যে। 'কৃত্তিবাস'-এর তিন সম্পাদক— দীপক মজুমদার, আনন্দ বাগচী এবং সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় সর্বসম্মতভাবে স্থির করেছিল, ওই পত্রিকায় তরুণরাই কবিতা লিখবে। গদ্য ছাপা হবে শুধু বয়স্ক লেখকদের।

নিম্নমধ্যবিত্ত বাড়ির ছেলে সুনীলের বাবা স্কুলের মাস্টারমশাই। সদ্য স্বাধীনতা পাওয়া দেশে উদ্বাস্তুর চাপ। তাদের বাসার ভাড়াও সেই আক্রার বাজারে বাড়ছে। বাড়ির বড় ছেলে হিসেবে সুনীলকে পরিবারের দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে এক সময় অজস্র টিউশনি করতে হয়েছে। তারপর কিছুদিন 'জনসেবক' ও পরে আনন্দবাজারে সে চাকরি পায়।

খবরের কাগজে পাতা ভরানোর জন্য গদ্যই প্রধান। প্রতিভার সঙ্গে দক্ষতা জুড়ে এই কাজে সুনীল অসামান্য সাফল্য অর্জন করল।

অথচ, কবিতাই ছিল তার প্রথম প্রেম। টাকার জন্য তাকে গদ্য লিখতে হচ্ছে বলে বহুবার আক্ষেপ করেছে সুনীল।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের পাঠক জানেন, এই গদ্যযাত্রার শুরু 'দেশ' শারদীয়া সংখ্যায় সুনীলের প্রথম উপন্যাস 'আত্মপ্রকাশ' থেকে। প্রায় একই সময়ে শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, দেবেশ রায়, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ অনেকে উপন্যাস লিখছেন। আগের প্রজন্মের সাহিত্যের ছক ভেঙে নতুন ধারার গদ্য লেখার চেষ্টা করছেন।

সুনীল কোনও নতুন আখ্যানরীতির গদ্য লিখল না, বরং তুলে আনল কলকাতার নিম্নমধ্যবিত্ত ও মধ্যবিত্ত সমাজের মুখের ভাষাকে। তাতে যে নতুন গদ্যরীতি সে গড়ে তুলল, তার আকর্ষণ সাংঘাতিক, ঝরঝরে ভঙ্গি, যে-কোনও লোকই তার থেকে বিনোদনের আস্বাদ পেতে পারে। সেই গদ্যরীতিতেই লেখা হল 'গরম ভাত অথবা নিছক ভূতের গল্প'র মতো ছোট গল্প। সুনীল বলত বটে, একদিনে বসে গল্পটা লিখেছে, কিন্তু তা-ই কি হয়! অনেক দিন ধরে ওই গল্পের ছক বা ছবি তার মাথায় ঘুরত।

সুনীলের উত্থান আসলে কলকাতার মধ্যবিত্তের উত্থান, তার ভাষা ও চিন্তার উত্থান। সুনীল পরে যখন 'সেই সময়', 'প্রথম আলো'র মতো বড় উপন্যাস লেখায় হাত দেয়, সেখানেও কিন্তু সে তুলে আনে উনিশ শতকের নাগরিক কলকাতাকে। সুনীল যেন তার প্রিয় কলকাতা শহরের ইতিহাসকেই ঘুরেফিরে দেখতে চায়। উপন্যাস দুটি লেখার আগে প্রচুর পরিশ্রম করেছিল সুনীল। বাংলা সাহিত্যে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় মানে শুধু প্রতিভা এবং দক্ষতার মেলবন্ধন নয়। তার সঙ্গে জুড়তে হবে প্রবল পরিশ্রমের ক্ষমতা। পরিশ্রমের ক্ষমতা না থাকলে একই সঙ্গে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, নীললোহিত এবং সনাতন পাঠক হওয়া যায় না।

খবরের কাগজে চাকরি নেবার সময় 'কৃত্তিবাস'-সম্পাদক বলেছিলেন, 'সিস্টেমকে ভিতর থেকে ভাঙতে হবে।'

কিন্তু সিস্টেমকে আদৌ ভাঙা যায় কি? সুনীল কি সত্যিই তাকে ভাঙতে চেয়েছিল, না ব্যবহার করতে চেয়েছিল? আর তা করতে গিয়ে নিজেই ক্রমশ হয়ে উঠেছিল ব্যবহৃত, ব্যবহৃত এবং ব্যবহৃত? আমাদের বন্ধুদের অবশ্য এই দুঃখ ঘোচবার নয়।

আবার এই ভেবে আমাদের গর্বও হয় যে, তবু তো সুনীল পাঞ্জা লড়েছিল!

সুনীল আকাশ

বেলাল চৌধুরী

বাংলা ভাষার প্রতিটি অক্ষরের ওপর যাঁর নিয়ন্ত্রণ-দক্ষতা ছিল প্রশ্নাতীত, সেই সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় সম্পর্কে এই মুহূর্তে কিছু লিখতে যাওয়া অত্যন্ত দুরূহ। বাংলা সাহিত্যের এমন কোনও শাখা নেই, যেখানে তাঁর হাতের ছোঁয়ায় সোনা ফলেনি। তবে কবিতাই ছিল তাঁর প্রথম প্রেম। গল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ, সন্দর্ভ, নিবন্ধ— প্রতিটির ওপরই তিনি ছিলেন অখণ্ড কর্তৃত্বের অধিকারী। সাহিত্যে তাঁর অসামান্য কীর্তির জন্য পেয়েছেন ভারতের সর্বোচ্চ আকাদেমি, বঙ্কিম পুরস্কার সহ আরও ঢের পুরস্কার। আসলে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে পুরস্কার-টুরস্কার মোটেই তেমন কিছু ছিল না। সবচেয়ে বড় পুরস্কার তিনি পেয়েছিলেন তাঁর বৃহত্তর পাঠকসমাজের কাছ থেকে। পুরনো দিনে বোধহয় এঁদেরই বলা হত 'বাণীর বরপুত্র'।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের রচনার প্রকৃত অনুরাগীর সংখ্যা নিরূপণ করার চেয়ে হিমালয় পর্বতের চূড়ায় আরোহণ করা ঢের বেশি সহজ। সম্ভবত পরিসংখ্যানবিদরাও এ ব্যাপারে সঠিক কোনও তথ্য দিতে অপারগ হবেন। অনেককে বলতে শুনেছি, সুনীলের লেখা তো উঠতি বয়সের তরুণ-তরুণীদের মাথা চিবানোর জন্য। এ রকম মনভোলানো চটকদার লেখা লিখে যে কেউই সমান জনপ্রিয় হতে পারেন সাময়িকভাবে, তবে কখনওই স্থায়ী ও মূল্যবান সাহিত্যিক হিসেবে নয়। এই শ্রেণীর লোকের অজ্ঞতা ও মূর্খতা কোন পর্যায়ে গেলে এ ধরণের অর্বাচীন উক্তি সম্ভব, তা আমাদের জানা নেই। জানার ইচ্ছাও হয় না। তবে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, রবীন্দ্রনাথের পর একমাত্র সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ই সেই বহুপ্রজ লেখক, যাঁর যে-কোনও লেখাই যে-কোনও বয়সের পাঠকের কাছে সমানভাবে প্রাঞ্জল, আদৃত ও আকর্ষণীয়।

সুনীলের রচনার রহস্য রসায়নটা কী? কীভাবে সুনীল তাঁর পাঠককে মন্ত্রমুগ্ধের মতো আকৃষ্ট করে রাখার বিরল ক্ষমতা অর্জন করলেন? প্রশ্নটির জবাব সুনীলের লেখার মতোই সরল আর সোজা। অর্থাৎ, সুনীলের অসামান্য প্রাঞ্জলতা। কী বিষয়বস্তু, কী বলার ভঙ্গি, কী ভাষার নির্বাচন; সুনীল আমাদের নিত্যদিনের ব্যবহার্য মুখের ভাষার মতো অনবদ্য ভাষার কথকতা দিয়ে যে সাহিত্য রচনা করেছেন, তা যে-কোনও মানুষকে সম্মোহিত করার জন্য যথেষ্ট।

সেই ষাটের দশকের শুরুতে আমার ভাসমান জীবনে যখন আমি কলকাতায়, তখন থেকে একধরণের পত্রপত্রিকা বেরনোর চল হয়েছিল, যেগুলো 'পরিচয়', 'চতুরঙ্গ' বা 'নতুন সাহিত্য'-এর মতো বড় কাগজ না হলেও একঝাঁক তরুণের লেখা নিয়ে বেরচ্ছে, যেমন 'ইদানীং', 'ইঙ্গিত', 'মনের মতো কাগজ', রমাপদ চৌধুরীর পত্রিকার মতো মাসিক আবার একটু রাজনীতির ছোঁয়ালাগা 'চতুষ্কোণ', 'অগ্রণী'। এদেরই কোনও একটাতে সম্ভবত সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রথম গল্প নাকি কে জানে 'বাঘ' পড়েছিলাম। এরপর তাঁর কবিতা ছাড়া গদ্য রচনা তেমন না পড়লেও 'কৃত্তিবাস'-এর কল্যাণে তাঁর নামটি বহুল উচ্চারিত এবং

পরিচিত হয়ে উঠেছিল আমাদের কাছে।

কলকাতার কলেজ স্ট্রিট কফি হাউসের সুবাদে সুনীলের অনুপস্থিতিতে তখন দোর্দণ্ড প্রতাপে বিচরণ করছেন শ্মশ্রুল শক্তি চট্টোপাধ্যায়। অগণিত তাঁর ভক্ত। শক্তি তখন কিংবদন্তিতে পরিণত হওয়ার মুখে বড় বড় পা ফেলে এগিয়ে চলেছেন। সুনীল-শক্তি বন্ধু হলেও অভিন্নহৃদয় কি না, বোঝা মুশকিল।

শক্তি তখন লিরিক দিয়ে গোটা বাংলা কবিতাকে মাতিয়ে রাখছেন। আর তাঁর সেই দোভাষায় লেখা 'কুয়োতলা' বাংলা গদ্যে এক নতুন স্বাদ এনে দিয়েছে। শক্তিকে 'কৃত্তিবাস' গোষ্ঠীভুক্ত বলা হলেও তিনি ছিলেন শ্রী আংটির মতো। যখন যার হাতে, তখন তার। হাতে অসম্ভব ক্ষমতা। ছন্দে দারুণ দক্ষ। উদ্দাম জীবনযাপন। আমার সঙ্গে জমে যেতে বেশি দেরি হল না। যখন যেখানে খুশি চলে যাচ্ছি, যা খুশি করছি। যে-কোনও সমাজেই চেনা নেই জানা নেই, হঠাৎ একজন বাইরের লোক এসে যা খুশি তা-ই করবে, সেটা অনেকে মেনে নিতে পারছিল না বলে একসময় আইডেন্টিটি ক্রাইসিসে পড়ে প্রথমে কলম হাতে তুলে নিতে হয়েছিল আমাকে। ছোটবেলা থেকে নির্বিচারে অজস্র পড়াশোনা করলেও নিজে কখনও লিখব বা কলম ধরব, তেমনটা মাথায় আসেইনি। তবে আমার আম্মা লিখতেন বলে ভেতরে ভেতরে লেখালেখির একটা সুপ্ত ব্যাপার যে ছিল না, তা-ও বলতে পারি না।

রাজশাহীর ছেলে শান্তি লাহিড়ীর 'বাংলা কবিতা' কাগজটি তখন খুব পরিপাটি হয়ে বেরছে। শক্তিদার 'অনন্ত কুয়ার জলে চাঁদ পড়ে আছে' সহ গুচ্ছ গুচ্ছ কবিতা বেরছে। সবার দেখাদেখি শান্তির অনুরোধে আমিও তাদের সূচিপত্রে শুধু স্থানই পেলাম না, দু-একজনের প্রশংসাও কুড়োলাম, যাদের মধ্যে চৈত্রে রচিত কবিতার উৎপলকুমার বসুর 'তারিফ' আমাকে সবচেয়ে বেশি অনুপ্রাণিত করেছিল। এর মধ্যে সঞ্জয় ভট্টাচার্যের 'পূর্বাশা'-তেও একটি কবিতা ছাপা হল। এভাবে মোটামুটি কফি হাউসে অসংখ্য লিটল ম্যাগাজিনের তরুণ কবির দলে শামিল হয়ে গিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলাম।

ভাসমান জীবনের ভাসমান মানুষের একটা বড় সুবিধা হল, কখন যে কোন ঘাটে গিয়ে ঠেকবে, তা সে নিজেও জানে না। ক্রমেই পরিধি বাড়তে বাড়তে একসময় কলকাতার মতো শহরকেও মনে হতে লাগল ছোট, অন্তত আমার জন্য। কলকাতার একটা বড় মজা, সম্ভবত সাহিত্যের রাজধানী হওয়ার জন্যই সব সময় কিছু না কিছু একটা লেগেই আছে। শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিবিষয়ক কর্মকাণ্ডে না জড়িয়ে পারা যায় না।

২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৭। সুনীল, স্বাতীর বিবাহ।

তখন স্বাতী বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে চলছে সুনীলের তুমুল প্রণয়পর্ব। এক দিনের বিরহও সইবার নয়। সারা দিনের হইহুল্লোড়ের মধ্যেও সে যে কী জিনিস, অভিজ্ঞতা না থাকলে বোঝা অসম্ভব। একটা সময় দেখলাম, সুনীলদা বাজারের এক কোণে চায়ের দোকানে বসে খসখস করে কী যেন লিখে চলেছেন।

ওই সময় মার্কাস স্কোয়্যারে ঐতিহ্যবাহী বঙ্গ সংস্কৃতির মেলা বসল দিন পনেরোর জন্য। আমেরিকা থেকে সদ্য ফেরা পূর্ণ চাঁদমুখো বহুশ্রুত সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কে সেই আমার প্রথম দেখা, ওই ষাটের দশকেই। তার পর থেকে রুদ্ধশ্বাস জীবনে পিছনে ফিরে তাকানোর অবকাশ কোথায়? সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় যেন এলেন, দেখলেন, জয় করলেন— এমন একটা ব্যাপার। তাঁর অবর্তমানে 'কৃত্তিবাস'-এর ভার নিয়েছিলেন কবি শরৎকুমার মুখোপাধ্যায় এবং তাঁর সঙ্গে প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়। কখন যে আমিও 'কৃত্তিবাস' দলভুক্ত হয়ে গিয়েছি, তা আমি নিজেও জানি না। 'কৃত্তিবাস' নিয়ে কত হইচই, হুল্লোড়।

একটা জিনিস লক্ষ করলাম, কবি হয়েও যোগ্য দলপতি হওয়ার সব গুণই সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের মধ্যে বর্তমান। আমেরিকা ফেরতা সুনীলকে একদিন দেখলাম হরিশ মুখার্জি রোডে শীত-গোধূলির ভারী হয়ে আসা আলো-আঁধারিতে এক সঙ্গিনীর কোমর জড়িয়ে হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে যাচ্ছেন ময়দানের দিকে। প্রেম যদি হয়, সেটা ছিল ঘোরতর ইয়াঙ্কি কায়দার।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ক্রমেই হয়ে উঠলেন সুনীল গাঙ্গুলি থেকে ছেলে-বুড়ো সবারই সুনীলদা। এমনকি স্ত্রী স্বাতী গঙ্গোপাধ্যায়েরও। সুনীলদা প্রেমে পড়লেন, সে-ও এক কাহিনি। একবার বহরমপুরে গিয়েছি কিংবদন্তিসম মনীশ ঘটকের সঙ্গে। বিরাট দল। উপলক্ষ কবি সম্মেলন।

সুনীল, শক্তি, অলোকরঞ্জন, উৎপল, শংকর চট্টোপাধ্যায় এবং আরও অনেকে। তখন স্বাতী বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে চলছে সুনীলের তুমুল প্রণয়পর্ব। এক দিনের বিরহও সইবার নয়। সারা দিনের হইহুল্লোড়ের মধ্যেও সে যে কী জিনিস, অভিজ্ঞতা না থাকলে বোঝা অসম্ভব। একটা সময় দেখলাম, সুনীলদা বাজারের এক কোণে চায়ের দোকানে বসে খসখস করে কী যেন লিখে চলেছেন। তখন গদ্যকার সুনীল কোথায়? 'বরণীয় মানুষ স্মরণীয় বিচার' ফিচার হিসেবে কাগজে বেরলেও বই হয়ে বের হওয়া দূর কল্পনা। তারপর খামে এঁটে মাঝরাত্তিরের দিকে এক ফাঁকে কিছুটা উঁচু হয়ে প্রায় লাফিয়ে বাজারের ঝুরিনামা বটগাছের গায়ে লাগানো জংধরা মেটে লাল রঙের ডাকবাক্সে ফেলে দিতে শংকরদার সে কী দমফাটা হাসি। সুনীল, তুই এ কী করলি? এ যে গাছের খোড়ল, হাঃ হাঃ হাঃ। প্রবল হাসির দমকে গলা আটকে যাওয়ার দশা। পরে স্বাতীদিকে কখনও জিজ্ঞেস করা হয়নি, বহরমপুর থেকে প্রেমিক সুনীলের কোনও চিঠি পেয়েছিলেন কি না। তবে সুনীলের যে দায়িত্বজ্ঞান এবং খাটুনির শক্তি, তা দেখে বাকরোধ হওয়া ছাড়া আর কিছুই করার থাকে না— প্রত্যক্ষ করে বুঝেছি সুনীল-ম্যাজিকের রহস্যটা কী? খাটুনি আর খাটুনি। আমরা অনেকেই আলেকজান্ডারের প্রবল সুরাসক্তির প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠি, কিন্তু কখনওই তার বীরত্ব ও নিষ্ঠার নয়।

মানুষটি যদি হন একমেবাদ্বিতীয়ম কেউ, তাঁর নিজেরই ভাষ্যে শুনুন, 'আমি সামান্য কবি— একদা পূর্ববঙ্গবাসী, অধুনা ভ্রাম্যমাণ— গঙ্গোপাধ্যায় বংশীয় সুনীল আমার নাম। যদিও ব্রাহ্মণকুলে জন্ম, কিন্তু জ্ঞানের অভিমানের বদলে ভালোবাসার শক্তিতেই আমার বেশি বিশ্বাস। তাই ভালোবাসার এই অমরগাথা শোনাতে চেয়েছি। আমার বাকশক্তি সীমিত, আমার ভাষাজ্ঞান সীমিত, আমি জানি না শব্দের ঝংকার, জানি না বর্ণনার ছটা! আপনারা গুণীজন, আপনারা বহুদর্শী, রসজ্ঞ সহৃদয়— আপনাদের সভায় ভরসা করে এ গান শোনালাম। এ গান শুনলে, যে দুর্বল সে আবার

শক্তি ফিরে পায়। ভালোবাসায় যার অবিশ্বাস এসেছে, সে আবার ভালোবাসায় বেঁচে ওঠে। যার জীবনে কখনো ভালোবাসা জাগেনি, এ গান শুনলে সেই পাথরের বুক ভেদ করে বেরিয়ে আসে ঝরনা। এই ভালোবাসার গান শুনলে মানুষ মরতে ভয় পায় না। ভালোবাসা ছাড়া জীবন হয় না, যেমন দুঃখ ছাড়া ভালোবাসা হয় না। ভালোবাসার জাত নেই, গোত্র নেই, ধর্ম নেই।'

উদ্ধৃতাংশটুকু ১৩৭২ বাংলা সালে প্রকাশিত প্রথম জীবনে তরুণ বয়সের সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের, যখন তিনি আজকের সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় হননি, সে সময়কার সোনালি দুঃখ থেকে নেওয়া।

সেই শুরু থেকেই সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন প্রকৃত কবিদের মতোই দানশৌণ্ড, যিনি সূর্যাস্তের পর সুরাচার্যে অভিষিক্ত হয়েও অবলীলায় বাংলা সাহিত্যকে প্রতিনিয়ত সমৃদ্ধ আর সুধাসিক্ত করে গিয়েছেন।

বাংলাদেশের মাদারীপুরের পূর্ব মাইজপাড়ায় জন্মালেও দেশভাগের বহু আগে শিক্ষক পিতার কর্মসূত্রে গোটা পরিবারই কলকাতায় চলে গিয়েছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় জাপানি আগ্রাসনের আতঙ্কে বাবা কলকাতায় থেকে গেলেও গোটা পরিবারকে মাদারীপুরের গ্রামের বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তখন এক বছরের মতো তাঁদের গ্রামের বীরমোহন স্কুলে পড়াশোনার চমকপ্রদ বিবরণী সুনীল নিজেই লিখে গিয়েছেন তাঁর অননুকরণীয় ভাষায়। অবশ্য পরবর্তীকালে দেশে আসার প্রচুর সাদর আমন্ত্রণ সত্ত্বেও তিনি তাঁর ছেলেবেলার স্মৃতি বিনষ্ট হওয়ার সম্ভাব্য কারণে কখনও সেখানে ফিরে যেতে রাজি হননি। পরে 'পূর্ব পশ্চিম' লেখার সময় কানাডায় তাঁর ফেলে আসা গ্রামের এক ছেলে, যাকে তিনি পরবর্তীকালে শুধু জন্মসহোদর বলে সম্বোধন করেই ক্ষান্ত হননি, তাঁর আতিশয্যে সপরিবারে অর্থাৎ স্ত্রী স্বাতী, ভাই অশোক ও বোন কণাকে নিয়ে ঘুরে গিয়েছেন। দেখা গিয়েছে, তিনি তাঁর বাল্যকালের সামান্যতম স্মৃতিভ্রষ্ট হননি।

বাংলাদেশের প্রতি ছিল তাঁর এক অপত্য টান। বারবার বাংলাদেশের লেখকদের লেখা প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বলেছেন, 'ঢাকাই একদিন বাংলা সাহিত্যের রাজধানী হবে।' তাঁর এই ভবিষ্যদ্বাণী যে অক্ষরে অক্ষরে ফলবে, তিনি তা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন।

বাংলাদেশের ব্যাপারে তাঁর যে দুর্বলতা, সেটা দেখা গিয়েছিল যখন তাঁর বইগুলো এখানে একটার পর একটা পাইরেসি হচ্ছিল তখন। সেটা তিনি হাসিমুখেই মেনে নিয়েছিলেন।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়-এর প্রতি

হিন্দোল ভট্টাচার্য

দিকশূন্যপুরে চলে গেলে তুমি, দিগন্ত যেমন
ধীরে ধীরে চলে যায়, পিছনে দৌড়য় ছায়া, উড়ন্ত আগুন।
কলকাতার মধ্যরাত, একবুক রাস্তা জুড়ে শ্মশান তখন।
তোমার রাস্তায় আর কোথাও কখনো কোনও ওয়েটিং রুমে
অপেক্ষার কথা নেই, যাব না কোথাও, আজ শহরের চোখে
বড় ঘুম জমে আছে, বড় চাপা অভিমান নীরার দুঠোঁটে...
এতদিন পরে দেখো, পা মিলিয়ে সেও আজ তোমার রাস্তায়;—
কোথায় যে যাবে? এই শহরের মোড়ে মোড়ে তোমার কবিতা
তার হাত ছুঁয়ে আছে, তুমি নেই, সেও চলে যাবে?
পাপ ও দুঃখের কথা নশ্বর সময়ে মিশে গেলে
শান্তিজল দাও তাকে, কেউ কথা রাখেনি ভেবো না।

কবি যদি চলে যায়, কবিতা কি চলে যেতে পারে?

নীরাকে নিবেদিত

কৌশিক বন্দ্যোপাধ্যায়

অনেক বছর পরে আবার ফিরে এলে নীরা
যখন শান্ত শোবার ঘরে স্থবির প্রেয়সীরা
নিরুপদ্রব ঘুমে দ্রব, চাঁদ-ও আধো-নেভা
সেলফোনটাও ক্লান্ত ডেকে, বন্ধ পরিষেবা
মাঝরাস্তায় প্রেমিক পাকড়ে পুলিশে নেয় ঘুষ
ঘুমায় আমার বয়স, কেবল জাগছিল একুশ—।

কলকাতাও কি তোমার জন্য রাত্রি জাগে নীরা?
ডিপোর যত দোতলা বাস, রাতের প্রহরীরা
প্রেমের ভাঙাগড়ায় যারা তোমার কাছে ঋণী
লুপ্তস্বরে চেঁচিয়ে ওঠে, ওই এসেছেন তিনি—।
রাতের মাতাল স্যালুট করে, চকিতে তার হুঁশ
ফিরলে দেখে তারও মনে ঘা দিল একুশ।

এই শহরে একলা মেয়ে, এবার এসো নীরা—
প্রশ্ন এখন অবশ করে শিরা ও উপশিরা
কুমারী না কুলত্যাগী, তোমার সাদা সিঁথি
লক্ষ বছর পুড়ছে প্রেমের অম্লান উদ্ধৃতি
তার ছাইয়ে ক্ষত এঁকে বইছে যারা ক্রুশ
তারা একুশ, নীরা, তারা তোমারও একুশ।

ধোঁয়ায় অন্ধ চোখ আমার বিষ মাখানো তীর
পোড়ো নীরা, পুড়ুক তবে কবিরও শরীর।

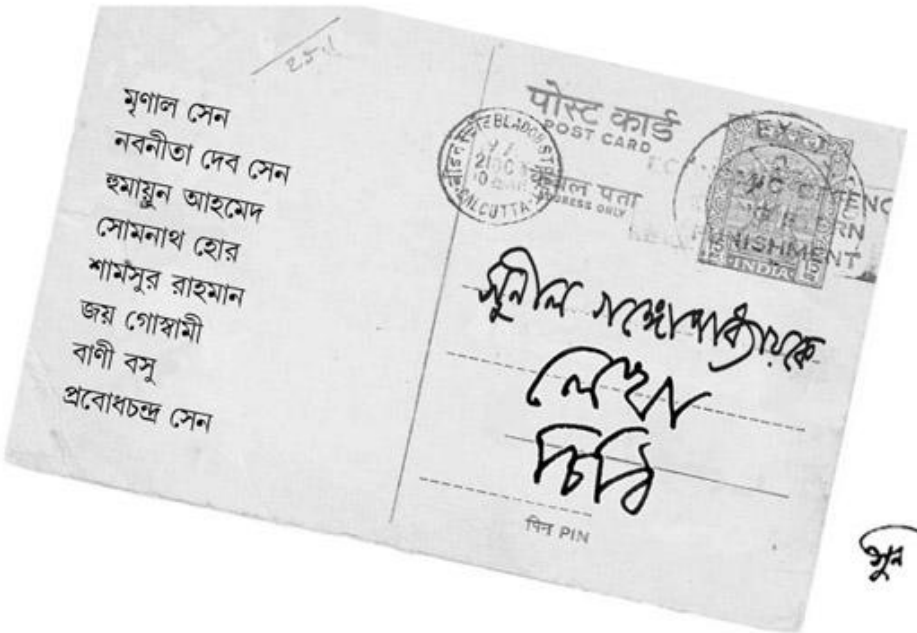

সংকলন ও টীকা

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কে লেখা স্বনামখ্যাত বিভিন্ন গুণীজনের চিঠি এখানে কয়েকটি পর্বে প্রকাশিত হচ্ছে। এই সংখ্যায় সপ্তম পর্ব। ১৯৫৪ সাল থেকে অর্ধ শতকের অধিক কাল জুড়ে সুনীলকে লেখা বহু বিশিষ্টজনের এই পত্রগুচ্ছ পড়তে পড়তে আমার চোখে পড়ে গেল বাংলা সাহিত্যের এক বিস্ফোরক সময়ের বহুবর্ণ আঁকিবুকি, প্রায় যেন পাথরের ভাঁজে জীবাশ্মের মতো, অথবা হয়তো বাংলা কবিতার এক নতুন বাঁকের রেখাচিত্র।

সদ্য প্রকাশিত বই থেকে চিঠিগুলি পুনঃপ্রকাশের সানন্দ সম্মতি জানিয়ে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় আমাদের কৃতজ্ঞ করেছেন। কৃতজ্ঞতা জানাই পত্রলেখকদের উদ্দেশেও। সব শেষে প্রকাশক গৌতম সেনগুপ্তকে ধন্যবাদ। তাঁর উদ্যোগ ছাড়া একসঙ্গে এত চিঠি হয়তো দেখাই যেত না। —সম্পাদক

মৃণাল সেনের চিঠি

Mrinal Sen
14, Beltola Road
Calcutta-700 026
India.

অক্টোবর ১৮, ২০০০

সুনীল,

বহুদিন এমন লেখা পড়িনি। রাণু ও ভানু। কে যেন বলেছিল, এইরকমই একটা কিছু লিখবেন আপনি, কিন্তু কল্পনা আর ইতিহাসের এমন এক অসাধারণ যুগলবন্দি হবে ভাবতে পারিনি। এর জুড়ি পাওয়া ভার। রান্নাঘরের ভাষায় 'নালেঝোলে' মিশিয়ে দিয়েছেন দুটোকে—ফিকশন আর ইতিহাস। একথা বলব না যে পড়ুয়া হিসেবে দুচার জায়গায় এক-আধটু হোঁচট খাইনি। তবে, এমনও হতে পারে খামতিটা আমারই। সব মিলিয়ে টেবিল চাপড়ে বলতেই হবে। বলব: অভিনব, এবং সব ছাপিয়ে, অসামান্য, মহৎ।

শুধু একটাই কথা। শেষে দেখছি, রাণু দাঁড়িয়ে একা আর ভানুদাদা হালকা কুয়াশায় ধীরে ধীরে মিলিয়ে যাচ্ছে দূরে। যেন, হিসেব মেলানো হলো না। কেউই পারল না মেলাতে। অনবদ্য। তারপরেও কি টুকরো টুকরো কবিতার লাইন অকৃপণ হাতে ঐ ভাবে ছড়িয়ে দেওয়াটা এত-ই জরুরি ছিল? শেষের এই মুহূর্তে কি জরুরি ছিল না রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'হৃদয়ের মিতব্যয়িতা'? কোনো লোকসান হত কি? অপূর্ণ থাকত কি কিছু? ভোরের আলোয় শিশির ভেজা ঘাসে শিউলি ফুল মাটিতে ছিটিয়ে ছড়িয়ে থাকে জানি। কিন্তু যেখান দুজনের সম্পর্ক অসম্পূর্ণ পরিসমাপ্তিতে নিয়ে এসে ছেড়ে দিয়েছেন, অনন্য, সেখানে শিউলি ফুলই বলুন অথবা কবিতার টুকরো টুকরো লাইনের ছড়াছড়ি—তা কি পরিমিত গোপনীয়তাকে বে-আব্রু করে দেয় না? কিঞ্চিৎ অতিকথন হয়ে পড়ে না কি?

বিদগ্ধ জন হয়তো বলবেন, আহা, মধুর, কিন্তু আমি কেমন যেন অস্বস্তিতে পড়ে গিয়েছিলাম—তা সে যত সামান্যই হোক না কেন। দোহাই আপনার, আমাকে বেজায় বোকা ঠাওরে নেবেন না। শেষ কথা। কতটা ফিকশন কতটা ইতিহাস এবং গল্প জমাতে গিয়ে কোথাকার ইতিহাস কোথায় জুড়ে দিয়েছেন, এলোমেলো, পাঠক হিসেবে তা আমার জানার আগ্রহ নেই ছিটেফোঁটাও। তবু, গোপনে গোপনে সত্যানুসন্ধানের আবেগটাকে কিছুক্ষণের জন্য দাবিয়ে রেখে তথ্যানুসন্ধানীর কৌতূহল জাগে—কোথায় কি ভাঙচুর করেছেন জানতে ইচ্ছে করে। আর কাউকে নয়, শুধু আপনাকেই এই অশৈল্পিক প্রশ্ন করা চলে। তবে, এখন নয়। প্রশংসার বানে প্লাবিত হন আপাতত।

আর, দেশ পত্রিকার সেই কবিতার কথাটাও না বলে পারছি না। আমি, গীতা আর কুণাল—আমাদের ছেলে—(হঠাৎ অফিসের কাজে এক সপ্তাহের জন্য আসতে হয়েছিল দিল্লি-মুম্বাই-চেন্নাই-বাঙ্গালোর-পুনায়, দিল্লিতেই দেখা

হয়েছিল, দুদিনের দেখা)—আমরা তিনজনেই নিজেদের খুঁজে পেয়েছিলাম আপনার কবিতায়, আপ্লুত হয়েছি, বেদনাবোধের একটু ছোঁয়াও পেয়েছি। 'জন্মদাতার কাঁচা পাকা চুলে' হাত বুলিয়ে দেওয়ার সময় ছেলের চোখে জলের আভাস-ও দেখেছি।

সত্যিই, আপনি মাতিয়ে দিয়েছেন, সুনীল।

আপনারা আমাদের ভালোবাসা নেবেন। ইতি

মৃণাল সেন

নবনীতা দেব সেনের চিঠি

৩০/৯/৭৩

প্রিয় সুনীল

কাল 'ফ্যান-মেইল' কবিতার উৎসসন্ধানীদের ভ্রমসংশোধনে বাধ্য হয়েছি বলেই আপনাকে প্রেম নিবেদনে আমার মোটে উৎসাহ নেই— এমনটি কিন্তু ভুলেও ভাববেন না! 'পাঁচজনে পারে যাহা আমিও পারিব তাহা'— কিন্তু তাই বলে ছাপার হরফে, দশ দিশি সচকিত করে? একটা পাবলিক ন্যুইসেন্স সৃষ্টি করে?

সত্যান্বেষী শুভানুধ্যায়ীরা আমার কবিতার অঙ্গচ্ছেদ করবার আগে কবিতাটি আরেকবার পড়লেই বুঝতেন এ-ধরনের প্রকাশ্যতা কেবল অতীত নায়কের উদ্দেশ্যেই সম্ভবপর। যে-কোনো সূক্ষ্ম অনুভূতিকে খুন করতে এমনি পাবলিসিটি সবচেয়ে ক্ষুরধার অস্ত্র— অতএব যে কোনো ভবিষ্যৎ নায়কের উদ্দেশে এমন হানিকর প্রকাশ্যতা অসম্ভব! আমার ধারণা ছিলো কবিতাটির নায়ক খুব স্পষ্ট! যাঁরা বিচলিত হয়েছেন, আমার রুচি বা প্রকৃতি বিষয়ে ধারণা থাকলে তাঁদের এ ভুলটি হোতো না।

অবাঞ্ছিত দুর্ঘটনায় অনেক সময়ে অনেক সুকুমার সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যায়। আপনি ও স্বাতী আমার প্রিয়জন— আমার কাছে আপনাদের বন্ধুতা মূল্যবান। আমি চাই না আমাকে বেহায়া ভেবে আপনারা ভুল বোঝেন।

প্রীতিমুগ্ধ
নবনীতা

আপনার কবিতা পড়া খুব ভালো লেগেছিলো কাল— বিশেষত 'মনে পড়ে না, মনে পড়ে না মনে পড়ে না', এবং 'কেউ কথা রাখেনি'।

• • •

কাজিরাঙ্গার বন
২৭.১০.৭৭

প্রিয় সুনীল

কাজিরাঙ্গার জঙ্গলে তোমার আসা হয়নি বলে দুঃখু কোরো না। মানস ঢের বেশি সুন্দর। কিন্তু কাজিরাঙ্গা তোমার এমনিতেই হবে। এখানে এখন তোমার এক বন্ধু আছেন, একটা Tourist Resort বানিয়ে। ডিগ্‌বয়ে তুমি এঁদের কাছে উঠেছিলে। জগদীশ ফুকনকে নিশ্চয় ভোলোনি? ওঁরা তোমার কথা বারবার বলছেন। ভাগ্যক্রমে আমিও ওঁদেরই অতিথি হয়েছি। যেদিন খুশি কাজিরাঙ্গাতে চলে এসো। স্বাতী-পুপ্‌লুকে নিয়ে।

ভয়ানক অসমীয়া পাহাড়ী বর্ষা নেমেছে। কাল এই প্রবল tropical monsoon এর মধ্যেই সাড়ে তিনঘণ্টা 'হস্তীপৃষ্ঠে নবনীতা'র মহড়া দিয়েছি। খালবিল জলাজঙ্গলে ঘুরে ঘুরে ভীতচকিত বর্ষাতাড়িত কিছু করুণ জন্তু দর্শন করেছি। বুনো মহিষ, গণ্ডার, হাতি, বরাহ প্রভৃতি। আর পেলিকান পাখি। আর ঈগল পাখি। আর কত হরিণ!

আমার শরীরটা মোটে ভালো নেই। জানি না বম্‌ডিলা, কোহিমা ইত্যাদি যেতে পারবো কিনা। ফুসফুস বিঘ্ন ঘটাচ্ছে। আজ তেজপুরে যাচ্ছি। এখানে একটা ছোট্ট কুঁড়েঘরে দুরাত্রি থাকলুম। ঠিক পিছনেই একটা পাহাড়ি নদীর ওপারে কাজিরাঙ্গার জঙ্গল। আর সামনে মিকির পাহাড়। চারপাশে কলাবন বাঁশবন কচুবন সুপুরিবন ইত্যাদি।

রাত্রে আশ্চর্য সব বন্য শব্দ শুনতে পাই। কুঁড়েঘরে আমি একা। দুশো গজ দূরে অন্যান্য কুঁড়েঘরে অন্যান্য মানুষ। এ চিঠি পেতে পেতে স্বাতী পুপ্‌লু ফিরবে। সবাইকে ভালবাসা। কৃত্তিবাসে আমার উপন্যাসটা পড়লে? তোমার যথার্থ মতটা জানিয়ো। পড়োইনি তো। না?

একাকিত্বের একটা নেশা আছে সুনীল। পারলে আমি আর ফিরে যেতুম না। ফিরতে ইচ্ছে করছে না। সেখানেও তো একাই।

নবনীতা

হুমায়ূন আহমেদের চিঠি

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ও হুমায়ূন আহমেদ। শোকেও মিলিয়েছেন দুই বাংলাকে।

জনাব সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

শ্রদ্ধাস্পদেষু

সুনীলদা, মাজহারের' কাছে শুনেছি, আপনি আমার বড় মেয়ের বিয়েতে আসতে রাজি হয়েছেন। নিজে এসে আপনাকে এবং স্বাতীদিকে নিমন্ত্রণ করা উচিত ছিল। শরীরটা বেশ ভাল না, এবং "দুই দুয়ারী" নামের যে ছবিটি বানাচ্ছি তা নিয়ে অসম্ভব ব্যস্ত। চিঠি দিয়ে দাওয়াত করছি। এই অপরাধ ক্ষমা করে দেবেন।

বিয়ের আসরে আমার মেয়ে আপনাদের

একাকিত্বের একটা নেশা আছে সুনীল। পারলে আমি আর ফিরে যেতুম না। ফিরতে ইচ্ছে করছে না। সেখানেও তো একাই।

দু'জনকে দেখে খুশিতে ঝলমল করে উঠবে এই দৃশ্য কল্পনায় দেখতে পাচ্ছি। এবং আনন্দে আমার চোখ ভিজে যাচ্ছে।

বিনীত
হুমায়ূন আহমেদ
৬.১২.২০০০

১ মাজহারুল ইসলাম, বাংলাদেশের 'অন্যদিন' পত্রিকার সম্পাদক।

সোমনাথ হোরের চিঠি

শ্রীসুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, 'দেশ'

২৭.১২.৯২

প্রিয়বরেষু

সাম্প্রদায়িকতা বিষয়ে বক্তব্য পাঠালাম।[১] কয়েকদিন ধরেই বিচলিত বোধ করছিলাম। ছেচল্লিশের দাঙ্গাও দেখতে হয়েছে। দুটো দুই জমানায়। দুরকম চরিত্র। কিন্তু পেছনের কর্তারা মোটামুটি একই চেহারায়। আর সাধারণের ধর্মবুদ্ধিও লোপ পাচ্ছে দ্রুত লয়ে। আমার লেখার গাঁথুনি বিশেষ থাকে না, এলোপাথাড়ি লিখে যাই, পরে কাটাকুটি করে সাজাবার চেষ্টা করি। অপরিবর্তিত রেখে ছাপাবার উপযুক্ত মনে করলে ছাপাবেন, বানান ভুল থাকলে অবশ্যই শুধরে নিতে হবে। কোনও কারণে প্রকাশিতব্য নয় মনে করলে, না ছাপিয়ে ফেরত পাঠিয়ে দেবেন। বিন্দুমাত্র দুঃখিত হব না।

নববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানালাম।

সোমনাথ

পুনঃ অরূপবাবু[২] এসেছিলেন। উনি বললেন আমার 'ক্ষত' পর্বের কয়েকটি আলোকচিত্রের ব্যবস্থা করতে। Seagull-নবীনকিশোরের সঙ্গে যোগাযোগ করলে কিছু Transparency পাওয়া যেতে পারে। এছাড়া সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির উপর আমার করা একটা ব্রোঞ্জের ছবিও তাঁদের কাছে থাকার কথা। ওখানে সংগ্রহ করা গেলে এখানে বাড়তি পরিশ্রমের প্রয়োজন হবে না।

আন্তরিক প্রীতিসহ—

সোমনাথ হোর
শান্তিনিকেতন

১ ৬ ডিসেম্বরের বাবরি মসজিদ ঘটনার অভিঘাতে।

২ শ্রী অরূপ সরকার, আনন্দবাজার পত্রিকা গোষ্ঠীর অন্যতম পরিচালক।

• • •

আমি ভাবতেই পারি নি, বাবরি মস্‌জিদের ধ্বংসস্তূপের উপর যখন 'সংস্কৃতি মিনারে'র স্বপ্ন দেখছি, তখনই এলাহাবাদ হাইকোর্ট রামলাল্লার পূজোর মত একটা অসংস্কৃত, অসাংস্কৃতিক নির্দেশ দান করবে।

শান্তিনিকেতন
৫.১.৯৩

প্রিয়বরেষু

আপনার ৩১/১২/৯২ তারিখের চিঠিখানি ক্যুরিয়ার সার্ভিসে আজ পেলাম। আশাকরি ইতিমধ্যে সমীরণ নন্দীর তোলা বেশ কয়েকখানি স্লাইড আপনার হাতে পৌঁছেছে। তাতে সাদার-ওপরে-সাদা পর্বের চারখানি transparencyও থাকার কথা। WOUNDS-এর ২০ পৃষ্ঠার ছবিটির transparencyও তোলা হয়েছে। সেক্ষেত্রে SEAGULL-এর ছবির প্রয়োজন হয়ত আর হবে না।

রচনাটি ভাল লেগেছে শুনে অবশ্যই ভাল লাগে। তবে ভাবনা এবং ভাষা সম্পর্কে আমার দুর্বলতা সম্পর্কে আমি সজাগ। তবু এমন কিছু ঘটনা ঘটে যায়— যখন চেঁচিয়ে কিছু বলতে ইচ্ছে করে। সেটা নিজেরই জন্য; অন্যরা মূল্য দেবেন বলে নয়। বর্তমান আমাদের অনেক ভাবনাকে আবর্জনাস্তূপে নিক্ষেপ করেছে। আমি ভাবতেই পারি নি, বাবরি মস্‌জিদের ধ্বংসস্তূপের উপর যখন 'সংস্কৃতি মিনারে'র স্বপ্ন দেখছি, তখনই এলাহাবাদ হাইকোর্ট রামলাল্লার পূজোর মত একটা অসংস্কৃত, অসাংস্কৃতিক নির্দেশ দান করবে। মনে বড় কষ্ট হয়, যখন ভাবি যে, ভারতের বুদ্ধিজীবী, সংস্কৃতিকর্মীরা এই তাণ্ডবের গুরুত্ব বুঝতে পারিনি; আমরাই হয়ত মিলিত উদ্যোগে এই আঘাত ঠেকাতে পারতাম কিন্তু পার্লামেন্ট নামক এ খোঁয়াড়ের বাসিন্দাদের উপর ভরসা রেখে এবং দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে ভারত-হৃদয়কে বহুখণ্ডিত করলাম। সংস্কৃতির উপর আঘাত কত ভয়ংকর হতে পারে, তা ভাবতেও শিউরে উঠছি। কারণ এবারের সংঘাত অন্তঃসংস্কৃতির অলিতে গলিতে প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে ছড়িয়ে পড়বে। বিশ্বাস এবং বৃদ্ধত্ব দুই-ই বড়ো ঘা খাচ্ছে। তবু আশা রাখব মহাপ্রলয়ের পরও অমৃতস্য পুত্ররা উঠে দাঁড়িয়ে নতুন প্রভাতকে স্বাগত জানাবে। ভাবী প্রজন্মের জন্য এই কামনাই করে যাব।

আপনার লেখা 'প্রথম আলো' পড়তে শুরু করেছি। ভাষা, উপস্থাপনা এবং ডিটেল্‌সের জন্য কারও কারও লেখা আমি শরীরমন দিয়ে পড়ি। আপনিও তাঁদেরই একজন। আমি চোখের অস্বস্তির কারণে লেখাপড়া কম করতে পারি। ধীরে ধীরে পড়ি। যা ভালো লাগে, তার জন্য যেমন করে হোক্ সময় করে নিই।

আপনারা ভাল থাকুন— এই কামনা করে থামছি।

সোমনাথ হোর

শামসুর রাহমানের চিঠি

দৈনিক বাংলা
১ ডি আইটি অ্যাভিনিউ
ঢাকা ২
বাংলাদেশ
১৩/৮/৮৬

প্রিয় সুনীল,

তুমি মার্কিন মুলুকে কবিসম্মেলনে[১] শরিক হয়েছো জেনে খুশি হয়েছি। এ বিষয়ে তোমার চমৎকার লেখাটিও পড়লাম 'দেশ'-এ। বেশ ভালো লাগলো। ঈর্ষণীয় তোমার লেখার ক্ষমতা। তোমার রচনা-সম্ভারের সঙ্গে যখন নিজের রচনার তুলনা করি তখন নিজের ফসলকে কত কৃশ ও দীন মনে হয়। তা ব'লে ভেবো না তোমাকে হিংসা করি, তোমার সাফল্য ও বিচিত্রগামী প্রতিভা আমাকে মুগ্ধ করে, বিস্মিত করে। একজন বন্ধুর সার্থকতার রোদ আমিও কিছুটা পোহাই।

যাকগে, শারদীয় 'দেশ'-এর জন্যে একটি কবিতা পাঠিয়েছি তোমার উদার, সর্বকালীন আমন্ত্রণের কথা মনে রেখে। লেখাটি তোমার

ভালো না লাগলে ছেপো না। আমি কিছু মনে করবো না। তবে তুমি সেটি পেলে কিনা এবং তোমার পছন্দ হলো কিনা এ বিষয়ে যদি শীগগীরই দু'চার পংক্তি লিখে জানাও তাহলে উদ্বেগমুক্ত হতে পারি।

আশা করি ভালো আছো এবং বরাবরের মতোই খুব লিখছো। কয়েকদিন আগে তোমার ও স্বাতীর জন্যে আমার একটি কবিতার বই, 'অবিরল জলভ্রমি' পাঠিয়েছিলাম। পেয়েছো তো? স্বাতীকে বোলো যে ওর কথা খুব মনে পড়ে। আর তোমার কথা তো ভোলার উপায় নেই! স্বাতীকে আমার প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিও।

ভালোবাসা।

শামসুর রাহমান

---

১ ওয়ার্ল্ড পোয়েট্রি কনফারেন্সের আমন্ত্রণে যুগোস্লাভিয়ায়, তারপর ভারত উৎসবে যোগ দিতে আমেরিকার আটটি শহরে ঘোরা।

• • •

১৮/৫ তল্লাবাগ (শুক্রাবাদ)
দোতলা
পো: মোহাম্মদপুর
ঢাকা ১২০৭
বাংলাদেশ
১৪/৬/৮৮

প্রিয় সুনীল,

কেমন আছো? এখন আমি বেশ কিছুটা সুস্থ আছি। দুটো ওষুধ দেড় বছর চালিয়ে যেতে হবে, একটি আমৃত্যু। শারদীয় 'দেশ'-এর জন্যে কবিতা চেয়ে সাগরদা আমাকে একটি দাপ্তরিক চিঠি পাঠিয়েছিলেন। আমি কয়েকদিন আগে তোমার কাছে একটি কবিতা পাঠিয়েছি। সেটি তুমি পেলে কিনা, যদি পেয়ে থাকো তবে লেখাটি তোমার কেমন লাগলো জানতে পারলে খুশি হবো। আমার একটি কবিতা তোমার ফাইলে হয়তো রয়ে গেছে; সেটা ছাপার দরকার নেই। কারণ, ইতিমধ্যে কবিতাটি গ্রন্থভুক্ত হয়ে গেছে।

স্বাতী কেমন আছে? তোমাদের কথা প্রায়শই মনে পড়ে, বন্ধুত্বের বুনিয়াদ পাকাপোক্ত হ'লে দূরত্ব সেই ভিতটাকে সহজে নড়বড়ে করতে পারে না বলে আমার বিশ্বাস। গৌরদা, সাগরদা ও নীরেনদাকে আমার সালাম জানিও। শক্তির খবর কী? আমিনদের সঙ্গে দেখা হয়? 'দেশ'-এ প্রেমেন্দ্র মিত্র বিষয়ক তোমার লেখাটি ভালো লাগলো। প্রেমেন্দ্র মিত্রকে যতটা অবহেলা করা হয়েছে তা তাঁর প্রাপ্য ছিলো না, মনে করি। আমার এই ধারণার প্রতি তোমার সায় আছে কি নেই জানতে পারলে ভালো লাগবে। 'দুই বাংলার ভালবাসার কবিতা'র ভূমিকার' কি খুব শীগগীর প্রয়োজন হবে?

তোমার চিঠির প্রতীক্ষায় আছি। ভালোবাসা জানাই।

শামসুর রাহমান

পুনশ্চ: আমার ঠিকানা বদলে গেছে। এখন থেকে উপরের ঠিকানায় চিঠি পাঠিও।

---

১ ভূমিকা শামসুর শেষ পর্যন্ত লিখতে পারেননি। সম্পাদকীয় হিসেবে যৌথনামে ছাপা হয়েছে আমারই লেখা।

জয় গোস্বামীর চিঠি

শ্রীসুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

শ্রীচরণেষু,

সেদিন, আচমকা গিয়ে আছড়ে পড়েছিলাম আপনার কাছে। আর আপনি যে-স্নেহে, আর বৌদি যে-মমতায় সেদিন শান্ত করেছিলেন আমাকে, তা আজীবন আমার সঞ্চয় হয়ে থাকবে।— কিন্তু আমার সেই দহনের কোনো শেষ নেই। প্রতিদিন যেন দাউদাউ ক'রে বেড়ে চলেছে। একমুহূর্ত স্থির থাকতে পারছি না, এক মিনিটও। এই পৃথিবীর সবচেয়ে দুর্বল আর অস্ত্রহীন মানুষদের মধ্যে আমি একজন। মুহূর্তে মুহূর্তে চুরমার হয়ে ছিটকে পড়ছি ভেতরে ভেতরে। কিন্তু টুকরোগুলোকে তুলে এনে জোড়া দেওয়ার কিছুমাত্র সাধ্য আর অবশিষ্ট নেই আমার।— আপনি সমস্ত মানুষের মনের কথা রচনা করে চলেছেন। আপনি জানবেন, বুঝবেন যে, এই সব মুহূর্তে কেবলই নিজেকে শেষ ক'রে ফেলতে ইচ্ছে হয়। আমারও হচ্ছে, মাঝে মাঝে তীব্রতম হয়ে উঠছে। কিন্তু আমার বেঁচে থাকতে ভালো লাগে। অনেক কষ্ট সহ্য করেও বেঁচে থাকতে ইচ্ছে করে, সুনীলদা, আজো ইচ্ছে করে। কিন্তু, এই জ্বালা এই কষ্ট আমাকে সহ্যের সমস্ত সীমার ওপারে ঠেলে ফেলতে চাইছে।— আমি আর পারছি না।— আপনি আমাকে কোনো ভালো মনচিকিৎসকের কাছে পাঠিয়ে দিন। যিনি আমাকে মমতা আর সহানুভূতি নিয়ে দেখবেন। যিনি সব সময়ের এই কষ্ট সারিয়ে দেবেন। আমি পুড়ছি, ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধ'রে ঘাড় গুঁজে পুড়ছি সুনীলদা। এর আগে একাধিকবার আপনি আমায় ঠিক মানুষের কাছে পাঠিয়েছেন। এবারও আমাকে ভালো ক'রে দিন। আমাকে ভালো ক'রে দিন।

বৌদিকে আমার প্রণাম জানাবেন। আবার একদিন ওঁর কাছে নিশ্চয়ই যাবো।

প্রণত
জয়

আমার তো শরীরেরও নানা অসুবিধে আছে। এমন কোনো সাইকিয়াট্রিস্ট কি নেই যিনি আমার কথা স্নেহমমতার সঙ্গে শুনবেন। — নইলে আমি কী করবো?

জয়

প্রেমেন্দ্র মিত্রকে যতটা অবহেলা করা হয়েছে তা তাঁর প্রাপ্য ছিলো না, মনে করি। আমার এই ধারণার প্রতি তোমার সায় আছে কি নেই জানতে পারলে ভালো লাগবে।

বাণী বসুর চিঠি

১২.৭.৯২

প্রিয় সনাতন পাঠক এবং নীলু,

সনাতন পাঠককে এক সময়ে গোগ্রাসে পড়তাম। নীলুর তো নিশ্চয়ই আমি বউদি হবো। এই দুটি অবস্থান থেকে আমার আজকের চিঠি। কিছুদিন আগে সতীনাথ ভাদুড়ি আর জগদীশ গুপ্তর মূল্যায়ন করেছিলেন।[১] বেশ লেগেছিল। বাগাড়ম্বর নেই। কান্না পাওয়ার কথা সহজে স্বীকার করে নেওয়া এবং তাকে সাহিত্য-বিচারের একটি মাপ-কাঠি স্থির করা অত্যন্ত সরল। এই সনাতনকে আমার সভয়

জিজ্ঞাসা—১—মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি মূল্যায়ন কি তিনি করবেন? বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথের মতো সাহিত্য-ব্যক্তিত্বদের নিয়ে সনাতন unconventional মন্তব্য করতে দ্বিধা করেন না যখন, তখন বর্তমান establishment-এর ভয়ে মাণিক সম্পর্কেও তাঁর নিজস্ব মতামত লিখতে বাধ্য থাকার কথা নয়। 'ঢোঁড়াইচরিত' একটি সর্বদেশের সর্বকালের অবিস্মরণীয় শিল্পকর্ম, অনেকটা পিকাসোর রচনারীতির মতো। এ জিনিস আর হবে না। হলে অনুকরণ হবে। কিন্তু 'তিন বাঁড়ুজ্জে' বলে বিখ্যাত আপ্তবাক্যটি আমাকে বড়ো ধাঁধায় ফেলে। মাণিক প্রতিভাবান ছিলেন সন্দেহ নেই। ছোট গল্প লিখেছেন ভালো ভালো, কিছু অসাধারণ, কিন্তু তাঁর উপন্যাস? বিভূতিভূষণ, তারাশংকর এবং মাণিক? কি জানি, কেন যে 'পুতুলনাচের' এতো নাম, আমি সত্যিই বুঝতে পারি না! পিতা-পুত্রের সম্পর্কটি ছাড়া আর সমস্ত কিছু এমন খাপছাড়া, মনগড়া, written with a vengeance মনে হয়! অন্যগুলো-তো পড়া যায় না! এর মধ্যে 'জননী'— তার শেষ পংক্তিগুলোর গুণে উৎরে যায়। একটু বুঝিয়ে দেবেন? বা প্রবন্ধ লিখবেন? এবারের দেশে মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আত্মহত্যার অধিকার— নামে articleটি পড়লাম। তাতেও উত্তর পেলাম না। এ পত্রটি confidential. আপনার কাছেই শুধু প্রার্থনা।

দ্বিতীয়— ধন্যবাদ জানাই। আপনি মাঝে মাঝে বড় সুন্দর সুন্দর খবর সরবরাহ করেন, আবারও নীললোহিত সরলতার ও বিনয়ের সঙ্গে, যার সঙ্গে সূর্য-র অবিনয় একেবারেই খাপ খায় না। যদিও সূর্য ও নীলু দুজনেই আমার খুব প্রিয়। আলেন গিনসবার্গ এবং বলবন্ত মডগাঁওকর সম্পর্কিত খবর দুটির জন্য ধন্যবাদ। এর আগেও একটি self-styled impressario-র কথা লিখেছিলেন, বিস্মিত হয়েছিলাম পড়ে আজকের পৃথিবীতে পরস্পরকে ল্যাং-মারার প্রতিভাই যেখানে সর্বোত্তম প্রতিভা বলে স্বীকৃত, সেখানে একজন মানুষ বিনা স্বার্থে প্রতিভা খুঁজে বেড়ান? না, মানুষের এখনও কিছু আশা আছে। ভদ্রলোকের নাম ভুলে গেছি। অর্থাৎ আমার কোনও আশা নেই। পৃথিবীর থাকলেও। এই অসাধারণ মানুষগুলির সংস্পর্শে আসতে পেরেছেন, আপনি সত্যি কী ভাগ্যবান! সে খবরগুলো আমাদের মতো গৃহবন্দীদের জন্য পরিবেশন করে থাকেন, কত কৃতজ্ঞতাই যে আপনাকে জানানোর আছে! অবশ্য আপনি লগনচাঁদা ছেলে! পৃথিবীর যতেক সৌভাগ্য আপনার জন্য নাকি সংগ্রহ করা হচ্ছে। শুনতে পাই। যাই হোক। পৃথিবী, চাঁদ এদেরও সম্পর্কে তাহলে হতাশ হবার কিছু নেই!

সেদিন নীরাকে দেখলাম। নীরাও কিঞ্চিৎ কৌতূহল নিয়ে দেখলেন আমাকে। ভবিষ্যতে আলাপিত হবার ইচ্ছে রইল। জানি এখন পুজোর লেখা নিয়ে ব্যস্ত আছেন।... যদি উত্তর না দেন বুঝব সব সজ্জনের অকালে চলে যাওয়াতে আপনার দুঃখ হয় না।

কিন্তু হে লগ্নচন্দ্র। আপনাকে অবিনীত জিজ্ঞাসা— বাণী বসুর একটি উপন্যাসও কি 'দেশে'র সমালোচনার যোগ্য নয়? বাণী বসুর হৃদয়ের গোলমাল দেখা দিয়েছে। অর্থাৎ ঘণ্টা বাজে (অ) দূরে। এবারে মাডগাঁওকার সম্পর্কে দুঃখ করেছেন— 'এমন গুণী, বিনয়ী, সজ্জন কেন অকালে চলে যায়।' বাণী বসুর সম্পর্কেও এই মন্তব্য করতে হচ্ছে শীগগীর! ইতিমধ্যে একটা সৎ সমালোচনা আশা করছি। সনাতন পাঠক এবং নীললোহিতের কাছে এই আমার দাবী। শীর্ষেন্দু 'অন্তর্ঘাত' প্রসঙ্গে বলেছিলেন উপন্যাসটি ভাবায় না। আজও লোকে ভাবছে। সম্প্রতি 'জিজ্ঞাসা'র লেখক শিবনারায়ণ রায়ের বন্ধু কোনও একজন ex-bureaucrat, গোটা দশেক চিন্তাশীল বই এর লেখক অরুণ ঘোষ (ব: ৭৫)-এর কাছ থেকেও চিঠি পেলাম। এইভাবে নানা লেখা সম্পর্কে চিঠি এসেই যাচ্ছে। 'পঞ্চম পুরুষ'-এর একটা সমালোচনা হাতে এসেছিল আনন্দবাজারে। হায়, রিভিউ-লেখিকা উপন্যাসটির অর্থ আদ্যন্ত হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন নি। তাঁর ধারণা পঞ্চম পুরুষ বা fifth male হচ্ছে এযার সন্তান। হায় সাহিত্য! হায় সমালোচনা। হায় বাণী বসু! সন্তান কি মায়ের কাছে পুরুষ? তিনি আবার আমাকে অশ্লীলতার দায়ে অভিযুক্ত করেছেন। আপনারা সব্বাই পার পেয়ে গেলেন— সঞ্জীব-সুনীল-সমরেশ-কবিতা-কেতকী-সব-স-ব। সব বেটাকে ছেড়ে দিয়ে কেন যে তিনি এই বেঁড়ে ব্যাটাকে ধরলেন জানি না। অথচ 'পঞ্চম পুরুষ'-এ আমি একটি অসাধ্যসাধন করেছি। পুরো imagery দিয়ে coitus-এর বর্ণনা করেছি যা আমার পক্ষে নারী হিসেবে স্বাভাবিক idiom বলে মনে হয়েছে। আমরা, অন্তত আমি এভাবে দেখি, এভাবে ভাবি। এই নতুন idiom-এর কথাই শিশিরমঞ্চে বলতে চেয়েছিলাম। যে বক্তৃতা আপনার ও আরও অনেকের ভালো লেগেছিল বলে শুনেছিলাম। জানি না তার কতটা ভদ্রতা, কতটা আন্তরিকতা। সাহিত্যিক এবং মানুষ হিসেবে নিজের সম্পর্কে বলতে পারি অপ্রিয় মিথ্যা বলি না, অপ্রিয় সত্য চট করে নয়। প্রিয় সত্য বলাটাকেই জীবনে principle হিসেবে বেছে নিয়েছি। নিজের ঢাক নিজে পেটালাম। একটুও লজ্জা করছে না। আপনার sense of humour এবং স্বচ্ছ দৃষ্টির ওপর কিঞ্চিৎ ভরসা আছে।

সেদিন নীরাকে দেখলাম। নীরাও কিঞ্চিৎ কৌতূহল নিয়ে দেখলেন আমাকে। ভবিষ্যতে আলাপিত হবার ইচ্ছে রইল। জানি এখন পুজোর লেখা নিয়ে ব্যস্ত আছেন। হয়ত উত্তর দিতে দেরি হবে। বেশি দেরি করবেন না। যিনি কলম খুললেই ঝরঝর করে গল্প-কবিতা-উপন্যাস-রম্যরচনা-প্রবন্ধ ঝরে পড়ে তিনি আন্তরিক চিঠির আন্তরিক জবাব দিতে পারবেন না, বা সময় পাবেন না— এ আমি বিশ্বাস করি না। যদি উত্তর না দেন বুঝব সব সজ্জনের অকালে চলে যাওয়াতে আপনার দুঃখ হয় না। সনাতন/নীলু/সুনীল সকলেরই ব্যথী নয়। বেছে বেছে কারও কারও ব্যথী।

নমস্কারান্তে—

বাণী বসু

---

১ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের আমন্ত্রণে সতীনাথ স্মারক বক্তৃতা হিসেবে লিখতে হয়েছিল জগদীশ গুপ্ত সতীনাথ ভাদুড়ী আর কমলকুমার মজুমদার বিষয়ে তিনটে বক্তৃতা। সেগুলি পরে ছাপা হয়েছিল 'দেশ' পত্রিকায়।

প্রবোধচন্দ্র সেনের চিঠি

শান্তিনিকেতন। ৩০.৫.১৯৭৮

শ্রীসুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

স্নেহভাজনেষু,

তোমার সঙ্গে আমার প্রত্যক্ষ পরিচয় নেই বললেই হয়। তবে তোমার লেখার আমি আগ্রহী পাঠক। তোমার লেখা হাতের কাছে পেলেই আমি সাগ্রহে পড়ি। তোমার ভাষার স্বাচ্ছন্দ্য এবং প্রসন্ন সৌন্দর্যে আমি মুগ্ধ হই। কিন্তু আমাকে সব চেয়ে আকৃষ্ট করে তোমার চিন্তার স্বাতন্ত্র্য, বৈচিত্র্য ও গভীরতা। তোমার অনেক লেখা পড়েই মাঝে মাঝে ইচ্ছা হয়েছে তোমাকে চিঠি লিখে অভিনন্দন ও আশীর্বাদ জানাই। দুটি উপলক্ষ এখন মনে হয়েছে। মহাভারতের কর্ণ সম্বন্ধে তোমার লেখাগুলি। তোমার লেখা হোমারের ইলিয়ড সমালোচনাটাও আমার মনকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছে। শুধু তাই নয়, আমার চোখ খুলে দিয়েছে। এসব লেখা কবে গ্রন্থাকারে বেরোবে? বেরিয়েছে কি না তাও জানি না।

অ-পূর্ব, অতুলনীয়। প্রাচীন সাহিত্য সমালোচনা আদর্শকে তুমি যে স্তরে উন্নীত করেছ, আমাদের দেশে তা অভাবিত, আশাতীত। বিদেশেও এর চেয়ে উন্নত আদর্শের সন্ধান পাই নি। তোমার এই লেখাগুলি বাংলা সাহিত্যে অক্ষয় হয়ে থাকবে। রামায়ণ সম্বন্ধে অনুরূপ আদর্শের একটা লেখা পড়েছিলাম বলে মনে পড়ছে, বোধ হয় 'দেশ' পত্রিকায়। ভুল করি নি তো? কিছুকাল আগে দেশ পত্রিকায় তোমার একটা দীর্ঘ কবিতা পড়ে অনুরূপভাবে মুগ্ধ ও অভিভূত হয়েছি। —এসব কারণে আমি তোমার ভবিষ্যৎ পূর্ণ বিকাশের দিকে ঔৎসুক্যের সঙ্গে তাকিয়ে থাকি। উঁচু পাহাড় থেকে স্বচ্ছ জলধারা যেমন স্বচ্ছন্দ গতিতে ঝরে পড়তে থাকে, তোমার লেখা যখনই পড়ি তখনই মনে হয় তোমার মনের উঁচু স্তর থেকে চিন্তা ও ভাষার স্বচ্ছ ধারা যেন তেমনি স্বচ্ছন্দগতিতে বয়ে চলে আসে পাঠকচিত্তের সমতল ক্ষেত্রে। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস ও আশা বাংলা সাহিত্যের ভবিষ্যৎ অনেকাংশেই নির্ভর করে তোমার উপরে। বাংলা সাহিত্যকে পূর্ণতা ও সার্থকতার পথে চালিত করার ক্ষমতা ও অধিকার নিয়েই জন্মেছ, এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহে। কিন্তু এবিষয়ে তুমি সচেতন কিনা জানি না। তাই তোমাকে এই দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া আমার কর্তব্য বলে মনে করি। জানি না এটা আমার পক্ষে অনধিকারচর্চা কিনা। আমার বয়স এখন ৮২ চলছে। তোমার ভাবী পূর্ণ বিকাশ দেখে যাবার সুযোগ আমি পাব না। তাই তোমাকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, যে-প্রতিভার গুরু দায়িত্ব নিয়ে তুমি জন্মেছ তার যেন অপচয় না হয়। তখন আর প্রতিকারের উপায় থাকে না। আমার অনেক সময় মনে হয় সাময়িক প্রয়োজন মেটাতে গিয়ে কখনও কখনও তোমাকে নিজের প্রকৃতিদত্ত প্রতিভা ও ক্ষমতার অপচয় করতে হয়। তাতে আমি গভীর বেদনা বোধ করি। তোমার এখন আত্মসমাহিত হয়ে নিজের প্রতিভাকে নিজের অভীষ্ট ও সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যের অভিমুখে চালনা করা উচিত। আশা করি আমার এসব কথাকে তুমি গায়ে-পড়া উপদেশ বলে উপেক্ষা করবে না। কারণ তোমার বিচারবুদ্ধি ও বিবেচনা শক্তির উপরে আমার সুগভীর শ্রদ্ধা আছে। নতুবা তোমাকে চিঠি লেখার প্রবৃত্তিই আমার হত না। আগেই বলেছি তোমার নানা লেখা পড়েই তোমাকে চিঠি লেখার ইচ্ছা মনে জেগেছে বারবার। কিন্তু কর্মের খরস্রোতে ভেসে চলেছি। তাই স্থির হয়ে বসে একটা বিনা কাজের চিঠি লেখার সময়ও পাইনি। আজ জোর করে একটু সময় করে নিলাম একটা কাজের অজুহাত বানিয়ে নিয়ে। সেটা এই।

'বাংলা ছন্দ চিন্তার ক্রমবিকাশ' নামে আমার একটা বই সদ্য প্রকাশিত হয়েছে। এর একটি কপি তোমাকে পাঠালাম। প্রকাশক শ্রীদ্বিজদাস কর নিজেই বইটি নিয়ে যাবেন তোমার কাছে। —এই বই-এর বিষয়বস্তু সম্পূর্ণ নূতন। এই পথহীন গহন অরণ্যে আর কারও পদচিহ্ন পড়েনি কোনোদিন। আমাকে অনেক কাঁটা মাড়িয়ে রক্তাক্ত পদে চলতে হয়েছে। বইটা একটু উলটে-পালটে দেখলেই বুঝতে পারবে। আমি এই বই-এর সমালোচনা ও প্রচার চাই। যোগ্য ব্যক্তির দৃষ্টি আকৃষ্ট হোক এই নূতন ক্ষেত্রের দিকে, এটাই আমার উদ্দেশ্য। কিন্তু বিষয়টা সম্পূর্ণ নতুন। তাই স্বভাবতই এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির অভাব। ফলে বিশেষজ্ঞের অভাবে বিজ্ঞদের দিয়েই এই বই-এর সমালোচনা করাতে হবে। এই বিজ্ঞদের কথা ভাবতে গিয়ে তোমার কথাই মনে পড়ল সকলের আগে। তোমার মনটাই এমন যে, যে ক্ষেত্রেই তাকে চালনা কর সেখানেই তার অধিকার জন্মে। অধিকন্তু তুমি কবি এবং তোমার মন যে একেবারে ছন্দ চিন্তাহীন নয় তার প্রমাণও পেয়েছি তোমার নানা লেখায়—যদিও খুব বেশি নয়। তাই আমার একান্ত ইচ্ছা তুমি এই বই-এর কথাটা বড়ো সমালোচনা লেখ প্রবন্ধাকারে। তোমার কাছে নেহাত একটা 'পুস্তক পরিচয়' আমি চাই না। আমার অন্তত একটা বই-এর সঙ্গে তোমার নামটা যুক্ত হয়ে থাকুক, এটা আমার মনের একটা সুগভীর ইচ্ছা। আমার বিশ্বাস তুমি আমার অনুরোধ রক্ষায় অনিচ্ছুক হবে না। হয়তো বইটা পড়লে তোমার মনে স্বতঃই নানা চিন্তা জাগবে। আর সেগুলি লিখে ফেললেই বই-এর সমালোচনা হবে। জানি না আমি তোমার কাছে বেশি দাবি করে ফেললাম কিনা। কারণ আমি জানি তোমার কাজের অভাব নেই, অথচ সময়েরই অভাব। তবে আমার অনুরোধ রক্ষাকেও যদি কাজ মনে কর তবে সময়েরও অভাব হবে না। এটুকুই আমার ভরসা।

হয়তো বইটা পড়লে তোমার মনে স্বতঃই নানা চিন্তা জাগবে। আর সেগুলি লিখে ফেললেই বই-এর সমালোচনা হবে।

আশা করি ভালো আছ। তোমার সর্বাঙ্গীণ কুশল কামনা করি। ইতি—

শুভার্থী

প্রবোধচন্দ্র সেন

এই চিঠির উত্তর পেলে খুশি হব। চিঠিটা দ্রুত লেখা। বয়সের দোষে প্রায়শ স্খলন ঘটে। ভুলচুকও থেকে যায়। আশা করি শুধরে নিতে পারবে। একটা চোখ নিষ্ক্রিয়। অন্যটাও বিকল। তাই নিয়েই লেখাপড়া করতে হয়।

তোমার একটা কবিতার বই পেতে চাই, ছন্দ-আলোচনার জন্য। আমার প্রকাশক মহাশয়ের হাতে দিলেই আমি পাব। যদি একাধিক দেওয়া সম্ভব হয় তবে আরও খুশি হব, কারণ কাজের আরও সুবিধা হবে। —প্র. সেন

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

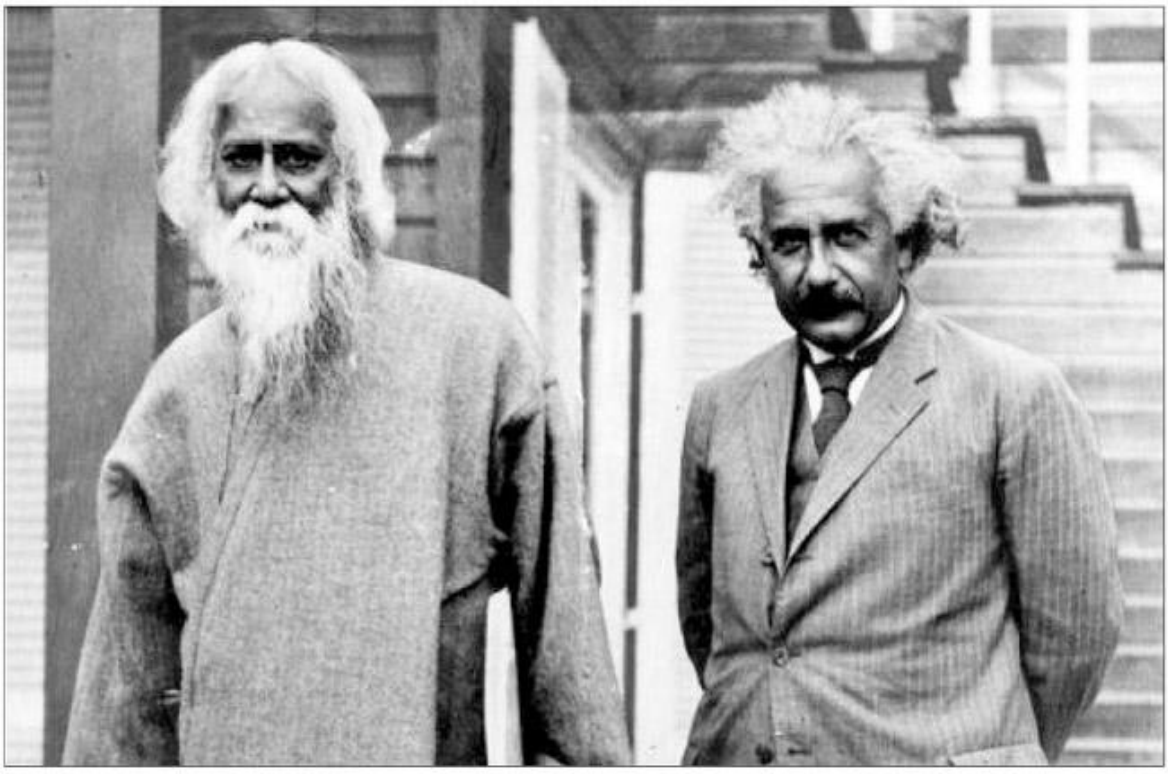

ই এম ফরস্টারের রবীন্দ্রনাথ

নিত্যপ্রিয় ঘোষ

কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি কলেজের হস্টেলে বিকেলবেলায় কয়েকটি ছাত্র গুলতানি মারছিল। একটি ছাত্র বলল, দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালিয়ে, 'গরুটা ওখানে আছে।' দেশলাইটির কাঠি জ্বলতে জ্বলতে নিভে নীচে কার্পেটে পড়ল। কেউ কিছু বলছে না। ছাত্রটি বলল, 'গরুটা আছে। তবে?' একটি কণ্ঠস্বর ভেসে এল, 'তুই প্রমাণ করতে পারলি না।' ছাত্রটি জানাল, সে তার নিজের কাছে প্রমাণ করেছে। কিন্তু সেই কণ্ঠস্বর ভেসে এল, 'আমার কাছে প্রমাণ আছে, গরুটা নেই।' বিরক্ত ছাত্রটি আরেকটি কাঠি জ্বালিয়ে বলল, 'তোর কাছে আছে কি নেই, সেটা বড় কথা নয়, আমার কাছে আছে। আমি কেম্ব্রিজে থাকি, আইসল্যান্ডে থাকি বা মরেও যাই, গরুটা থাকবে।'

দার্শনিক আলোচনা। বস্তুর অস্তিত্ব নিয়ে তর্ক। একটি বস্তু কি থাকতে পারে যদি না সেটা দেখার কেউ থাকে? দর্শক-নিরপেক্ষ বস্তুর অস্তিত্ব কি সম্ভব? এটা সেই সাবেকি 'সাবজেক্টিভিটি' আর 'অবজেক্টিভিটি'র দ্বন্দ্ব। তবে গরুকে নিয়ে তর্কটা অনেক সহজে করা যায়।

ই এম ফরস্টার-এর 'দি লংগেস্ট জার্নি' উপন্যাসের শুরু কেম্ব্রিজের এক কলেজ হস্টেলের এই আড্ডাটি দিয়ে, যার কেন্দ্রীয় বিষয়, গরু আছে, কারণ সেটা দেখার লোক আছে, কিন্তু দেখার লোক না থাকলে গরুটি থাকে কী করে?

অবধারিতভাবে আমাদের মনে পড়ে যায় অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সেই বিতর্কের কথা, যেটা ছাপা হয়েছিল ১০ আগস্ট ১৯৩০-এর 'দি নিউইয়র্ক'-এ। যে বিতর্কে আইনস্টাইনের বক্তব্য ছিল, জগতের অবস্থান মানব-নিরপেক্ষভাবে, আর রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, মানব বা মানবচৈতন্য আছে বলেই জগতের উপস্থিতি, মানবচৈতন্য না থাকলে জগৎ অস্তিত্বহীন। কেম্ব্রিজের ছাত্ররা যেটা গরু নিয়ে তর্ক করছিল, আইনস্টাইন-রবীন্দ্রনাথ করেছিলেন, কাঠের টেবিল নিয়ে।

মনে হতেই পারে, এই দুই বিশ্ববিশ্রুত কবি ও বৈজ্ঞানিকের তর্ক 'দি নিউইয়র্ক টাইমস' পত্রিকায় পড়ে ফরস্টার তাঁর 'দি লংগেস্ট জার্নি'-এর প্রথম অধ্যায় শুরু করেছিলেন। আদৌ তা নয়। ফরস্টারের এই উপন্যাস প্রকাশকাল ১৯০৭, যখন ফরস্টারের বয়স আঠাশ।

রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে ফরস্টারের ধারণা

কীরকম ছিল? তিনি ভারতবর্ষে তিনবার এসেছিলেন। একবার, ছয় মাসের জন্য, ১৯১২ সালে, ইন্দোরের কাছে এক ক্ষুদ্র দেশীয় রাজ্যে চাকরি নিয়ে। সেইসময়ে তিনি ভারতের নানা অঞ্চলে ঘুরেছিলেন, যে অভিজ্ঞতার বর্ণনা আছে 'দি হিল অব দেবি' গ্রন্থে। দ্বিতীয়বার ১৯২১ সালে, আরেক দেশীয় রাজ্যে। এই দুই অভিজ্ঞতার ফসল, 'এ প্যাসেজ টু ইন্ডিয়া' উপন্যাস, ১৯২৪ সালে প্রকাশিত। এই উপন্যাস ফরস্টারের সবচাইতে জনপ্রিয় উপন্যাস। কিন্তু ১৯০৭ সালের 'দি লংগেস্ট জার্নি' ফরস্টারের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস, রায় দিয়েছিলেন সমালোচকেরা, যেমন আমেরিকার 'লাওনেল ট্রিলিং'। শেষ ভারতদর্শন ফরস্টারের ১৯৪৬ সালে, হায়দ্রাবাদে, PEN-এর আহ্বানে।

ফরস্টারের একটি প্রবন্ধগ্রন্থ আছে 'টু চিয়ারস ফর ডেমোক্রেসি'। সেই গ্রন্থের একটি প্রবন্ধের নাম 'ইন্ডিয়া এগেন', ১৯৪৬ সালে লেখা। সেই প্রবন্ধে ফরস্টার জানিয়েছেন, তিনি একবার রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যে এসেছিলেন। সেই সাক্ষাৎকারটা কোথায় কখন হয়েছিল, ফরস্টার লেখেননি। তবে তাঁর এক রবীন্দ্রপ্রশস্তি থেকে আন্দাজ করা যায় কখন এবং কোথায়। রবীন্দ্রনাথের শতবর্ষ-উৎসব উপলক্ষে সত্যজিৎ রায় 'অল ইন্ডিয়া রেডিও'-তে সম্প্রচার করার জন্য একটি রবীন্দ্রজীবনী তৈরি করেছিলেন, যেটার শুরুই ফরস্টারের রবীন্দ্রপ্রশস্তি দিয়ে। আমরা জানি, জওহরলাল নেহরুর নির্দেশে বিদেশে ভারতীয় হাই কমিশন আর কনস্যুলার অফিস থেকে পৃথিবীর নানা প্রান্তের বিদ্বজ্জনদের কাছে জানতে চাওয়া হয়, রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে তাঁদের ধারণা কী? এটা চলে ১৯৫৯-৬০ সাল জুড়ে। ফরস্টারের সঙ্গে হাই কমিশন থেকে সাক্ষাৎকারটা তখনই নেওয়া হয়েছিল। তখন ফরস্টারের বয়স ৮০ কি ৮১। তাঁর সাক্ষাৎকারে ফরস্টারের কথা যেটুকু সত্যজিৎ চয়ন করেছিলেন, তার বয়ান ছিল এরকম—

রবীন্দ্রনাথ আজ বেশ পরিচিত নাম যদিও আন্তর্জাতিক খ্যাতির তখনও প্রতিষ্ঠা হয়নি। রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যে ফরস্টার অভিভূত হয়ে গিয়েছিলেন, তাঁর শান্ত সুন্দর উপস্থিতিতে। তিনি বিশেষ কিছু বলেননি, তাঁর তখন মনেও নেই তিনি কী বলেছিলেন, প্রায় পঞ্চাশ বছর আগেকার কথা তো। কিন্তু সেই অভিজাত হার্লে স্ট্রিটের ভোজনকক্ষে তিনি বসেছিলেন, এইটুকু ফরস্টারের মনে আছে। তাঁর ছবিটি ফরস্টারের মনে আছে, দাড়ি পুরো পাকেনি, কণ্ঠস্বর সবসময়েই শান্ত। তিনি নিজেকে সাধুবাদ দিচ্ছেন এই ভেবে যে তিনি তখনই বুঝতে পেরেছিলেন, তিনি একজন মহান ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে এসেছেন।

ই এম ফরস্টার

স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, ফরস্টারের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ হয়েছিল লন্ডনে, ১৯১৩ সালে, যখন রবীন্দ্রনাথ লন্ডনে বক্তৃতা, আবৃত্তি, নাটকপাঠ ইত্যাদি ব্যাপারে জড়িয়ে আছেন আর ১৯১২-এ ভারতদর্শন সেরে ফরস্টার লন্ডন ফিরে গিয়েছেন। লন্ডন তখন রবীন্দ্রনাথে মগ্ন। মগ্ন বলা ভুল হবে। বক্তৃতার পরে বক্তৃতা, নাটকপাঠ, কবিতাপাঠ, ইয়েটসের মাত্রাতিরিক্ত উচ্ছ্বাস, কাব্যগ্রন্থের প্রকাশের উদ্যোগ— লন্ডনের এই চেহারা দেখে অনেকেই স্তম্ভিত হয়েছিলেন, ফরস্টারও বলেছিলেন, রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে লন্ডন তখন হিস্টেরিয়াতে ভুগছে। 'চিত্রা' নাটক প্রকাশের পরে ১৯১৪ সালে সাহিত্যপত্রিকায় ফরস্টার নাটকটির প্রশংসা করার আগে ইংল্যান্ডের এই উচ্ছ্বাসের তীব্র ব্যঙ্গ করেছিলেন। নাটকটির সমালোচনা ফরস্টারের প্রবন্ধগ্রন্থ 'অ্যাবিঙ্গার হারভেস্ট'-এর অন্তর্গত হয়। এই গ্রন্থেই অন্তর্গত হয় 'দি হোম অ্যান্ড দি ওয়ার্ল্ড'-এর সমালোচনা। যেটা ১৯১৯ সালে প্রকাশিত হয়। এই উপন্যাসটি ফরস্টারের ভালো লাগেনি। সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুবাদে আড়ষ্ট গদ্য তাঁর মনে হয়েছিল 'বাবু ইংলিশ'। আর সন্দীপ-বিমলার প্রণয়কাহিনি তাঁর মনে হয়েছিল 'ওয়েস্ট কেন্সিংটন বাবু' রোম্যান্স। 'চিত্রা' আর 'গীতাঞ্জলি'-র রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাছে শান্ত সুন্দরের পূজারি। এই রবীন্দ্রনাথকেই ফরস্টারের মনে পড়েছিল তাঁর আশি-একাশি বছর বয়সে। তিনি 'দি নিউইয়র্ক টাইমস'-এ রবীন্দ্রনাথ-আইনস্টাইন বিতর্ক পড়েছিলেন কিনা, ১৯০৭ সালে তোলা তাঁর সমস্যা ১৯৩০ সালে অন্যের মুখে মুখে তাঁর কী মনে হয়েছিল, তার কোনও চিহ্ন আমাদের কাছে নেই। তবে ১৯৪৬ সালে তিনি শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন। ছোট পরিসর, কিন্তু মনে দাগ কেটে যায়। সাংস্কৃতিক আর মানবিক বিশ্ববিদ্যালয় এই শান্তিনিকেতনের চিত্রশিল্পীরা কিছুটা আধ্যাত্মিক, শান্ত, প্রায় অতীন্দ্রিয়— এমনই মনে হয়েছিল ফরস্টারের শান্তিনিকেতনকে।

'চিত্রা' আর 'গীতাঞ্জলি'-র রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাছে শান্ত সুন্দরের পূজারি। এই রবীন্দ্রনাথকেই ফরস্টারের মনে পড়েছিল তাঁর আশি-একাশি বছর বয়সে।

স্ম র ণ

বর্ণময় সিরাজ

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

আমার ঘনিষ্ঠ, গুরুত্বপূর্ণ বন্ধু ছিল সিরাজ। সিরাজ খুব শুদ্ধ মানুষ ছিল। তাঁর মৃত্যুতে আমি নিঃসঙ্গ হয়ে গেলাম। সেই নিঃসঙ্গতা অনুভব করব প্রতি মুহূর্তে।

দুজনে পাশাপাশি বসে, একই অফিসে, একই টেবিলে কাজ করেছি বলে নয়, আমাদের মনের মধ্যে সেই বন্ধুত্বটা কোথাও শিকড় ছড়িয়ে ছিল। প্রগাঢ় ছিল। যদি এককথায় বলতে বলা হয়, তাহলে বলব, ওর চারিত্রিক গুণটাই এমন ছিল যে ওকে ভালো না বেসে থাকা যায় না।

আমি তখন কলেজ স্ট্রিটের কাছে একটা মেসবাড়িতে থাকতাম। তার আগে থেকেই আমার সঙ্গে সিরাজের আলাপ, বন্ধুত্ব। সেই বন্ধুত্ব ক্রমশ গাঢ় হয়েছে। ডালপালা ছড়িয়েছে সুখে-দুঃখে। যখন মেসবাড়িতে থাকতাম তখন প্রায় নিয়মিতই কফিহাউসে আমাদের আড্ডা বসত। আড্ডা চলত মেসবাড়ির ঘরটাতেও। তর্ক চলত। তর্কের বিষয়বস্তু সংস্কৃত কোনও শব্দের অর্থ নিয়ে হতে পারে, আবার তর্ক জমে উঠত ধর্ম-সংক্রান্ত কোনও বিষয় নিয়েও। কত বিষয়, কত আলোচনা, কত তর্ক। নিরন্তর। সেই তর্কের সময়েই বোঝা যেত সিরাজ মানুষটা নিরীহ, স্বল্পবাক, নরম-সরম মানুষ হলেও প্রচণ্ড তার্কিক। বিশেষত তাত্ত্বিক তার্কিক। এত তর্ক হয়েছে, অথচ কখনও কোনও ব্যক্তিগত বিষয়ে আমাদের তর্ক হয়নি। সবসময় তর্ক হয়েছে কোনও তত্ত্বকে ঘিরে। কখনও আবার কোনও শাস্ত্রজিজ্ঞাসাই তর্কের বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে। এবং সে তর্কে আমরা দুজনেই উপকৃত হয়েছি। পরস্পরের জ্ঞান বেড়েছে। সমৃদ্ধ হয়েছি। স্বাস্থ্যকর তর্ক ছিল সেটা।

বন্ধু তো বন্ধুই হয়। সিরাজের সঙ্গে বন্ধুত্বের পরতে কখনও মনে হয়নি হিন্দু-মুসলমান ব্যাপারটা। অথচ আমি হিন্দু, সিরাজ মুসলমান। আমি নিরামিষাশী, সিরাজের ওসবের বালাই নেই। আমি প্রবলভাবে আস্তিক আর ও প্রচণ্ড নাস্তিক। মনে পড়ছে ও আমাকে বলত, আমি হচ্ছি ওর অসাম্প্রদায়িক বন্ধু। কেন বলত? আমি জানি না। আর আমিও দেখেছি ওর মতো ধর্মনিরপেক্ষ মানুষ খুব কম আছে।

স্বশিক্ষিত মানুষ ছিল সিরাজ। আরবি-টারবি সেভাবে সিরাজ পড়েনি। কিন্তু আরবি ভাষায় বা শাস্ত্রের লেখার ইংরিজি অনুবাদ পড়েছিল। আর পড়াশুনো করেছিল সংস্কৃত নিয়ে। ওর ঠাকুমা তো হিন্দু ব্রাহ্মণঘরের মেয়ে ছিলেন। সেটা অন্য প্রসঙ্গ, অন্য কথা। ওর নানা বিষয়ে খোঁজখবর রাখা, ইতিহাসের বিভিন্ন দিক নিয়ে পড়াশুনো করা, সববিষয়ে এত প্রবল আগ্রহ আমাকে মুগ্ধ করেছিল।

এই তো দিন চার-পাঁচ আগেও ফোনে কথা হয়েছে। পঞ্চাশ বছরের বন্ধুত্ব। তবে ইদানীং দেখাসাক্ষাৎ সেভাবে ছিল না। কিন্তু আমি জানতাম, সিরাজ আছে। জানতাম, আমি ফোন করলে ও ওপাশ থেকে ফোনটা তুলবে। কথা বলবে। এই যে আজকে ও নেই, এটা এক শূন্যতা মনে হচ্ছে।

গ্রামবাংলার জীবনটাকে ও করতলগত করে রেখেছিল। ওর মতো প্রত্যন্ত প্রান্তের গভীর কথা আর কেউ বলতে পারত বলে আমার মনে হয় না। আসলে জীবনটা তো ওর বর্ণময় ছিল।... আলকাপের দল নিয়ে ও গ্রামে গ্রামে ঘুরেছে। এই জীবনের অভিজ্ঞতা, অজানা কথা সব উঠে এসেছে ওর লেখায়।

ও যত বই লিখেছে, তার মধ্যে আমি ব্যক্তিগতভাবে প্রিয় বই বলব 'উত্তর জাহ্নবী'। গ্রামবাংলার জীবনটাকে ও করতলগত করে রেখেছিল। ওর মতো প্রত্যন্ত প্রান্তের গভীর কথা আর কেউ বলতে পারত বলে আমার মনে হয় না। আসলে জীবনটা তো ওর বর্ণময় ছিল! 'উত্তর জাহ্নবী'র চরিত্রগুলি, 'রানিকুঠির বৃত্তান্ত'র চরিত্রগুলো সবই ভীষণভাবে চেনা। আলকাপের দল নিয়ে ও গ্রামে গ্রামে ঘুরেছে। এই জীবনের অভিজ্ঞতা, অজানা কথা সব উঠে এসেছে ওর লেখায়। অনেকেই 'অলীক মানুষ' নিয়ে উচ্ছ্বসিত হন। আমার কাছে কিন্তু 'অলীক মানুষ'-এর থেকে 'উত্তর জাহ্নবী' অনেক বেশি ওর রিপ্রেজেন্টেটিভ উপন্যাস। 'অলীক মানুষ'-এ কোথাও একটা আরোপিত ব্যাপার আছে। ধার করা বিষয় আছে। ম্যাজিক রিয়ালিটির ফিলোজফি উঠে এসেছে এই উপন্যাসে। কিন্তু 'উত্তর জাহ্নবী'? এখানে কোনও ধার নেই। কোনও জাদুবাস্তবতার প্রয়োগ নেই। নিজের মানুষের নিজস্ব কথা ফুটে উঠেছে উপন্যাসে। আমি ওকে বারবার বলেছি যে, কর্নেল সিরিজের লেখাগুলো ছাড়ো। সিরিয়াস উপন্যাস লেখো। হেসে বলত, সিরিয়াস উপন্যাস সহজে মাথায় আসে না ওর। হালকা চালে কর্নেল লিখতেই ওর সুবিধা হয়। তাছাড়া কর্নেল তো ওকে জনপ্রিয়তা দিয়েছিল।

সিরাজ আর নেই। একই শিফটে দুজনে কাজ করেছি। দুজনে দুজনের বাড়িতেও যাতায়াত করেছি। ওর স্ত্রীকেও আমি খুব স্নেহ করতাম।

সিরাজ অতিশয় স্নেহপ্রবণ মানুষ ছিল। নিজের স্ত্রী-পুত্র-কন্যার সঙ্গে স্নেহবন্ধনটি যে গভীর তা ওর কথাবার্তা থেকেই বুঝতে পারতাম। চারটি ছেলেমেয়েই ভারী মিষ্টি। সহবত জানে। ওর বউ হাসনে আরা বয়সে ওর চেয়ে অনেক ছোট বলে এ নিয়ে আমরা, বন্ধুরা খুব সিরাজের পিছনে লাগতাম, তবে হাসনে আরার সঙ্গে ওর সম্পর্ক ছিল গভীর ও নিষ্ঠ।

তবে সিরাজের বাস্তববুদ্ধির অভাব ছিল খুব। দুমদাম খরচ করে দামি জিনিস কিনে ফেলত। হঠাৎ বাই উঠল খোসবাসপুরে নিজের গ্রামে একটা বাংলোবাড়ি বানাবে। আমি বললাম, দূর পাগল, ওখানে তো তোর পৈতৃকবাড়িই আছে! তাছাড়া গাঁয়ে গিয়ে বাংলোতে থাকবে কে? কিন্তু কথাটা সে কানে তোলেনি, বিস্তর টাকা খরচ করে বাংলো বানিয়েছে, যা তালাবন্ধ পড়ে থাকে। পৈতৃকবাড়িও ফাঁকা, বেশিরভাগটাই তালাবন্ধ।

দোষ-গুণ মিলিয়েই তো মানুষ, সিরাজ তবু বর্ণময় ছিল। বিচিত্র জীবন, বিস্তীর্ণ অভিজ্ঞতা, শীলিত পাণ্ডিত্য সব নিয়ে সিরাজ ঠিক সিরাজের মতোই।

'কালের কষ্টিপাথর'-এ সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের শেষ লেখা

যে কথা বলা হয়নি

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

। পর্ব ৭ ।

বটুকদা, শেরজঙ্গ, বন্যকুক্কুট ও মার্কস

এবার ইতিহাসের গোলকধাঁধা থেকে বেরতে চাই! কিন্তু ইতিহাস পিছু ছাড়ছে না। কারণ, ঘটনাস্থল সনাতন ঐতিহাসিক পীঠ দিল্লি। আর এই বৃত্তান্তের সঙ্গে কিঞ্চিৎ ইতিহাসও জড়িয়ে আছে। কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাস।

১৯৬৮ সালের শীতকাল। দিল্লির করোলবাগে বাঙালিদের 'বঙ্গভবন' সযত্নে দোতলার একশয্যার ঘর দিয়েছিল। তখন আমি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের মুখপত্র 'ভাণ্ডার'-এর সহ-সম্পাদক। নামেই একজন জাঁদরেল কংগ্রেস-নেতা সম্পাদক ছিলেন। সব কাজের দায়িত্ব আমারই। ১৯৬৫ থেকে প্রতি শীতকালে দিল্লির কেন্দ্রীয় সমবায় ইউনিয়নের ডাকা সেমিনারে আমাকে দিল্লি আসতেই হয়। সেবার করোলবাগে 'বঙ্গভবন'-এর খোঁজ পেয়ে চিঠি লিখেছিলাম, তৎক্ষণাৎ সাড়া এসেছিল। তখন সব ট্রেনই পুরনো দিল্লি স্টেশনে আনাগোনা করত। সাহিত্যপ্রিয় প্রবাসী বাঙালিরা জানিয়েছিলেন, স্টেশনে 'দরবেশ' থাকবেন। আমাকে নিয়ে আসবেন। 'দরবেশ' তৎকালে 'দেশ' পত্রিকা ও অন্যত্র ফিচার লিখে খ্যাতনামা। তাঁর আসল নামটা মনে পড়ছে না। যাই হোক, কৈলাস কলোনিতে দুপুরে সেমিনার এবং নন-ভেজ লাঞ্চের পর সমবায়মন্ত্রীর ভাষণ। তারপর সন্ধ্যায় বঙ্গভবনে ফিরে দেখি, নীচের তলায় সাহিত্য বৈঠকের আয়োজন।

আসল কথায় ফেরা যাক। দোতলার একশয্যা ঘরে ডবল কম্বলের ওমে হাড়হিমকরা দিল্লির শীত উধাও। সকাল ৭টায় বেড-টির কথা বলা ছিল। ঘুম ভেঙে গেল দরজার খটখট শব্দে। তারপর ঠিক হুতুম প্যাঁচার কণ্ঠস্বরে কেউ বলছিল— বেড-টি! বেড-টি! বেড-টি! বেড-টি! বেড-টি!

দরজা খুলেই আমি অবাক। মাথায়

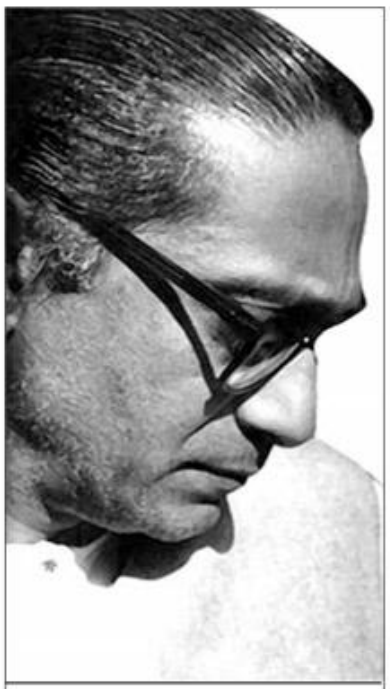

জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র

কানঢাকা টুপি, গায়ে সাদাসিধে চাদর, ধুতিপরা এক প্রবীণ ভদ্রলোকের হাতে চায়ের কাপ-প্লেট। কিছু বলার আগেই তিনি আমার হাতে চায়ের কাপ-প্লেট তুলে দিয়ে বললেন— যে ছোকরা চা এনেছিল, তাকে বলে দিয়েছি আরও দু'কাপ না আনলে এই কাপ খালি করে দেব। না— বেড-টি পাশের ঘরেই গিয়ে পান করবেন। চলুন!

অবাক হয়েই চা নিয়ে বললাম— আপনি?

একটু হেসে তিনি বললেন— হয়তো চিনবেন। আমি 'মধুবংশীর গলি।' কাল সন্ধ্যার আসর মিস করেছি! তার পরাচিত্তির।

মাথার ভেতর জটটা খুলে গেল। —আপনিই জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র? কী আশ্চর্য! কবে ছাত্রজীবনে গণনাট্য সংঘে থেকে আপনার কবিতা পড়েছি। গান গেয়েছি। সেই জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র!

—উঁহু, বটুক। আমার খ্যাতি বটুক নামে। বলুন বটুকদা। তারপর পাশের ঘরে যান। সেখানে আরেক মৈত্র আছে।

হেসে ফেললাম। —'বটুকদা'! আমি স্বপ্ন দেখছি না তো?

ততক্ষণে দু'কাপ চা নিয়ে একটি ছেলে এসে গিয়েছে। কাপ দুটো ছিনিয়ে নিয়ে 'বটুকদা' বললেন— কুইক মার্চ! মাও-ৎসে-তুংয়ের লং মার্চের মতো।

পাশের ঘরে ছিলেন নৈনিতাল গভর্নমেন্ট আর্ট কলেজের খ্যাতনামা চিত্রকর রথীন্দ্রনাথ মৈত্র। সম্ভবত দুই মৈত্রে সম্পর্ক ছিল। তখন জানতে চাইনি। হিমালয় অঞ্চলের তীর্থ আর দ্রষ্টব্যস্থানের প্রিন্টেড এবং পোস্টকার্ড সাইজ প্রায় একশো রেখাচিত্র উপহার পেলাম। চা-পানের পর বটুকদা বললেন— রথীন! নীচে গিয়ে ফোনে জঙ্গি ভদ্রলোককে জানিয়ে আসি তাঁর ব্রেকফাস্টের আমন্ত্রিত অতিথির সংখ্যা এক বাড়ল। তিন-তিনজন বাঙালি! রাইফেলে অনেকগুলো বাঘ মেরেছে। তিন বাঙালি শুনেই জঙ্গি ধরে নেবে তিন-তিনটি শের আসছে! রাইফেল তাক করবে।

বটুকদা বেরিয়ে গেলে বললুম— আমার মনে হচ্ছে, জঙ্গি আর শের মানে বিখ্যাত শিকারি শেরজঙ্গ! কবি সুভাষদা (সুভাষ মুখোপাধ্যায়) তাঁর দুটো শিকার-কাহিনী বাংলায় অনুবাদ করেছেন। তাছাড়া সুভাষদার

নবান্ন নাটকের একটি দৃশ্য

কাছেই শুনেছি, শেরজঙ্গকে কমিউনিস্ট আন্দোলন করতে গিয়ে ফাঁসিকাঠে চড়তে হয়েছিল।

রথীনবাবু সহাস্যে বললেন— হ্যাঁ। সাংঘাতিক ঘটনা। শেষ মুহূর্তে বড়লাটের চিঠি ওঁকে বাঁচিয়ে দিয়েছিল। বাবা ফিউডাল লর্ড। বড়লাটের বন্ধু ছিলেন। জেল খাটতে হয়েছিল। বটুকের কাছে শুনতে চাইবেন। তবে সাবধান করে দিচ্ছি। বটুকের বদ অভ্যাস। আপনাকে শিকার পেয়ে কান ঝালাপালা করে দেবে। চুপচাপ থাকবেন কিন্তু।

কিছুক্ষণ পরে রথীনবাবু তাঁর গাড়ি চালাচ্ছেন। আর পিছনে বসে বটুকদার মার্কসীয় তত্ত্বকথা শুনে যাচ্ছি। মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিন-স্তালিন-মাও-ৎসে-তুং থেকে পি সি যোশি হয়ে বর্ধমানের শক্তিগড়ের ওদিকে ১৯৪৪ সালে হাটগোবিন্দপুরে নিখিল ভারত কিষাণ সম্মেলন। রাত্রে বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন'। সত্যি কান ঝালাপালা, যদিও মাথায় কানঢাকা পুরু পশমি টুপি। তবে হাটগোবিন্দপুর, ১৯৪৪ সাল নবান্ন আমাকে চমকে দিয়েছিল।

গাড়ি উত্তরদিকে চলতে চলতে ডানদিকে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় পেরোচ্ছে। গাছপালা ঝোপেঝাড়ে অজস্র ময়ূর দেখলাম। বটুকদাকে থামতে হল। —হ্যাঁ। দিল্লির চারপাশে ময়ূর দেখা যায়। তো যা বলছিলাম—

তাঁর কথার ওপর বললাম— হাটগোবিন্দপুরের সেই সম্মেলনে বাবার সঙ্গে আমিও ছিলাম বটুকদা। বিকেলে পি সি যোশি এলেন। সাদা হাফপ্যান্ট আর সাদা হাফশার্ট পরা বেঁটে মানুষ। আমি তখন ক্লাস নাইনের ছাত্র।

বটুকদা আমাকে জড়িয়ে ধরে বলে উঠলেন— কী আশ্চর্য! একেই বলে ইনটিউশন! নাহ্। আমি বস্তুবাদী। ওটা কথার কথা। তারপর শুনুন। দেখা যাচ্ছে, আমাদের দুই ভাইয়ের অতীতকালটা একইরকম। কী?

একঘণ্টা পরে খোলামেলা আকাশের নীচে ইতস্তত ছড়িয়ে থাকা একতলা বাংলো, দোতলা বাড়ি। নতুন টাউনশিপ গড়ে উঠছে। বটুকদা একটা দোতলা ঘরের সিঁড়ি বেয়ে উঠেই বললেন— শেরজঙ্গসায়েব! আপনার গুণমুগ্ধ এক পাঠক এনেছি। আপনার বন্ধু সুভাষ মুখার্জির চেলা। নিজেও লেখেন। রাইজিং সান।

শেরজঙ্গের বই পড়ে যা মনে হয়েছিল, তা নিমেষে ভেস্তে গেল। পাঞ্জাবি-পাজামা-শালজড়ানো রোগাটে গড়নের ফর্সা প্রবীণ

শের জঙ্গ

মানুষ। ঘরে কাচের আলমারিতে অনেকগুলো রাইফেল, শটগান, অ্যান্টিক পিস্তল ইত্যাদি সাজানো। করমর্দন করে তিনি বললেন— সুভাষের কাছে থোড়া-থোড়া বাংলা শিখেছি। কেমন আছে কবিমোসাই?

সুভাষদার কাছে শোনা কাহিনী এবং দু-দুটো শিকার-কাহিনির কথা ঝেড়ে দিলাম। শেরজঙ্গ খুশিতে, আবেগে উচ্ছ্বসিত। নিজের হাতে টোস্ট-মাখন-এগপোচ আর আপেল কেটে ব্রেকফাস্টের টেবিল সাজালেন। তারপর বললেন (এবার স্রেফ বাংলায় অনুবাদ করে যাব তাঁর কথা) —আমার এই তরুণ পাঠককে আমার ফার্মহাউসে নিয়ে যেতে ইচ্ছে করছে। বইয়ে পড়া ফার্মটা ইনি দেখবেন।

বটুকদা ঝটপট বললেন— আমিও দেখব। আপনি কতবার নিয়ে যেতে চেয়েছেন। যেতে পারিনি।

রথীনবাবু বললেন— আমার ইচ্ছে করলেও উপায় নেই। আজ নৈনিতাল ফিরতে হবে। দিল্লি থেকে গাড়ি চেপে নৈনিতাল যাওয়া আপনার বাঘশিকারে যাওয়ার চেয়েও ডেঞ্জারাস অ্যাডভেঞ্চার!

রথীনবাবু চলে যাওয়ার পর শেরজঙ্গ আমার পোশাক দেখে বললেন— একটা ওভারকোট চাই। ঠিক আছে। বিদেশে কেনা একটা ওভারকোট এখন আমার গায়ে আঁটো হয়। ওটাই দিচ্ছি। শিবালিক পাহাড় এলাকায় শীতটা আরও কড়া।

শেরজঙ্গের লালরঙের ল্যান্ডরোভার গাড়িতে যাত্রা শুরু হল। তখন বেলা ১০টা। ওঁর কেয়ারটেকার মাধবজি-র জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছিল। তার ডিউটি সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টা। কিন্তু শেরজঙ্গ বাইরে গেলে সে বাড়ির কর্তা। তাগড়াই পাঠান চেহারার লোক। হাতে বন্দুক।

প্রায় একশো মাইল দূরত্ব। পাহাড়-জঙ্গল-দেহাত মুলুক চড়াই-উতরাই হয়ে টালমাটাল গাড়ির পাখিওড়া পথে যাত্রা। তাই পথের বালাই নেই। টুকরো পাথরের ওপর, কখনও ঝোপঝাড়ের ভেতর চারটে চাকা গড়াচ্ছিল। একখানে সংকীর্ণ রাস্তার ধারে ধাবার মতো 'ভোজনালয়।' উৎকৃষ্ট মিহি সুগন্ধী চালের ভাত, ঝরনার জলে ধরা মাছ, সবজি এবং উৎকৃষ্ট ডাল দিয়ে 'ভোজন' হল। তারপর আবার অ্যাডভেঞ্চার। ৬ ঘণ্টা পরে একটা ঝোপে-পাথরে ঢাকা মাঠ। হঠাৎ গাড়ি থামিয়ে শেরজঙ্গ শটগান হাতে নেমে গেলেন। মিনিট কুড়ি পরে শটগানের শব্দ। আবার শব্দ! আবার! বটুকদা মার্কস বাদ দিয়ে কাচ তুলে বললেন— নির্ঘাত হরিণ! বন্যপ্রাণী হত্যা নিষেধ আইন প্রকৃতির মধ্যে অচল। আমি জীবনে কখনও হরিণের মাংস খাইনি। বুঝলেন?

বুঝলাম না। বললাম— শটগানে হরিণ মারা যায়?

—ও যে বিপ্লবী। কমিউনিস্ট। কার্ল মার্কসের 'দাস ক্যাপিটাল' ওর মুখস্থ। ও সব পড়ে।

সেইসময় দেখলাম, একহাতে দু'দুটো মোটাসোটা বুনো মুরগি বা মোরগ ঝুলিয়ে সহাস্যে শেরজঙ্গ ফিরে আসছেন। গাড়িতে ঢুকে একটা ছোট্ট ব্যাগে শিকার দুটো ভরে পাশের সিটে রাখলেন। বললেন— আমাদের সঙ্গী এই তরুণ লেখক, মানে এই রাইজিং সানের গুরু আমার বন্ধু সুভাষ মুখার্জি। গত শীতে সুভাষ সঙ্গী ছিল। এখানেই দুটো বনমুরগি মেরেছিলাম। বলতে নেই, তবে সুভাষ খুব পয়মন্ত!

এবার দুর্গম পাহাড়ি এলাকা। হেডলাইট জ্বলছিল। কত বুনো জন্তু আলোর ছটায় পড়ে লাফ দিয়ে অন্ধকারে মিশে যাচ্ছিল বলার নয়। খরগোশ, শুয়োর, আস্ত একটা সম্বর এবং সাপও। সন্ধ্যা নয়, যেন ঘনঘোর রাত! সাড়ে ৫টায় ফার্মের আলো দেখা গেল। জেনারেটর চালিয়ে বিদ্যুৎ চালু রাখতে হয় সারা রাত। শেরজঙ্গ বললেন— তারের বেড়া ভেঙে হরিণের পাল ফসল খেতে আসত। তাই জেনারেটরের ব্যবস্থা। বজ্জাত বাঘও হানা দিতে আসে। ভেতরে পাহাড়ি ছাগল পুষেছি। স্রেফ ব্যবসা!

ফার্মের সামনে প্রায় দুশো মিটার মোরামবিছানো রাস্তা। দুধারে দেবদারুর সারি। হর্নের শব্দে গেট খুলে গেল। গাড়ির সামনে বিলিতি গড়নের বাড়ি বা বাংলো। বলা উচিত, শেরজঙ্গের এই ফার্মহাউস পরে আমার কর্নেল কাহিনীর সব ফার্মহাউসের আদলে হয়েছিল।

দুটো প্রকাণ্ড অ্যালসেশিয়ান ছাড়া ছিল। শেরজঙ্গ নামতেই তারা তাঁর আদর খেতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। বটুকদা চাপা স্বরে বললেন— কমিউনিস্ট হলে কী হবে। শেরজঙ্গের পূর্বপুরুষ ফিউডাল লর্ড। বাপস। কুকুরকে আমার বড্ড ভয়।

বললাম— আমারও।

দুজন লোক এসে কুকুরদুটোর গলায় চেন এঁটে নিয়ে গেল। নির্ভয়ে নেমে পড়লাম। শেরজঙ্গের সঙ্গে গেলাম। একতলার প্রশস্ত ঘরে ফায়ার প্লেস। তার ওপরে মার্কসের প্রকাণ্ড ছবি। পাশে রাখা পাইনকাঠ গুঁজে তিনি আগুন ধরিয়ে দিলেন। তারপর সামনে তিনটে চেয়ারে বসলাম তিনজনে। শেরজঙ্গ আশ্বাস দিয়ে বললেন— মিনিট পনেরো-কুড়ির মধ্যে একটা রোস্টেড মুরগি এসে যাবে। তৎসহ ব্র্যান্ডি। আপত্তি নেই তো মিঃ সিরাজ?

বললাম— মোটেও না। এই প্রচণ্ড শীতে ব্র্যান্ডি ছাড়া বাঁচা উঠিন। বটুকদা?

বটুকদা চিন্তিতমুখে বললেন— গন্ধে বমি

দিল্লি থেকে শিবালিকের পথে

বটুকদা দেখামাত্র উঠে দাঁড়িয়ে 'বজ্রমুষ্টি' তুলে 'লাল সেলাম' জানিয়ে ধুপ করে বসে কৌতুকে ফেটে পড়লেন। —জঙ্গিসায়েব! তুমি বেনজির মার্কসবাদী।

আসবে না তো?

শেরজঙ্গ হেসে উঠলেন— আমি কার্ল মার্কসের দাস ক্যাপিটাল বা ১৮৪৮ সালের কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোতে মদ্যপানবিরোধী নির্দেশ পাইনি। আর ব্র্যান্ডিতে তো মাত্র একটুখানি অ্যালকোহল থাকে। আর ওই দেখুন, আমাদের নমস্য পুরুষ দাড়িওয়ালা মার্কসসায়েব ফায়ারপ্লেসের ওপর বসে আছেন।

বটুকদা দেখামাত্র উঠে দাঁড়িয়ে 'বজ্রমুষ্টি' তুলে 'লাল সেলাম' জানিয়ে ধুপ করে বসে কৌতুকে ফেটে পড়লেন। —জঙ্গিসায়েব! তুমি বেনজির মার্কসবাদী।

কিছুক্ষণের মধ্যে একটা ছোট্ট টেবিলে রোস্টেড বনমুরগি আর তিনটে কাঁটা-চামচ ও ছুরি এল। তারপর তিনটে বেঁটে মোটা কাচের গ্লাসও এল। সঙ্গে সোনালি রঙের ব্র্যান্ডির বোতল।

হায়! জীবনে আর তেমন রাত্রি ফিরে আসেনি। মনে পড়লেই বিষণ্ণ হয়ে থাকি। তবে শেষ কথাটা বলা উচিত। কলকাতা ফিরে সুভাষদাকে কথাটা জানাতে গিয়ে শুনলাম, এখন তিনি মিশরের কায়রোতে আফ্রো-এশীয় সম্মেলনে আছেন।

স্ম র ণ

কণ্ঠস্বরের দার্ঢ্য আজও কানে বাজছে

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

না-বলা কথা শেষ করবার আগে নিজেই অশেষ হয়ে উঠবেন ভাবিনি কখনও। প্রস্টেট অপারেশনের কয়েকটা দিন বাদ দিলে, এবছরের গোড়া থেকে এমন সপ্তাহ যায়নি যখন অন্তত তিন-চারদিন তাঁর ফোন আসেনি। সকাল এগারোটা নাগাদ মিনিট দশ-পনের তাঁর না-বলা কথার সিন্দুক খোলা থাকত। সামনের শুক্লপক্ষ ও কৃষ্ণপক্ষগুলোয় কী নিয়ে লিখবেন তাঁর সোৎসাহ ব্যাখ্যাভাষ্যসহ বিশদ বিবরণ শুনতে শুনতে কখনও হয়তো ব্যস্ততা গোপন করে বলতাম— আগে থেকে সব বলে দিলে লেখবার ইচ্ছে বা তাড়না আপনার চলে যায় না? ওঁর বরাবরের উত্তর ছিল, সব তো আমার মনেই, মাটির গভীরে শেকড় যেমন।

বছরের শুরুতে বা হয়তো মাঝামাঝি, দেখাসাক্ষাৎহীন কুড়ি-বাইশ বছর পর প্রথম যেদিন দীর্ঘ টেলিফোনে 'কালের কষ্টিপাথর'-এর ভাবনা মেলে ধরলাম, সামান্য শ্লেষাজড়ানো, ভরাট কিন্তু সাহচর্যময় কথাবার্তায় নিমেষে ওই খাঁটি মানুষটির মধ্যে পেয়ে গেলাম আমার নতুন পাক্ষিকের নিয়মিত লেখককে। বললেন, 'বয়স আশি পেরিয়ে গেছে, লিখতে গেলে আঙুল কাঁপে, আজকাল আর কোথাও প্রায় লিখিই না, তবে আপনি কাগজ করলে লিখব।'

তাঁর প্রখর স্মৃতির পরিচয়ে আমাকে চমকে দিয়ে বললেন, 'আপনার 'ভ্রমণ'সংগ্রহ সমালোচনা করবার শর্তে চেয়ে নিয়েও শেষ পর্যন্ত লেখা হয়নি, সেই অপরাধ থেকেও মুক্ত হব। আঙুলের আড়ষ্টতা এবার ভাঙতে হবে।'

পনের-বিশ বছর আগে 'ভ্রমণ' পত্রিকার একটি বার্ষিক সংগ্রহ চেয়ে ফোনে বলেছিলেন, 'আজকাল আর খুব একটা বাইরে যেতে পারি না, কিন্তু কর্নেলকে নিয়ে তো যেতেই হয়, যখন যে জায়গার গল্প তখন সে-জায়গাটা আপনার 'ভ্রমণ' থেকে তুলে নিই, জায়গাটার খুঁটিনাটি বিবরণ আমার খুব কাজে লাগে।'

ওঁর উপন্যাস পড়ে আমার এই ধারণা ক্রমেই দৃঢ় হয়েছিল যে লেখালেখির আকাশ-

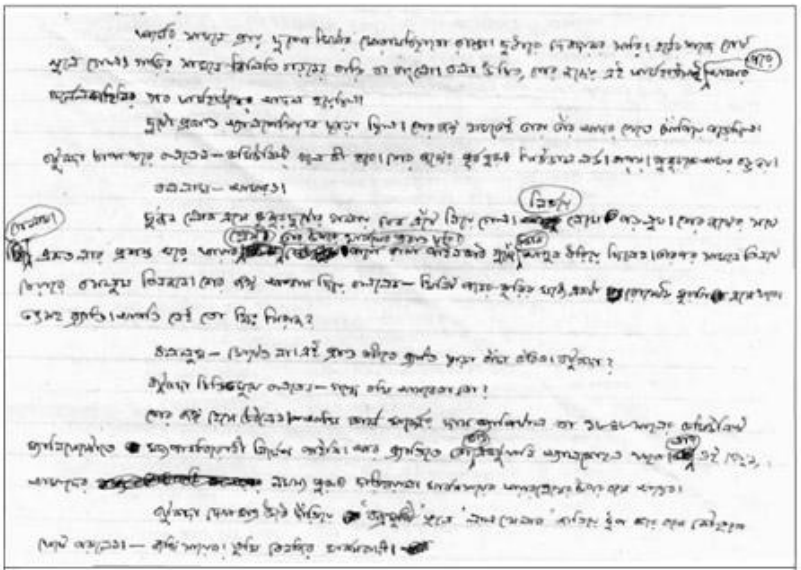

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের স্বহস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি। যা আর নতুন করে কোনওদিন এসে পৌঁছবে না আমাদের দপ্তরে

পাতালচারিতাই শুধু নয়, ব্যবহারিক জীবনের অনেক উপলব্ধি, জ্ঞানসমুদ্রের সহাস্য সন্তরণ, বা হয়তো অনেক অনুচিত উপহাসও বহন করতে হয়েছে ওঁকে।

হালকা চালে এরকম দু-চার কথার মধ্যে আমি বলে উঠলাম, 'আপনার নতুন লেখার নাম ঠিক হল— যে কথা বলা হয়নি'।

এর পরই যে কথাটা বললেন, তা এত শীঘ্র সত্যি করে তুলবেন কে জানত! 'এখন তো পিঠে মৃত্যুর নিঃশ্বাস লাগছে। এখনও না বললে আর কবে বলব?'— শোনামাত্র বলে উঠি, শিরোনাম ঠিক হয়ে গেল, আর এই তো নতুন বাক্যও দুটো লেখা হয়ে গেল।

টেলিফোনের দু-প্রান্তে এবার হাহা হাসির ডুয়েট।

'যে কথা বলা হয়নি' পর্যায়ের প্রথম লেখা 'বুদ্ধভক্ত হনুমান'। প্রথম লেখাতেই লিখলেন 'এখন পিঠে মৃত্যুর নিঃশ্বাস। অতএব বলে যাওয়াই উচিত।' ছাপা হয়েছিল অবশ্য প্রথম তিনটি লেখা প্রকাশিত হবার পরে, চতুর্থ পর্বে।

তাঁর সঙ্গে বেলা এগারোটার নিয়মিত ফোনালাপে আমি নিশ্চিত জানতাম, অনেক কথাই তাঁর এখনও বলা হয়নি, সেসব কথা এবার বলবেনই— এমনই স্বচ্ছ ও সজীব তার স্মৃতি।

বলে যাওয়া উচিত বলে, না বলেই চলে গেলেন। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ কখনও মিথ্যা বলেন না জানতাম, এই একবার সত্যি বললেন না।

একদিন সকালের ফোনে আমাদের 'ছেলেবেলা' পত্রিকার তারিফ করে জানালেন, এবারে কোথাও কিছু লিখছেন না, শুধু শারদীয় 'ছেলেবেলা'য় একটা উপন্যাস লেখার ইচ্ছে। এই প্রথম বছর শারদীয় সংখ্যা বেরচ্ছে না, অতএব ধারাবাহিক উপন্যাস লিখলে আমাদের খুবই আহ্লাদ হবে— জানিয়ে আমি অভ্যাসমতো মাস্টারি করলাম— কর্নেলকে নিয়ে আর নয়, এবার এমন একটা নতুন কাহিনি ফাঁদুন যা পড়ে কর্নেলভক্তরাও চমকে উঠে ভাববে— মুস্তাফা সিরাজও এরকম লিখতে পারেননি!

এবার শুধু একপ্রান্তিক অট্টহাসি। হাসপাতাল থেকে ফিরে কখনও জানান, এখনও ক্যাথিটর খোলা হয়নি, কখনও বলেন, শরীরটা এবার খুব দুর্বল, 'যে কথা বলা হয়নি' শিগগিরই আবার আগের মতো চার কিস্তি এগিয়ে রাখব। একদিন বললেন, 'ছেলেবেলা'র উপন্যাসটা সময় নিয়ে ধীরে ধীরে মাথায় সাজাচ্ছি।

শেষবারে যখন হাসপাতালে গেলেন জানতাম এ তো দু-চারদিনের যাওয়া। ফিরে এসে তাঁর স্মৃতির রহস্যঝুলি খুলে বসবেন, 'ছেলেবেলা'র পাঠককে পদে পদে চমকে দিয়ে তিনি শুরু করবেন তাঁর নতুন কথকতা। ফিরলেন না।

বলে যাওয়া উচিত বলে, না বলেই চলে গেলেন। ফিরে গেলেন মাটির গভীরে। শেকড় যেমন। বাংলা কিশোরসাহিত্যের শিশুমৃত্যু ছাড়া একে আর কী বলব!

তাঁর বিবিধ আসন্ন লেখার কথায় টইটম্বুর তাঁর প্রাণোচ্ছল কণ্ঠস্বরের দার্ঢ্য আজও আমার কানে বাজছে।

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর ছোটদের বই

শাদা ঘোড়া

ছোটদের স্বপ্ন আর যুদ্ধের রূপকথা।
পাতায় পাতায় দেবব্রত ঘোষের ছবি।
ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট কর্তৃক বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় অনূদিত
পঞ্চম মুদ্রণ। ₹৩০

ঋষিকুমার

বাড়ির ছাদে নিজের হাতে বানানো চিড়িয়াখানা, চম্বলের ডাকাত, লাল-চোখ বেদে, বাঁশিওলা— এইসব নিয়ে ঋষিকুমারের রোমাঞ্চকর নানা অভিযানের কাহিনী।
পাতায় পাতায় দেবব্রত ঘোষের ছবি।
₹২০

অনলাইনে পেতে www.swarnakshar.in লগ অন করুন

স্বর্ণাক্ষর
Swarnakshar Prakasani Pvt. Ltd.
29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane
Kolkata-700 019
Ph: 2283-2320 **Fax:** 2287-6448
E-Mail: books@swarnakshar.in

দে বুক স্টোর, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, **বলাকা বুক স্টল** (কলেজ স্ট্রিট), **স্টার মার্ক**-এর সব দোকান ও অন্যান্য বইয়ের দোকানে পাবেন।

বিশেষ সংকলন

কেন লিখি

'কেন লিখি'— সমস্ত সৎ লেখকের কাছে এ এক অবশ্যম্ভাবী আত্মজিজ্ঞাসা। এই প্রশ্ন তুলে ধরা হয়েছিল এ সময়ের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রখ্যাত লেখকদের কাছে। তাঁরা জানিয়েছেন তাঁদের নিরপেক্ষ মতবাদ, অভিব্যক্তি। আর সেইসব লেখা নিয়েই 'জ্বলদর্চি' পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা 'কেন লিখি'। প্রকাশিত হয়েছে সম্প্রতি। এ সংখ্যায় লিখেছেন শক্তিপদ রাজগুরু, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, মহাশ্বেতা দেবী, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শঙ্খ ঘোষ, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, বুদ্ধদেব গুহ, সমরেশ মজুমদার, অমরেন্দ্র চক্রবর্তী, কমল চক্রবর্তী, দেবারতি মিত্র, কৃষ্ণা বসু, শ্যামলকান্তি দাশ, সন্দীপ দত্ত, জাহিরুল হাসান, জয় গোস্বামী, হর্ষ দত্ত, সুবোধ সরকার, পিনাকী ঠাকুর, রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, মন্দাক্রান্তা সেন, বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়, মউলি মিশ্র প্রমুখ।

*তাই তো! এ সময়ের লেখকরা কেমন করে ভাবছেন, কী ভাবছেন! তাঁরা কেন নিরন্তর কলম সচল রেখেছেন— এসব তো শুধুমাত্র লেখকেরই আত্মজিজ্ঞাসা নয়, একই সঙ্গে পাঠকেরও চিরন্তন কৌতূহল। 'জ্বলদর্চি'-র 'কেন লিখি' বিশেষ সংখ্যা থেকে কিছু লেখা এখানে তুলে দিচ্ছি 'কালের কষ্টিপাথর'-এর পাঠকের জন্য। সম্পাদকের আন্তরিক আগ্রহে। —**ঋত্বিক ত্রিপাঠী** (সম্পাদক 'জ্বলদর্চি')।*

যাঁরা পুরো সংখ্যাটাই পেতে ও পড়তে চান তাঁরা সরাসরি ফোন করতে পারেন: ঋত্বিক ত্রিপাঠী, মোবাইল: ৯৭৩২৫-৩৪৪৮৪।

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

মহাশ্বেতা দেবী

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

শঙ্খ ঘোষ

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

বুদ্ধদেব গুহ

পবিত্র সরকার

সুবোধ সরকার

অনিল ঘড়াই

লেখার লক্ষ্য

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
(১৯২৪)

মানুষের উদ্দেশ্য অন্তহীন,উপায়েরও অন্ত নেই। উপায়টার যে ব্যবহাররূপ,তাকে বলি কাজ। সাহিত্যও একটা কাজ। তার কোন্ উদ্দেশ্য?

প্রশ্নটা কিছু নতুন নয়। বস্তুত এতই পুরোনো যে, পুনশ্চ এ নিয়ে আর খোঁচাখুঁচি করাটাও ঈষৎ ক্লান্তিকর। নানান সময়ে, নানানতর পরিস্থিতিতে, এই প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে, সাহিত্যিকরা তার উত্তর দিয়েছেন। সে-উত্তর কিছু দিনের জন্য মানুষকে শান্ত রেখেছে, চিরদিনের জন্য রাখেনি। তা যদি রাখত, নতুন করে এই প্রশ্ন তবে আর উত্থাপিত হত না। প্রশ্নাবলী উত্থাপিত হয়েছে নানানতর ভাবে; কখনও নিছক অনুসন্ধিৎসার থেকে, কখনও উত্তর আদায়ের ভঙ্গিতে। আগে-আগে সাহিত্যিকরাই এ-সব প্রশ্নের জবাব দিতেন, ভঙ্গিটা পাল্টাবার পর থেকে আর দেন না। ইদানীং রাজনৈতিক নেতারা দিচ্ছেন।

উত্তরমালা আমাদের মুখস্থ নয়। শুধু জানি, মূল উত্তর দুটো। এক দল বলেছেন, সাহিত্যের জন্য সাহিত্য; অন্য দল বলেছেন, জীবনের জন্য। এবং জীবন বলতেই যেহেতু এঁরা সমাজজীবন বোঝেন, তাই এঁদের দাবি, সমাজসেবাতেই সাহিত্য তার সর্বশক্তি নিয়োগ করুক। সেটাই তার পরম উদ্দেশ্য হোক, সেইখানেই তার চরম সার্থকতা। দৃশ্যত, বিরোধের এইখানেই সূত্রপাত। কার্যত, এইখানেই এ-বিরোধের সমাপ্তি ঘটা উচিত ছিল। কেন, সেই কথাই বলছি।

মানুষ যে সমাজবদ্ধ জীব, এবং সমাজের উন্নতিতে যে তারও উন্নতি, তা নিয়ে, আশা করি, আর আপত্তি উঠবে না। যদি ওঠে এই প্রবন্ধ তা হলে অবান্তর। গোড়ার থেকেই তাহলে আলোচনা শুরু করতে হয়। সে-আলোচনা, বলাই বাহুল্য, সাহিত্য নিয়ে হবে না; মানুষের সঙ্গে তার পরিবেশের সম্পর্ক-নির্ণয়াত্মক একখানা নৃতাত্ত্বিক প্রবন্ধে গিয়ে ঠেকবে। তর্কের খাতিরেই ধরে নিচ্ছি, সমাজ আমাদের প্রাণধারণের জলবায়ু, আমাদের অস্তিত্বের প্রধানতম শর্ত। জলবায়ুটা যাতে বিশুদ্ধ করে তোলা যায়, তার দায়িত্বটাও তাই আমাদেরই।

প্রশ্ন হল, কী করে তা করা যায়? উত্তর হল, বিশেষ কোনও একটা ছক-কাটা পথে তা করা যায় না। এটা নেতিবাচক উত্তর, এতে কেউ খুশি

হবেন না। তাই প্রত্যয়বাচক ভঙ্গিতে বলি, বহুধা পথেই সমাজকল্যাণ সম্ভব। অর্থাৎ? যে যাঁর নিজের পথেই অগ্রসর হতে পারেন, সমাজকে তাঁর সেবা দিয়ে পরিপুষ্ট করে তুলতে পারেন। বৈজ্ঞানিক তাঁর বিজ্ঞানসাধনার পথে, শ্রমিক তাঁর শ্রমের পথে, কৃষক তাঁর কর্ষণের পথে। এ যা বলা হল, এর সবই কোনও-না-কোনও একটা কাজ। আগেই বলে নিয়েছি, সাহিত্যও একটা কাজ। তা যদি হয়, সাহিত্যিকের কাছেই বা সমাজ তার সেবা পাবে না কেন?

সাহিত্যিকের কাছেও পাবে। তবে প্রত্যক্ষভাবে নয়, পরোক্ষভাবে। শুধু সাহিত্যিকদেরই বা এ-ব্যাপারে একটা আলাদা কোঠা নির্দিষ্ট করে দিয়ে লাভ কী? প্রত্যেকেই বস্তুত সমাজকে এই পরোক্ষ সেবাই দিয়ে থাকেন। 'সমাজকল্যাণ করছি' — অষ্টপ্রহর এই চিন্তা মনে রেখে কি কেউ কাজ করেন? প্রত্যেকেই তাঁর নিজস্ব প্রয়োজনে কাজ করে যান। বৈজ্ঞানিক, শ্রমিক এবং কৃষকও তার ব্যতিক্রম নন। প্রয়োজনটা নিজস্ব হলেও পরোক্ষভাবে সমাজ তাতে উপকৃত হয়।

বিবৃতি প্রদানের সময় কি আমরা এত কথা মনে রাখি? রাখি না। সমাজকেই তখন সামনে এগিয়ে দিই। তাতে করে আমাদের কাজের ওপর বেশ একটা মহত্ত্বের প্রলেপ পড়ে। তখন বলি, যা কিছু আমরা লিখি, সমাজের জন্যেই লিখি। এইটুকু বলেই থামি না। আরও এক ধাপ এগিয়ে বলি, সমাজের জন্যে লিখলে তবেই সে-লেখা ভালো হয়। সমাজবোধটা সেখানে সাহিত্যের ভালো-হয়ে-ওঠার একটা শর্ত।

সাহিত্যের ক্ষেত্রে সমাজ-চেতনার উপর যদি কেউ সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করে থাকেন, তবে সে সমাজবাদী লেখকগোষ্ঠী। সম্প্রতি একখানা 'সমাজবাদী' গল্প-সংকলন পড়বার সৌভাগ্য হয়েছিল। গল্পগুলির মধ্যে সমাজচেতনা, সমাজের সর্বপ্রকার কল্যাণসাধনের আকাঙ্ক্ষা, খুব প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত। সুতরাং পূর্বোক্ত নিয়ম অনুযায়ী সাহিত্য হিসেবেও এগুলির সার্থক হয়ে ওঠা উচিত ছিল। তা কিন্তু হয়নি। অনেকগুলি আবার গল্পই হয়ে ওঠেনি। অথচ এঁরা সমাজবোধসম্পন্ন লেখক, সমাজের হিতসাধনই এঁদের শিল্পকর্মের একমাত্র আদর্শ। সে-আদর্শ আমাদের হৃদয়কেও প্রবলভাবে নাড়া দেয়, তাকে আমরা শ্রদ্ধাও করি। সেই সঙ্গে এ-কথাও বলি, অন্য কোনও উপায়ে তা সফল করতে গেলেই যেন ভালো হত। দুর্বল কতকগুলি গল্প লেখার কী এমন দরকার ছিল? সমাজের এতে উপকার হবে না।

সমাজকে যাঁরা প্রত্যক্ষ গুরুত্ব দিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে সকলেরই শিল্পসৃষ্টি দ্বারা সমাজ যেমন কিছু উপকৃত হয়নি, তেমনি সমাজকে

সমাজকে যাঁরা প্রত্যক্ষ গুরুত্ব দিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে সকলেরই শিল্পসৃষ্টি দ্বারা সমাজ যেমন কিছু উপকৃত হয়নি, তেমনি সমাজকে যাঁরা পরোক্ষ গুরুত্ব দিয়েছেন, তাঁদেরও সকলের দ্বারা সমাজ এখানে কিছু অপকৃতও হয়নি।

যাঁরা পরোক্ষ গুরুত্ব দিয়েছেন, তাঁদেরও সকলের দ্বারা সমাজ এখানে কিছু অপকৃতও হয়নি। আধুনিক সমাজবাদী লেখকগোষ্ঠীর সকলের দ্বারাই কি সমাজ কিছু উপকৃত হচ্ছে? শেলি, কিটস, ব্রাউনিঙ, রবীন্দ্রনাথ— এঁদের দ্বারাই কি সমাজ কিছু অপকৃত হয়েছে? এ-প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্য দু'বার করে ভাবতে হয় না।

ব্যাপারটা তাহলে কী দাঁড়াল? সমাজকল্যাণের জন্যে লিখলে তবেই সে-লেখা ভালো হবে, এটা এমন কিছু ধ্রুব সত্য নয়। হতে পারে, না-ও হতে পারে। অপরপক্ষে যিনি বলেন, সাহিত্যের জন্যেই সাহিত্য, তাঁর দ্বারাও সমাজের উপকার হওয়া সম্ভব। সাহিত্যিকের শক্তির উপরেই সেটা নির্ভর করছে। লেখাটা যদি ভালো হয়, তবেই সমাজের মঙ্গল।

কিন্তু সে-কথা থাক। সাহিত্যের দ্বারা কী কী জনকল্যাণকর কার্য সাধিত হতে পারে, তা আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়। তার দ্বারা কী হয় সেটা পরে ভাবা যাবে, আপাতত দেখা যাক, সে কী চায়। সাহিত্যের উদ্দেশ্য কী, আমরা লিখি কেন? এর উত্তর, আমাদের নিজেদের প্রয়োজনেই আমরা লিখি। জীবনকে জানবার জন্যে। আমাদের অভিজ্ঞতা, আমাদের অনুভূতিকে সম্পূর্ণ করবার জন্যে।

কথাটার একটু বিশদ আলোচনা প্রয়োজন। সকলেই স্বীকার করবেন, অভিজ্ঞতাই সাহিত্যকর্মের উৎস। অথচ সাহিত্যিকরা নিজ মুখেই ইতস্তত স্বীকার করেছেন, যে-বিষয়ে তাঁদের অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ, সে-বিষয়ে কোনও কিছু লিখতে তাঁরা আদৌ উৎসাহ বোধ করেন না। কেন করেন না? আসলে তাঁরা ভয় পান। অভিজ্ঞতার সেই সম্পূর্ণতাকে সাহিত্যে রূপ দেওয়া যাবে না, সে-ভয় নয়। সাহিত্যে তাকে রূপ দিতে গেলে, পুনশ্চ— চিন্তার ক্ষেত্রে হলেও — যে সেই অভিজ্ঞতার স্বাদ গ্রহণ করতে হবে, সেই ভয়। জীবনে আমরা দৈহিক অর্থে সুখ অথবা দুঃখ সঞ্চয় করি, লিখবার সময় চিন্তার ক্ষেত্রে তার স্মৃতিকে পুনরাবাহন করতে হয়। যে-সুখ অথবা যে-দুঃখ সম্পূর্ণ নয়, তাকে পুনর্জীবন দেওয়া সোজা। যে-সুখ অথবা যে-দুঃখের অনুভূতি সম্পূর্ণ, তাকে পুনর্জীবন দেওয়া কি এতই সোজা?

দুঃখের কথাটা বুঝলুম, সুখের কথাটা বুঝলুম না। দুঃখের স্মৃতিকে সাহিত্যিক না হয় না-ই জাগিয়ে তুললেন, সুখের স্মৃতির স্বাদ গ্রহণে তাঁর দ্বিধা কেন? দ্বিধা এইজন্যে যে, যে-সুখ সম্পূর্ণ, সম্পূর্ণ-দুঃখের সঙ্গে তার তিলমাত্রও পার্থক্য নেই। সুখের সম্পূর্ণতা আনন্দে, দুঃখের সম্পূর্ণতা বিষাদে। যা কিনা আনন্দেরই নামান্তর। সুখের সঙ্গে দুঃখের তফাত রয়েছে, আনন্দের সঙ্গে বিষাদের নেই। এর দুয়ের ভারই সমান দুঃসহ।

সম্পূর্ণ অনুভূতি নিয়ে যে সাহিত্যসৃষ্টি হয় না, তার আরও একটা কারণ আছে। অনুভূতি যাঁর সম্পূর্ণ, তাঁর সকল চাওয়াই মিটেছে, তাঁর সকল পাওয়াই তিনি পেয়ে গেছেন। তিনি আবার লিখতে যাবেন কোন দুঃখে? এ-অনুভূতি সাহিত্যিকের কিছু একচেটিয়া সম্পত্তিও নয়। এই সম্পূর্ণতাকে সকলেই স্পর্শ করেন, জীবনের কোনও-না-কোনও ক্ষেত্রে করেন। শ্রমিক তাঁর শ্রমের মধ্যে একে পান, কৃষক তাঁর কর্ষণের মধ্যে।

আমরা পাইনি। পাইনি বলেই আমরা লিখি। যে-কারণে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতা নিয়ে সাহিত্য লেখা হয় না, ঠিক সেই কারণেই আবার অর্ধ-অভিজ্ঞতা নিয়ে আমরা সাহিত্যসৃষ্টির তাড়না বোধ করি। জীবনের ক্ষেত্রে আমাদের অভিজ্ঞতা অর্ধেক, সৃষ্টির মাধ্যমে— চিন্তার ক্ষেত্রে হলেও— বাকি অর্ধেক আমাদের অর্জন করতে হয়। জীবনের ভাণ্ডারকে এই পথেই আমরা সম্পূর্ণ করে তুলি। না-লিখেই যদি সেই সম্পূর্ণতাকে অর্জন করা যেত, আমরা লিখতুম না।

কেন লিখি

মহাশ্বেতা দেবী
(১৯২৬)

এটা জানতে চাইলেন ঋত্বিক ত্রিপাঠী। উত্তর তো একটাই হয়, 'লেখা ছাড়া আর কিছু করতে শিখিনি, তাই লিখি।' অথচ লিখতে যখন শুরু করি, তখন জানতাম না পেশায় লেখকই হব। অনেক রকম জীবিকার চেষ্টা

করেছি একদা। এমনকি, জলপথে জাহাজে আমেরিকায় বাঁদর চালান দেবার প্রস্তাবও পেয়েছিলাম একদা। সে সব তো হোল না। বড়ই একরোখা আমি, বড়ই গোঁ আমার। শেষ অবধি, অনেক রকম বৃত্তি নিয়ে অনেক চেষ্টা করার পর বুঝলাম, নবারুণ যেহেতু বড়ই ছোট, —এখনো বছর দুই ওকে সর্বদা দেখা দরকার। তখন লেখার কথা গুরুত্ব দিয়ে ভাবলাম।

আমার প্রথম বই 'ঝাঁসীর রাণী', নিউ এজ প্রকাশনী ছাপেন। ওঁরা নামি প্রকাশক। বিমল মিত্র, শঙ্কর, এ সব লেখকদের বই ছেপেছেন। বই প্রকাশ হোল, যে টাকা পেলাম, তাও কাজে লাগল।

তখনো নয়, তার বেশ কিছু কাল পরে অন্যান্য কাগজ ও পত্রিকায় লিখতে শুরু করি। কোনো দিনই বেস্ট সেলার যাকে বলে, তা ছিলাম না। আর, পেশায় আমি লেখক। কিন্তু লেখাই যখন একমাত্র পেশা হয়, তখন সব লেখা ভালো হতে পারে না। যাঁদের হয়, তাঁদের হয়। আমার বেলা তা হয়নি।

তবু সাধ্যমতো লেখাই ধরে আছি। মানুষ আগের চেয়ে চলমান সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হয়ে উঠল এবং ভোটের মাধ্যমে রাজ্য সরকারের একটা পরিবর্তন আনল, তারও সাক্ষী থাকলাম। দৈনিক কাগজেও তো অনেক লিখেছি, আজও লিখি।

শেষ কথাটাই সত্যি। লেখা ছাড়া কিছু করতে পারি না বলে লিখি। কয়টা লেখা বা পাঠযোগ্য হয়? বিচার করবেন পাঠকরা। পাঠকসমাজ যতদিন না মুখ ফেরাচ্ছেন, ততদিন আমি লিখেই যাব।

তবে খুব সত্যি কথাটা হল, ছোটদের জন্যে লিখতে ইচ্ছে করে, যদি সময় পাই তো লিখব।

কেন লিখি

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ
(১৯৩০-২০১২)

প্রশ্নটার সঙ্গে আপাতদৃষ্টে একটা উত্তর জড়িয়ে আছে 'লেখা-পড়া' এই শব্দবন্ধে। বাংলা বাগধারাতে এই একটা স্বতঃসিদ্ধ উক্তি। লিখতে হলে পড়তে হয়। কিংবা আরও তীক্ষ্ণ করে বললে মোদ্দা কথাটা দাঁড়ায় লেখা ও পড়া এ দুটোকে পৃথক করাই যায় না। এরা অচ্ছেদ্য।

এবার আসছি নিজের দিকে। সোজা কথায়:

একজন লেখক হিসেবে এতদিন পরে টের পেয়েছি, আমি কেন লিখি! এই জঘন্য পৃথিবী বদলানোর তীব্র ইচ্ছা আমার অবচেতনায় আলপিনের মতো বিদ্ধ করে বলেই আমি লিখি।

আমি পড়েছিলাম বা অনেক পড়েছি এবং পড়ি বলেই লেখার আখড়ায় আমার বসবাস। এ তো আমার দিক থেকে পড়ারই প্রতিক্রিয়া। হ্যাঁ, যাঁরা লিখেছেন বা লেখেন, তাঁদের প্রতিদ্বন্দ্বী হওয়ারও সাধ। সেই সুদূর অতীতে বাল্যদশায় 'বেড়ালঠাকুরঝি', 'টুনটুনি'-র বই এইসব পড়েই না আমার মনে হয়েছিল আমিও এরকম গল্প লিখতে পারি। সেই ইচ্ছে আর সাধ বয়স বাড়তে বাড়তে আমাকে লেখালেখির যুদ্ধে নামিয়েছিল। এই প্রবীণ বয়সেও লড়াইটা থেকে সরে দাঁড়াতে পারছি না। কারণ সরে দাঁড়ালেই লেখক-আমি-র মৃত্যু এবং সেই মৃত্যু আমার কাছে দুঃসহ হবে।

কিন্তু শুধু লিখে গেলেই তো হয় না। আমি যা লিখছি, তা কেউ পড়ছে কি না, সে দিকেও লক্ষ্য রাখতে হয়। এইসব লেখার সঙ্গে অন্যের পড়াও জড়িয়ে আছে। তাই লেখকের পক্ষে এ-ও জানা দরকার, শুধু অন্যের পড়া নয় তারিফও চাই। তারিফ এলে লেখার জোয়ার আসে। খুলে বলতে দ্বিধা নেই। এখন আমার ঘরভরতি হাজার লেখকের হাজার বই এবং তাদের মধ্যে আমারও লেখা বই অন্তত শ'তিনেক। সুদূর বাল্যে এটাই হয়তো মনের কোণে ইচ্ছে হয়ে লুকিয়ে ছিল। পরের কথা পরে। এখন তো আছি। মৃত্যুর পর আমি থাকছি না। অতএব তখন আমার এই শ'তিনেক থাকল কি না থাকল, কিছু যায়-আসে না। বাদবাকি হাজার তো থেকেই যাবে।

তো এ সব হ'ল সাদাসিধে হিসেব। উপর-উপর দেখা। আড়ালের দিকে এ বয়সে দৃষ্টিপাত করে চমকে উঠি। আবছায়ার মতো ভেসে আসে টুকরো-টুকরো কী সব কথা। বিস্ময়কর কথার ঝাঁক মাছের ঝাঁকের মতো ভেসে উঠেই তলিয়ে যায়। দিনের পর দিন রাতের পর রাত তীক্ষ্ণ লক্ষ্য রেখে জানতে পেরেছি, আমার অগোচরে একটা জোরালো আকাঙ্ক্ষা প্ররোচিত করেছিল। যা সব দেখেছি-দেখছি, জেনেছি-জানছি, তাতে বুঝতে পেরেছিলাম, এই সমাজ এই পৃথিবী বড়ো অবাঞ্ছিত। বড়ো কষ্টকর। প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে প্রকৃতির কণ্ঠস্বর শুনেছি। মানুষের জীবনে বৃক্ষের মতো ঊর্ধ্বগামিতা চায় সে। চায় নদীর মতো মানুষও বহতা হোক। বাঁধ বাঁধলেই বিপুল ধারা চারদিকে ছড়িয়ে সর্বনাশী হবে নদী। বৃক্ষের তলায় আরেক বৃক্ষ উঠতে চাইলে তার উত্থান ব্যর্থ হবে। তার মানে, প্রাকৃতিক স্বাধীনতা আমি চিনেছিলাম। সেই স্বাধীনতা মানুষের জীবনে ব্যাপ্ত না হলে সব সভ্যতা ব্যর্থ। তাই মানুষের সমাজ বদলানো দরকার। কার্ল মার্ক্সের সেই আর্ষবাক্য মনে বারবার ভেসে এসেছে: 'দার্শনিকরা এ যাবৎকাল পৃথিবীর ব্যাখ্যাই করেছেন। এখন মোদ্দা কথাটা হ'ল, কী করে একে বদলানো যায়।' একজন লেখকও তো প্রকৃত প্রস্তাবে একজন দার্শনিক।

কিন্তু একজন লেখক হয়ে আমি ওই দায়িত্ব কেমন করে পালন করতে পারব? নিজের মনের ভিতরেই উত্তর ভেসে এসেছে। যে দর্জি সৈনিকের জামা সেলাই করছে, এমনকি যে সেই জামার বোতামঘর সেলাই করছে, তারাও পরোক্ষে যুদ্ধের আড়ালে সৈনিকের ভূমিকাও পালন করছে। একজন লেখক অবশ্যই শিল্পের প্রতি গোড়াতেই দায়বদ্ধ। সেই দায় মেনেও তো তিনি সমাজ বদলানোর যুদ্ধের সৈনিক হতে পারেন। শিল্পের দায়বদ্ধতার সঙ্গে সামাজিক দায়বদ্ধতারও অচ্ছেদ্য বলে বিশ্বাস করি।

এ যাবৎকাল সব মহৎ লেখক সব শ্রেষ্ঠ লেখক আমার বিচারে নিজের অলক্ষ্যে এই দায়িত্ব পালন করে এসেছেন। বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ লেখকরাও কেউ প্রত্যক্ষ কেউ পরোক্ষে তা-ই করেছেন। একজন লেখক হিসেবে এতদিন পরে টের পেয়েছি, আমি কেন লিখি! এই জঘন্য পৃথিবী বদলানোর তীব্র ইচ্ছা আমার অবচেতনায় আলপিনের মতো বিদ্ধ করে বলেই আমি লিখি।

কেন লিখি

শঙ্খ ঘোষ
(১৯৩২)

আশ্চর্য, এই প্রশ্নটা কোনওদিন করিইনি নিজেকে।

সত্যিই তো, কেন লিখি? লেখার বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের নির্দেশনামা অবশ্য অল্প বয়সেই পড়েছিলাম। অর্থের জন্য বা যশের জন্য লিখতে বারণ করেছিলেন তিনি। সে-বারণ মানতে বিশেষ সমস্যা হয়নি, কেননা

ও-দুটো নিয়ে ভাববার কোনো সাহসই ছিল না কোনোদিন। সমস্যা হয়েছিল শুধু কীজন্যে লিখতে হবে বঙ্কিমের সেই নির্দেশটা নিয়ে। না, দেশের বা দশের উপকার করবার কথা ভেবেও আমার লিখতে ইচ্ছে হয়নি কখনো। এও অবশ্য সাহসেরই প্রশ্ন। আমার লেখায় অন্য কারো 'উপকার' হবে, একথা ভাবতে গেলে আত্মপ্রত্যয়কে একেবারে তুঙ্গে তুলতে হয়।

তাই, কী কী কারণে লিখব না, সেটা খানিক জানাই ছিল। কিন্তু লিখব কী কারণে? সেদিকটা আর ঠিকভাবে ভেবে দেখা হয়নি।

তাহলে লিখলাম কীভাবে?

শুরু হয়েছিল একরকম খেলায় খেলায়।

বারো বছর বয়স তখন আমার। অসময়ের সান্ধ্যঘুম থেকে তুলে এনে মা একদিন খাওয়াতে বসেছেন, এবং আমাদের ভাইবোনদের ভাবী এবং অনিবার্য অপদার্থতা নিয়ে মৃদুভাষে কথা বলছেন, পৃথিবীতে কত লোকে কত কিছু পারে তার নানা দেশীবিদেশী দৃষ্টান্ত শোনাচ্ছেন। স্নিগ্ধতায়-বলে-যাওয়া সেই পারবার হিসেবের মধ্যে ছিল দেশচর্যার কথা বিজ্ঞানচর্চার কথা শিল্পসাহিত্যের কথা খেলাধুলোর কথা। আধোজাগ্রত ভাবে মায়ের সেই কথাগুলি শুনতে শুনতে বেশ-একটা লজ্জা আর অক্ষমতার বোধে ছেয়ে যাচ্ছিল মন।

পরদিন সকালবেলায়, বেশ প্রফুল্লমুখেই, বাজার থেকে কিনে এনেছিলাম লাইনটানা একখানা এক্সারসাইজ খাতা। গল্পকবিতার কথাও তো বলেছিলেন মা। বেশ, তাহলে কবিতাই লেখা যাক। ছন্দ মিলিয়ে কিছু লিখে দেওয়া, এ আর এমন শক্ত কথা কী! খাতাটি খুলে নিয়ে, আমাদের সমবয়সী এক বন্ধুর বিষয়ে দুপাতা পদ্য লিখে ফেলা গেল সেই সকালবেলায়। কোনো শোক থেকে জেগে ওঠেনি সে-লেখা। বহিরঙ্গে অতিকায় স্থূলতা সত্ত্বেও শরীরে-মনে বন্ধুটি যে নিরতিশয় পলকা, এ নিয়ে কৌতুকই ছিল সেই আদিকাব্যের বিষয়।

স্কুলের পড়া ফেলে এ-রকম সৃষ্টিমহিমায় ব্যস্ত দেখে মা কি খুব আশ্বস্ত হলেন সেদিন? তেমন মনে হলো না ঠিক। কিন্তু এ নিয়ে ভাববার আর সময় রইল না তখন, আমার পাতার পর পাতা খাতার পর খাতা ভরে উঠতে লাগল লাইনে লাইনে। বলা নিশ্চয় বাহুল্য যে অক্ষম সেই ছন্দরচনাগুলির মধ্যে কোথাও কোনো কবিতা ছিল না।

কলকাতার কলেজে এসে ভর্তি হয়েছি যখন, সেই আমার পনেরো থেকে সতেরো বছর বয়স পর্যন্ত থাকতে হয়েছিল ছোটো একটা হস্টেলে। অনেক বন্ধুর সমবায়ে দিন কাটাবার প্রথম সেই অভিজ্ঞতা। অনেকের মধ্যে একজনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা তখন এতই বেশি হলো যে তাকে

লেখাটা হয়ে যাবার পর, যৎসামান্য কিছুটা সময়ের জন্য সেটা কমে যায় ঠিকই, যেন বুক থেকে নেমে গেল মস্ত একটা পাথর। কিন্তু তার পরে আবার অল্পে অল্পে উঠে আসে সেই পাথর।

একদিন দেখাতে হল সঙ্গে-নিয়ে-আসা আমার গোপন সেই খাতাগুলি। সাবধান করেছিলাম তাকে, কেউ যেন না জানতে পারে কখনোই।

স্বাভাবিক কারণেই এ নিষেধবাক্য মান্য করেনি সে। কথাটা সে অকাতরেই ছড়িয়ে দেয় সবার মধ্যে। আর সেই সবাই, দেখা হলেই তখন সহাস্যে বলতে থাকে আমায়: এই-যে, তুমি না কি কবিতা লেখো?

এ-জিজ্ঞাসায় নিশ্চয় দোষের কিছু ছিল না। কিন্তু আমার মনে হল, কেন এরা জানবে এটা। এরা কি কোনো কৌতুক করছে লেখার কথা নিয়ে? কেন এমনভাবে বিশ্বাস ভাঙল আমার বন্ধু?

মস্ত সেই অভিমানে, সেই বন্ধুটির সামনে, তিন-তিনটি ভরে-ওঠা খাতা পুড়িয়ে দিলাম একদিন। কাণ্ড দেখে বন্ধু এতই হতবাক যে বাধা দেবারও চেষ্টা করতে পারেনি। ভস্মগুলির সামনে বসে অস্ফুটে শুধু বলেছিল পরে: এটা কী করলি?

কী করলাম কেন করলাম, আমার কাছেও সেটা খুব স্পষ্ট ছিল না তখন। তখন কি মনে হয়েছিল, কবিতা শুধু একজন-দুজনের মধ্যে থেকে গেলেই ভালো? অন্তত সেইরকমই বলেছিলাম বন্ধুকে।

সে ভস্ম নিয়ে আজ আর কোনো আপশোস হয় না একেবারেই, কেননা তার মধ্যে কবিতার ক্ষীণ প্রস্তুতি থাকলেও কবিতা ছিল না বিশেষ। আমার কবিতার বইয়ের ভিতরে যা-কিছু সংকলিত হয়ে আছে, তার প্রাচীনতম লেখাটি তৈরি হয়ে উঠল এর ঠিক পরে, ওই সতেরো বছর বয়সেই। মনের মধ্যে হঠাৎ তখন জেগে উঠেছে ভালোবাসার এক তীব্রতা, সমবয়সিনী একটি মেয়ে তার উপলক্ষ। মেয়েটি কোনোদিনই জানেনি সেকথা, বন্ধুরাও কেউ না, আমার সেই গোপন লালনের চাপ এতদূরই পৌঁছল যে নিজেকে লুপ্ত করে দেবার ইচ্ছে হল মনে। কিছুদিন এই একলা-অনুভব বহন করতে করতে, জীবনমৃত্যুর টান বুঝতে বুঝতে, হঠাৎ একদিন জেগে উঠল এক লেখা, সাময়িক এক শান্তি এল যেন! দু-চারজন বন্ধু (একজনের বাইরে দু-চারজনে তখন পৌঁছেছে আমার সাহস) তারিফও জানাল সে-লেখার, কিন্তু কারো পক্ষেই আর বোঝা সম্ভব ছিল না যে তার উৎসে আছে অবরুদ্ধ এক ভালোবাসার কষ্ট। বোঝা সম্ভব ছিল না যে এক হিসেবে সেটা প্রেমেরই কবিতা।

কষ্টের অবশ্য রকমফের হতে লাগল এর পর। এ-রকমই কোনো-না-কোনো কষ্ট থেকে উনিশ বছর বয়সে লেখা হয়ে গেল 'যমুনাবতী', একুশ বছরে 'দিনগুলি রাতগুলি'। আকস্মিক ভাবে হানা দেয় সেসব লেখা, যেন কোনো ঢেউ নিয়ে এসে, শুধু স্মৃতিতে ফিরে গেলে এখনও টের পাই শরীরমনজোড়া সেই কষ্টের অনুভবটা। লিখে ফেলতে পারলে মনে হয়, মনে হয়েছিল, কষ্টটা যেন কোথাও ঝরে গেল।

যায় কি ঝরে, সত্যি? লেখাটা হয়ে যাবার পর, যৎসামান্য কিছুটা সময়ের জন্য সেটা কমে যায় ঠিকই, যেন বুক থেকে নেমে গেল মস্ত একটা পাথর। কিন্তু তার পরে আবার অল্পে অল্পে উঠে আসে সেই পাথর। কষ্টটা এবার বেড়ে যায় আরো, নিজেকে ঠিকমতো প্রকাশ করতে না-পারবার কষ্ট।

এইসব কষ্টের ধারাবাহিক উপশম ছাড়া, আবারও ধারাবাহিক কষ্ট পাওয়া ছাড়া, লেখার আর কী কারণ থাকতে পারে? অন্তত আমার লেখার আর কোনো কারণ নেই। রাত্রির নির্জনতম প্রহরে নিজেকে কি প্রশ্ন করেছি কেন আমাকে লিখতেই হবে, রিলকে যেমন পরামর্শ দিয়েছিলেন? না, সে-প্রশ্নও আমি করিনি কখনো। কেননা সে-প্রশ্নেরও মধ্যে নিহিত থাকে একটা বিবেচনা, লিখব কি লিখব না তার হিসেবনিকেশ। সেই বিবেচনাকেও নিষ্প্রয়োজন আর নিষ্ফল বলে মনে হয় আমার। লেখা যদি নিজেই এসে জাপটে ধরে, তবেই হতে পারে লেখা। যে-অনুভবে আমি আর আমার পায়ের কাছের মাটি একাকার মিশে যায়, যে-অনুভবে আকাশজোড়া নক্ষত্রলোককে মনে হয় যেন নিজেরই স্পন্দিত বুক, ব্যক্তিপ্রেমেরই সঙ্গে যে-অনুভবে মিশে যায় বাইরের গোটা বিশ্ব, যে-অনুভব প্রত্যেক প্রাপ্তিকে মনে হয় অপ্রাপ্তির গহ্বর কেননা আরো-কিছু যেন অতন্দ্র হয়ে জেগে আছে কোথাও, সেই অনুভবের আঘাতটা শরীরে এসে পৌঁছলেই লেখা হতে পারে কবিতা।

না যদি পৌঁছয়? হবে না তবে লেখা।

পুনশ্চ।

ভুলে গিয়েছিলাম গদ্যের কথা বলতে।

গদ্যও তো লিখেছি বেশ-কিছু। সেও কি ওই একই ভাবে? একই কারণে?

না, তার কারণটা কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন। 'নিঃশব্দের তর্জনী' নামে একটি সাড়ে তিন পৃষ্ঠার প্রবন্ধ, 'জার্নাল'-এর লেখাগুলি আর খুদে তিনটি কিশোর-উপন্যাস ছাড়া জীবনে আর কোনো গদ্য আমি স্বেচ্ছায় লিখিনি, সানন্দে লিখিনি। সবটাই লিখেছি শুধু আতঙ্কে। লিখব-না লিখব-না করতে করতে সম্পাদকদের রুষ্ট বা আহত মুখের কথা মনে করে কলম ধরেছি শেষ পর্যন্ত, আড়ষ্ট আর মরিয়া ভাবে লিখতে লিখতে ভেবেছি এই শেষ, এর পর থেকে 'না' বলব অনেক ব্যক্তিত্ব বা আর্তনাদ নিয়ে। কিন্তু তার পরেই পরম ব্যক্তিত্বহীনতায় আবার ধরা পড়ে গেছি অন্য কোনো সম্পাদকের মায়াজালে। এই ঘূর্ণির কোনো শেষ নেই।

এ-লেখাটি লিখতে লিখতেও যেমন ভাবছি, আর কখনোই লিখব না কোনো গদ্য।

লিখতে চাওয়া

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত
(১৯৩৩)

লিখতে চাওয়ার অবচেতন কারণ খুঁজতে গিয়ে প্রথমেই কোনো কোনো চিরায়ত পূর্বসূরির উদাহরণ চোখের সামনে ভাসে।

এঁদের অন্যতম একজন মুসিল। সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার মাঝখানেই একদিন অপ্রত্যাশিতভাবে সেই কথাশিল্পীর মৃত্যু হলে তাঁর স্ত্রী আমাদের জানিয়েছিলেন: 'লেখালিখির কাজটা ঠিকঠাক এগিয়ে গেলে ওঁকে ভারী প্রফুল্ল দেখাত। বলা বাহুল্য প্রায়শই এমনটা হত না। কিন্তু এই দিনটায়, মৃত্যুর পাঁচ মিনিট আগে তাঁকে যেরকম প্রসন্ন দেখেছি আগে তেমন কখনোই দেখিনি। অর্থাৎ তিনি এমন কয়েকটি বাক্য লিখতে পেরেছিলেন যেগুলি মুছে যাবার মতো নয়।'

প্রত্যেক লেখকেরই মনে বোধহয় এভাবেই ঠিকমতো লিখতে লিখতে মরবার সাধ থাকে। মুসিলের ভাষায় বলা যায় লেখকেরা সাধারণত 'বিশেষত্বহীন মানুষ' (Der Mannohne Eigenschaften) হয়েই থাকেন। যদিও বা সামাজিক ভূমিকায় তাঁদের কার্যকলাপের মধ্যে কখনো কখনো অতিরিক্ত এক ধরনের ব্যক্তিত্বের সঞ্চার ঘটে যায়, সচরাচর তাঁর নির্জীব গ্রাহকের মতো জীবন থেকে আহরণ

লেখার সময়, আচমকা তাঁদের ব্যক্তিবিশেষত্বের অভিব্যক্তি হয়। সেই দিব্য মুহূর্তের জন্যই তো বেঁচে থাকা আর লেখালেখির তাৎপর্য।

করতেই ভালোবাসেন। এবং, লেখার সময়, আচমকা তাঁদের ব্যক্তিবিশেষত্বের অভিব্যক্তি হয়। সেই দিব্য মুহূর্তের জন্যই তো বেঁচে থাকা আর লেখালেখির সমার্থক তাৎপর্য।

এই অভীপ্সা চরিতার্থ করতে গিয়ে অনেক প্রগতিলেখকের ধরনধারণকেও স্বার্থপরসুলভ মনে হতে পারে। কুর্ট টুখোল্স্কি তার দৃষ্টান্ত: 'বিশ্বসাহিত্য বলতে যা বোঝায় আমার নিজের রচনাকাজের ভিতর থেকেই সেটা আমি পেয়ে যাই; অন্যদের লেখাটেখা পড়তে গেলে নিজের লেখাটা লিখব কখন?'

সত্যের সৌজন্যে আজ অবশ্য বড়ো লেখকের এই সৎ পরামর্শকেও কিছু হীনযানী বলে মনে হয়। এটা অত্যন্ত করুণ ঘটনা যে, অধুনা অনেকেই তাঁদের নিজের লেখার অফ্-প্রিন্ট আগলে রেখে সন্তুষ্ট থাকেন, অন্যান্য সতীর্থ কী লিখেছেন সেদিকে তাঁদের হুঁশই থাকে না। বছর কয়েক আগে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে মৌলালির রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতে ঘুরতে সেই আক্ষেপই বিনিময় হচ্ছিল। সুভাষদা একসময় দাঁড়িয়ে পড়লেন, এবং গভীর দুর্ভাবনা সহকারে বলতে থাকলেন: 'তুমি লক্ষ করেছ আজকাল কেউ কেউ জানে না কেন লিরিক লিখছে আর তারা নিজেদের লেখার মধ্যেই ডুবে থাকছে, অন্যদের কবিতা তেমন পড়ছে না। সেটা হলে তো নিজেদের লেখা একটা জায়গার মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে থাকবে, আর এগোবে না।'

তার মানে 'কেন লিখি' আর 'কেন পড়ি' এই দুটি প্রশ্নই এ ওর পরিপূরক। শুধু লিখনশৈলী নয়, কিছু একটা বলতে চাওয়ার আর্তিও একজন লেখকের জন্মশর্ত। অপরাপর রচয়িতারা কী বলছেন সেটা না জানলে একজন লেখকের সৃজন ব্যাপার হয়ে ওঠে আত্মপ্রদক্ষিণ এবং পুনরাবৃত্তির অ্যারিনা, নিঃসঙ্গ অ্যাম্ফিথিয়েটারের বালুময় বধ্যভূমি যেখানে নিজের সঙ্গে নিজের মল্ললীলাটাই একমাত্র উদ্দেশ্য হয়ে ওঠে। বিষ্ণু দে, যতদূর মনে হয়, আত্মকেন্দ্রিক এই অনুষঙ্গ মনে রেখেই নিজের ছায়া কুস্তি করে শুইয়ে দেবার আপাত হাস্যকর প্রস্তাব করেছিলেন।

কেউ কেউ নিশ্চয়ই মিডিয়ার এই যুগে এই সচেতনতাকে অবাস্তব বলে অভিযুক্ত করবেন। এঁদের মধ্যে অনেকেই ক্রমাগত নতুন কিছু দেখবার ও জানবার ভয়ে দূরদর্শনের সম্মোহ থেকে পালিয়ে বেতারপন্থী হয়ে উঠেছেন। তাঁদেরও সংগত আশঙ্কা, ৫৩০০ আকাশবাণী এবং বিশ্ব ব্যেপে তাঁদের ১৬৭২০ বেতারতরঙ্গের দাপটে মাথাটা শান্ত রাখাই মুশকিল। আর তাঁদের দৌলতে প্রতিনিয়ত অভিনব সমাচার পরিবেশিত ও 'প্রণীত' হতে থাকলে লেখক তাঁর নিজস্ব বক্তব্য ভুলে যাবেন, এবং ফলত তিনি যা লিখবেন সেখানে স্বকীয় কোনো সৃষ্টিকোণই থাকবে না।

এসব ভয়ভাবনা যে একেবারেই অপ্রাসঙ্গিক, সে কথা বলতে চাই না। বিশেষত মিডিয়ামথিত এই সময়টাতে লেখার চেয়েও প্রকাশ করার দিকেই যে প্রযোজকদের নজর পড়েছে অনেক বেশি। এর ফলে সপ্রতিভ আবৃত্তির মাধ্যমে যেমন মাঝারি কবিতাও শ্রেষ্ঠত্বের অভিধা পেয়ে যেতে পারে, ঠিক তেমনি অলেখকের মূর্তি মহান স্রষ্টার বিগ্রহে অনূদিত হতে পারবে। কিন্তু লেখাটাই যদি লক্ষ্য হয়, ভুলভুলাইয়া এই সময়টাকে না ভালোবেসে আমাদের কোনো উপায় থাকে না। তার কাছ থেকে প্রতিদিন আমরা কসোভো ও কাশ্মীরের মতো অজস্র অমীমাংসিত সমস্যার চ্যালেঞ্জ অর্জন করে নিতে পারব, আর আমাদের এই স্বল্পায়ু গ্রহবিশ্বকে হয়তো উপহার দিতে থাকব নির্ভার এক একটি প্রেমের কবিতা যাদের পরতে পরতে লেগে থাকবে অস্তিত্বের মায়া।

না লিখে পারি না

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়
(১৯৩৪)

কেন লিখি এ-প্রশ্ন বড়োই অবান্তর। না লিখে আমার উপায় ছিল না। অস্তিত্বের সংকট থেকে লিখি। জন্মেছি, বড়ো হয়েছি, জীবনের নানা সংঘাতে নিজেই জর্জরিত, দেশ ভাগ থেকে দাঙ্গা, যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ এবং সমাজের শোষণ আমাকে পীড়া দেয়। আমার অস্তিত্ব নাড়া খায়, না লিখে পারি না। কিছুটা প্রতিবাদের মতো আমি আমার অনুভূতিমালা সমূহ লেখায় ধরে রাখার চেষ্টা করি।

দেশ ভাগ আমাকে ছিন্নমূল করেছে।

আসলে
মহাকালের প্রতিদ্বন্দ্বী
নিজেকে ভাবতে ভালোবাসি।
মানুষের ধর্মই যে এমন,
সে মহাকালকে
বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে
বেঁচে থাকতে চায়।
বেঁচে থাকতে চায় বলেই
কাল কিংবা মহাকাল
তাকে কিছুতেই
হতাশ করতে পারে না।

কেন লিখি?

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
(১৯৩৪-২০১২)

কেন লিখি, এই প্রশ্ন যদি আমার চব্বিশ-পঁচিশ বছরে করা হত, তা হলে উত্তর এক রকম হত। চল্লিশ-বেয়াল্লিশ বছরে অন্যরকম। এখন হয়তো আর এক রকম। এ ব্যাপারে কোনো স্থির সত্য নেই। অল্প বয়েসের কথাটাই প্রথমে ধরা যাক। লেখালেখির দিকে কেন এত ঝোঁক এল, তার কোনো সঠিক যুক্তি হয়তো নির্ধারণ করা যাবে না, কিছু কিছু সূত্রে বার করা যেতে পারে।

স্কুল বয়েস থেকেই বই পড়ার দারুণ নেশা পেয়ে বসেছিল। এই নেশা কারুর কারুর হয়, কারুর কারুর হয় না। আমার এই নেশা ছিল অ্যালকোহলিকদের মতন— বই না হলে চলতই না। কেনার ক্ষমতা ছিল না, লাইব্রেরি ব্যবহার করতাম, অন্যের বাড়ি থেকে চেয়ে আনতাম, এমনকি চুরিও করেছি মাঝে মাঝে। তবে পড়ুয়াই তো লেখক হয় না, আমারও ঐ বয়েসে লেখক হবার কোনো উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল না।

আমার চরিত্রে একটা দ্বৈত সত্তা ছিল বোধহয়। একদিকে ছিলাম লাজুক, অচেনা লোক, এমনকী আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গেও ভালো করে কথা বলতে পারতাম না, নেমন্তন্ন বাড়িতে গিয়েও একটা বই কোনো রকমে জোগাড় করে মুখ ঢেকে বসে থাকতাম নিরালা নিভৃতে। আবার বন্ধুদের একটা বেশ বড়ো দল ছিল, তাদের সঙ্গে আড্ডা দিতে উৎসাহের কোনো ঘাটতি ছিল না। বয়ঃসন্ধিকালে বন্ধুমণ্ডলীর মধ্যে নিজের কিছু একটা কৃতিত্ব জাহির করার প্রবণতা থাকে। আমার সে রকম দেখাবার মতন কিছুই ছিল না। অত্যন্ত গরিব, রিফিউজি পরিবারের ছেলে, চেহারা সুন্দর না, পোশাক অতি সাধারণ, পড়াশুনোতেও মাঝারি। খেলাধুলো বা গান-বাজনা যে একেবারে পারি না তা নয়, কিন্তু প্রথম হবার মতন নয়। আবার অল্প বয়েসের কয়েকজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু আজন্ম বন্ধু থেকে গেছে, যেমন ভাস্কর দত্ত, আশুতোষ ঘোষ, উৎপল রায়চৌধুরী, এরা কেউ কখনো লেখেনি, কিন্তু অন্যান্য অনেক গুণ ছিল। বন্ধুদের মধ্যে একজনই, দীপক মজুমদার কবিতা লিখতে শুরু করে এবং কয়েকটি পত্র-পত্রিকায় ছাপাও হয়। দীপক কখনো স্বরচিত

এক জীবনে কত অভিজ্ঞতা! সমুদ্রে ঘুরে বেড়িয়েছি সাধারণ জাহাজী হয়ে। ট্রাক ক্লিনার ছিলাম একটা গ্যারেজে। প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকতারও অভিজ্ঞতা আছে। তারপর কোনও স্কুলের প্রধান শিক্ষক। সব ছেড়ে কলকাতায় কারখানার ম্যানেজার, তারপর সাংবাদিকতা, নানা পেশায় নানা মানুষজনের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া আমার লেখার বিষয় — একটা সময়কে ধরে রাখা। এই সব অভিজ্ঞতা এমন উৎপীড়নে ফেলে দেয় যে আমি না লিখে পারি না।

আমি বার বার আমাকে নিয়েই লিখি।

আমি ছাড়া যে আর কাউকে ভালো জানি না।

ক্ষোভ, দুঃখ, বেদনা, হতাশা এবং কখনও যদি সফল হই কাজে তার আনন্দ আমাকে লেখায় উদ্বুদ্ধ করে।

আগেই বলেছি আমি ছিন্নমূল, ঘরবাড়ি ছেড়ে আসার বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে বার বার ছিন্নভিন্ন হয়েছি, বার বার রক্তাক্ত হয়েছি। ধর্মান্ধতা মানুষে মানুষে যে বিষক্রিয়া ছড়ায় তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ না জানালে যে চলে না। আমার হাতিয়ার কোথায় প্রতিবাদ জানাবার। কলম ছাড়া আর কী সম্বল থাকতে পারে আমার! ধর্ম বড়ো নয়, মানুষই বড়ো, বার বার এই কথাগুলিই বলতে চেয়েছি। না লিখলে এই সব বোধের সঙ্গে যে মানুষকে জারিত করা যেত না। দেশ-ভাগের বেদনা কী ভয়ঙ্কর, তা যে শিকার হয়েছে সেই জানে। যে এই ধর্মান্ধতার শিকার হয়নি তার কাছে কে এই খবর পৌঁছে দেবে, ধর্ম বড়ো নয়, মানুষই বড়ো। মনুষ্যত্ব মানুষকে মহৎ করে তোলে — আমার সৃষ্ট চরিত্ররা বার বার সেই কথাই বলেছে, ঈশক সেখ, ফকির সাব, জাহাজের টিণ্ডাল সারেঙ সবাই। এমন কী জাহাজের কাপ্তান স্যালি হিগিলসও।

ভালোবাসলে মেঘ হয় বৃষ্টি হয়, ভালোবাসলে মানুষ আরোগ্য লাভ করে। লিখতে লিখতে বার বার তা উপলব্ধি করেছি। এই উপমহাদেশের সংকট থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার একমাত্র উপায় মানুষের প্রতি ভালোবাসা। ভালোবাসলে সব দ্বিধা দ্বন্দ্ব দূর হয়, ধর্ম সেখানে কোনোই বাধা সৃষ্টি করতে পারে না। লিখতে লিখতে তাও উপলব্ধি করেছি। না লিখলে এইসব বোধের আশ্চর্য লীলা অনুভবই করতে পারতাম না।

সুতরাং লিখি।

লিখে জীবনের সব ক্লেশ দূর করতে চাই।

এক স্বপ্নময় জগতে লিখতে লিখতে বিচরণ করতে পারি। এক জীবনে এত বড়ো পাওনাকে অস্বীকার করি কী করে। জীবন ফুরিয়ে যাচ্ছে টের পাই, এবং মৃত্যুর শীতল ঠাণ্ডা গহ্বরে প্রবেশ করার জন্য এগিয়ে যাচ্ছি। আমার জীবনের এই সব রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার কথা না লিখে রেখে গেলে, আমি বলতে যে অস্তিত্ব তাই লোপ পায় মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে। এ-জন্যও লিখি।

তবে মহাকাল বড়ো নিষ্ঠুর। ভেজা স্লেটের মতো তার পিঠে কোনও দাগই আঁকা যায় না। সুনিপুণ কারিগরের মতো সে অতি হালকাভাবে সব মুছে দেয়। সব বুঝি, তবুও লিখি।

আসলে মহাকালের প্রতিদ্বন্দ্বী নিজেকে ভাবতে ভালোবাসি। মানুষের ধর্মই যে এমন, সে মহাকালকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে বেঁচে থাকতে চায়। বেঁচে থাকতে চায় বলেই কাল কিংবা মহাকাল তাকে কিছুতেই হতাশ করতে পারে না।

মৃদুমন্দ বাতাস, কিংবা নারীর সুঘ্রাণ, ভালোবাসা, প্রেম, সবই তো অতি চমৎকার — মহাকাল যতই নিষ্ঠুর হোক, জানি সে সব গ্রাস করে নেয়, তবু কালের যাত্রা রূপক মাত্র সে আমাকে কিছুতেই ভাবতে দেয় না। আমি বিশ্বাস করি না, কালের যাত্রা রূপক মাত্র। আমি আছি বলেই সে আছে, আমি না থাকলে কালও নেই, মহাকালও নেই।

আমার এই চৈতন্যের কথা না লিখলে যে কখনোই আবিষ্কার করতে পারতাম না, কাল মহাকাল জীবনের কাছে অতি তুচ্ছ। জীবন আছে বলেই তার অস্তিত্ব, না থাকলে সেও শেষ।

তাই লিখি।

লিখতে লিখতে মরে যাবার বাসনা রাখি — যতই ছাইপাশ হোক, এই সৃষ্টিশীলতার মধ্যেই আমার বেঁচে থাকা। আমার জীবন। আমার প্রাণ। আমার অহঙ্কার।

কবিতা পড়ে শোনালে সব বন্ধুরা মুগ্ধ চোখে চেয়ে থাকত যেন সে এক স্বতন্ত্র প্রাণী। আমি একটু একটু ঈর্ষা বোধ করতাম। হঠাৎই একদিন মনে হল, কবিতা লেখা আর এমন কী শক্ত ব্যাপার, ইচ্ছে করলে আমিও তো পারি। লিখে ফেললাম কয়েকটা। আমি কবিতার ছন্দ বা মাত্রা গোনা কখনো শিখিনি, বই পড়েও না, কেউ নির্দেশও দেয়নি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ, নজরুলের প্রচুর কবিতা মুখস্থ ছিল, তার থেকেই ছন্দবোধ এসে গিয়েছিল। প্রতিযোগিতার মনোভাব মানুষের সহজাত, সেই আদিমকালের ট্রাইবাল সোসাইটি থেকেই চলে আসছে। অন্য কারুর সঙ্গে গান কিংবা বাগ্মিতার প্রতিযোগিতায় নামার কথা আমার মনে আসেনি, কিন্তু দীপক কবিতা লেখে বলেই আমি যে কবিতা লিখতে শুরু করলাম, তার কারণ আমার ভেতরে নিশ্চয়ই কবিতার বীজ ছিল।

আরও একটি সূত্র অবশ্যই উল্লেখযোগ্য। আমাদের সময়ে মেয়েদের সঙ্গে প্রেম করা তো দূরের কথা, মেলামেশার সুযোগই ছিল খুব কম। স্কুল ছাড়ার পরও আমাকে কো-এডুকেশন্যাল কলেজে পড়তে দেওয়া হয়নি। তবে, কোনো কোনো বন্ধুর বোনের সঙ্গে মধুর রসের বিনিময় চলত সূক্ষ্মভাবে। আমাদের একজন বন্ধুর বোনের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলাম আমরা অনেকে। সেই কিশোরীটির সাহিত্যপ্রীতি ছিল দারুণ, যে-কোনো প্রসঙ্গে সে রবীন্দ্রনাথের কবিতা বা গল্পের উদ্ধৃতি দিতে পারত। কবিতা যে বোঝে না বা ভালোবাসে না, তাকে সে ঠিক সভ্য মানুষ বলে গণ্য করত না। এইখানেই অন্য বন্ধুদের তুলনায় আমার জিত। দীপকের চেয়েও আমার অনেক বেশি মুখস্থ ছিল রবীন্দ্রনাথের কবিতা। এমনকী রবীন্দ্রনাথের দু'লাইনের সঙ্গে নিজে বানিয়ে আরও দু'লাইন জুড়ে দিতেও অসুবিধে হত না আমার। সেই মেয়েটির মনোরঞ্জনের জন্যই কবিতা ছাপাবার কথাও আমার মনে আসে। আমার প্রথম কবিতাটি ছাপা হল দেশ পত্রিকায় ১৯৫১ সালে, তখন আমি সদ্য ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়েছি।

এ সবই ছেলেখেলা। এরকম অনেকেই দু'চার বছর পদ্য লেখে, তারপর জীবনের অন্যান্য গুরুতর কাজে ব্যস্ত হয়ে যায়। আমার জীবনে কোনো গুরুতর কাজই করা হয়নি। জল যেমন জলকে টানে, সেই রকমই কলেজে এসে তৎকালীন সদ্য তরুণ কবিদের সঙ্গে আমার যোগাযোগ হয়ে যায়। তখনই আমার তুলনায় অন্য কয়েকজন বেশ খ্যাতিমান, কিন্তু লক্ষ করেছি, অন্য অনেকের চেয়েই বাংলা বই আমি পড়েছি অনেক বেশি। তারপর যখন 'কৃত্তিবাস' নামে কবিতার পত্রিকা বার করতে শুরু করি, তখন কেমন যেন একটা ভাঙনের নেশা পেয়ে

আমার ফিরে আসার পক্ষে কোনো যুক্তিই ছিল না। লাইব্রেরির চাকরি মানে হালকা কাজ এবং অনেক বই পড়ার সুযোগ। ইচ্ছে মতন নিজের লেখাও লিখতে পারতাম, ঐ এক বছরে লিখেছিও অনেক। 'আমি কী রকম ভাবে বেঁচে আছি' এই কাব্যগ্রন্থের অধিকাংশ কবিতাই আয়ওয়া-তে বসে লেখা।

বসেছিল। যেমন ভাবে বাংলায় কবিতা লেখা হয়ে আসছে, সেই ধারাটি ভাঙতে হবে, শব্দ বদলাতে হবে, জীবন-যাপনের সঙ্গে কবিতাকে মিশিয়ে দিতে হবে। এই রকমই মনে হত। বাংলা সাহিত্যে বিরাট কিছু ঘটাব, কিংবা লিখে-টিকে খ্যাতিমান হব, কিংবা সাহিত্যকে সমাজ পরিবর্তনের কাজে লাগাব, এসব কথাও মাথায় আসেনি। দেশ স্বাধীন হবার পরবর্তী স্বপ্নভঙ্গ ও ব্যর্থতা বোধ থেকে ভেতরে ভেতরে জমে উঠেছিল প্রবল রাগ ও বিরক্তি ও তাচ্ছিল্য, তারই প্রতিক্রিয়ায় যেন ভাঙনের ঝোঁক। যেন, আমরা অনেক কিছু ভেঙে যাব, পরবর্তীরা এসে আবার গড়বে।

একসঙ্গে যারা কৃত্তিবাসকে কেন্দ্র করে যাত্রা শুরু করেছিলাম, তাদের মধ্যে কেউ কেউ সরে পড়তে থাকে। যেমন দীপক, প্রচুর সম্ভাবনা সত্ত্বেও সে বেশিদিন কবিতা লেখেনি। সেই রকম আরও কয়েকজন। জীবিকার প্রয়োজনে কেউ কেউ দূরে চলে যায়। জীবিকা গ্রহণ ও বিয়ের পরেও হাতে সাহিত্যের কলম অবিচল থাকবে কিনা, সেটাই আসল পরীক্ষা।

আমি বিয়ে করিনি বটে, কিন্তু জীবিকার বোঝা বড়ো বেশি প্রবল ছিল। বাবা মারা গেছেন অকালে, ভাই-বোনরা ছোটো ছোটো, পুরো সংসার চালাবার দায়িত্ব আমার কাঁধে এসে পড়ে। আগে টিউশানির কষ্টার্জিত টাকায় 'কৃত্তিবাস'-এর খরচ চালাতাম। তখন সংসারের দায়িত্ব নিয়ে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত নানা রকমের কাজ করতে হত। সকালে একটা টিউশানি, দুপুরে সরকারি অফিসে কেরানিগিরি, বিকেলে আর একটা টিউশানি, সন্ধের পর একটি ছোটো সংবাদপত্র অফিসে কাজ। এই সমবেত উপার্জনেও পারিবারিক সচ্ছলতা আসেনি, তবু 'কৃত্তিবাস' পত্রিকা বন্ধ করিনি। কেন অত কষ্ট করেও চালিয়ে গেছি, তার উত্তর আমি নিজেই ভুলে গেছি।

কয়েক বছর পর আমার জীবনে একটি নাটকীয় ঘটনা ঘটে। আমেরিকার আয়ওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগ থেকে আমি আকস্মিকভাবে আমন্ত্রণ ও স্কলারশিপ পাই উনিশ শো তেষট্টি সালে। তখন আমার বয়েস উনত্রিশ। এই আমন্ত্রণ আমার পড়াশুনোর কৃতিত্বের জন্য নয়। ইংরেজি বিভাগের প্রধান পল এঙ্গেল একজন কবি। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ও ভাষার কবি ও গদ্য লেখকদের নিয়ে রাইটার্স ওয়ার্কশপ চালানো ছিল তাঁর শখ। আয়ওয়া রাজ্যটিতে অনেক বড়োলোক চাষা থাকে, তাঁদের কাছ থেকে দান আদায় করে পল এঙ্গেল এই ওয়ার্কশপ চালাতেন। কবি-লেখকদের নির্বাচন করার জন্য তিনি স্বয়ং সারা পৃথিবী ঘুরতেন, ভারতের বিভিন্ন শহরে গেছেন, কলকাতাতেও তিনি অনেকের সঙ্গে আলাপ করেছেন। যে-কোনো কারণেই হোক সে বছর তিনি ভারত থেকে একমাত্র নির্বাচন করেছিলেন আমাকে।

এই প্রস্তাব আমার কাছে হাতে স্বর্গ পাবার মতন। আমার দেশ ভ্রমণের তীব্র নেশা। মনে মনে প্রায়ই ভাবতাম, এই পৃথিবীতে জন্মেছি, পৃথিবীটাকে ভালো করে দেখে যাব না? কিন্তু নিজ ব্যয়ে বিদেশ যাওয়া তখন ছিল নিতান্তই অলীক কল্পনা। শুধু কবিতা লিখে অতদূরের কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে আমন্ত্রণ পাওয়াও ছিল খুবই অভিনব ব্যাপার। এখানকার অনেকে ভুরু কুঁচকে ছিল। অন্যান্য কবিদের বাদ দিয়ে কেন আমাকেই এ সুযোগ দেওয়া হল তা নিয়ে গাত্রদাহ হয়েছিল অনেকের। কিন্তু আমি কোনো আবেদন করিনি, এরকম কোনো সম্ভাবনার কথাও আগে আমার মনে আসেনি।

যাইহোক, সব চাকরি বাকরি ছেড়ে ছুড়ে আমি পাড়ি দিলাম বিদেশে। হিসেব করে দেখেছিলাম আমাকে যে স্কলারশিপ দেওয়া হবে, তার থেকে কিছু বাঁচাতে পারলেই সেই টাকা দেশে পাঠিয়ে দিলে তাতেই আমার মা-ভাই-বোনদের সংসার ঠিকঠাক চলে যাবে। ডলারের এমনই মহিমা! তখন ডলারের দাম ছিল চার টাকা আশি পয়সা। দুশো ডলার পাঠাতে পারলেই প্রায় ন'শো টাকা। সারাদিন অতগুলি কাজ করেও তখন আমার উপার্জন ছিল সাত-আটশো টাকা। তখন কেরানিদের মাইনে ছিল দুশো টাকারও কম।

আমেরিকায় যাওয়া মানেই মধ্যবর্তী অনেক দেশ দেখার সুযোগ। সে সুযোগের আমি পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহার করেছি, কিন্তু সে অন্য কাহিনী।

আয়ওয়া একটি ছোট্ট শহর, বিশ্ববিদ্যালয়-কেন্দ্রিক, ছবির মতন সুন্দর। সেখানে আমার চমৎকার দিন কাটছিল। পৃথিবীর নানান দেশের লেখক-লেখিকাদের সঙ্গে আলাপ ও তাদের সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত হয়ে সাম্প্রতিক বিশ্বসাহিত্য সম্পর্কে আমার কিছুটা ধারণা হয়ে যাচ্ছিল। বাংলা কবিতায় যাকে আমরা আধুনিকতা বলি, পৃথিবীর অন্যান্য প্রধান ভাষায় আধুনিকতা যে তার চেয়েও অনেকটা এগিয়ে, তা আগে জানতাম না। প্রতিদিনের মেলামেশা ও আড্ডা ছিল সাহিত্য বিষয়ে।

ব্যবহারিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যেরও কোনো ঘাটতি ছিল না। নিজস্ব অ্যাপার্টমেন্ট, টেলিফোন, রেফ্রিজারেটার, অতিশয় উৎকৃষ্ট সব খাদ্য বেশ সস্তা এবং ভেজালের প্রশ্ন নেই। টেলিফোন ও ফ্রিজের উল্লেখ করলাম এই কারণে যে দেশে আমাদের বাড়িতে ওসব ছিল না তো বটেই, সেই সময় ওসব শোভা পেত ধনী লোকদের বাড়িতে, মধ্যবিত্তদের ঘরে পৌঁছোয়নি। আর তখন বেবী ফুডেও ভেজাল দেওয়া হত।

একটা বছর কেটে গেল প্রায় চোখের নিমেষে। তারপর ফেরার প্রশ্ন।

রাইটার্স ওয়ার্কশপে যারা যোগ দিতে এসেছিল বিভিন্ন দেশ থেকে, তারা অনেকেই আর ফিরে যেতে চায়নি। চাকরি-বাকরি জোগাড় করে নিয়েছে। পল এঙ্গেলেরও তাতে কোনো আপত্তি ছিল না। সেই সময়কার আমেরিকা ছিল সত্যিকারের সচ্ছলতার দেশ, একটু পরিশ্রম করলে সুবর্ণ সম্ভাবনা। সেই ষাটের দশকের গোড়াতেই হাজার হাজার ভারতীয় তরুণ-তরুণী আমেরিকায় পাড়ি দেয়। ইমিগ্রেশানের পদ্ধতি ছিল অতি সরল, কানাডা তো দরজা খুলে দু'হাত বাড়িয়ে বিদেশিদের ডাকছিল।

আমার পক্ষেও আমেরিকায় স্থায়ীভাবে থেকে যাওয়া ছিল খুবই সহজ। পল এঙ্গেল আমাকে বিশেষ প্রীতি করতেন, তিনি খুব চাইছিলেন আমাকে রেখে দিতে। আমি কলকাতায় চাকরি ছেড়ে দিয়ে এসেছি। ফিরে গিয়ে আবার চাকরি পাব কিনা কিংবা কী করে জীবিকা নির্বাহ হবে, এ নিয়ে তিনি উদ্বিগ্ন ছিলেন। আমার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরিতে একটি মনোমতন চাকরিরও ব্যবস্থা করে ফেলেছিলেন তিনি।

বস্তুত, আমার ফিরে আসার পক্ষে কোনো যুক্তিই ছিল না। লাইব্রেরির চাকরি মানে হালকা কাজ এবং অনেক বই পড়ার সুযোগ। ইচ্ছে মতন নিজের লেখাও লিখতে পারতাম, ঐ এক বছরে লিখেছিও অনেক। 'আমি কী রকম ভাবে বেঁচে আছি' এই কাব্যগ্রন্থের অধিকাংশ কবিতাই আয়ওয়া-তে বসে লেখা। কলকাতার খরচ চালাবার জন্য চিন্তা করতে হবে না। ততদিনে

নারী সংসর্গের চেয়েও একটা কবিতার শেষ লাইনটি লিখে আমি বেশি তৃপ্তি পাই। আর সে লেখাগুলি বাংলায়। বাংলা ভাষার ধ্বনি-মাধুর্য আমার অন্তরে গেঁথে গেছে, আমি নতুন করে ইংরিজিতে লেখালেখি শুরু করতে পারব না।

আমার এক ফরাসি বান্ধবীও হয়েছে, সে একেবারে কবিতা-উন্মাদিনী। তার কাছ থেকে ফরাসি সাহিত্যের কিছু কিছু পাঠ নিয়েছি, সে আমাকে কিছুতেই ছাড়তে চায় না। কলকাতায় আমার কোনো প্রেমিকা ছিল না। কিছুটা পারিবারিক টান ছাড়া অন্য কোনো টান ছিল না।

তবু, কেমন যেন একটা অস্বস্তি বোধ করতাম। একলা থাকার মুহূর্তগুলিতে জানলার ধারে বসে দেখতে চাইতাম চোখে দেখার বাইরের কিছু। লাইব্রেরির চাকরিতে যোগদান করার জন্য পল এঙ্গেল পেড়াপিড়ি করছেন, একটা কিছু সিদ্ধান্ত নিতেই হবে। কিন্তু কার কাছে পরামর্শ চাইব? আমার ঘরে একটা দেওয়াল জোড়া আয়না ছিল। একদিন দুপুরে দাঁড়ালাম সেই আয়নার সামনে, সত্যের খাতিরে স্বীকার করা দরকার, তখন আমি সম্পূর্ণ উলঙ্গ ছিলাম। একটু আগে খিচুড়ি রান্না করেছি, ওটাই আমি ভালো পারতাম, স্নান সেরে খেতে বসার আগে নগ্ন শরীরে চলে এলাম আয়নার সামনে। শুধু মস্তিষ্ক বা হৃদয় নয়, পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত আমার যে শরীরী সত্তা, তার কাছে প্রশ্ন করলাম, তুমি কী চাও? এখানে তোমার কোনো কিছুর অভাব নেই, গরিবের ছেলে, এখানে তোমার ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা সুনিশ্চিত, এমনকী প্রেমও পেয়েছ, এই সব ছেড়ে কি দেশে ফিরে যেতে চাও? সেখানে জীবিকার জন্য উঞ্ছবৃত্তি করতে হবে, নতুন করে চাকরি খুঁজতে হবে, তাও পাবে কিনা সন্দেহ, কেরানির চাকরিটি পাবার আগে আমি অন্তত তিরিশটা জায়গায় ইন্টারভিউ দিয়ে ব্যর্থ হয়েছিলাম। আরও কত বাঙালির ছেলে তো এখানে থেকে যাচ্ছে, তারা দু'তিন বছর অন্তর অন্তর দেশে ফিরে মা-বাবাকে দেখে আসে, এখান থেকে বেশি টাকা পাঠানো যায়, তাতে বাড়ির লোক খুশিই হয়। তাহলে তোমার এমন দোনামোনা কেন?

আয়নার আমি উত্তর দেবার বদলে প্রশ্ন করেছিল, আগে বলো তো, তোমার সবচেয়ে কী বেশি ভালো লাগে? এখানকার খাবার-দাবার? আড্ডা? সুরাপান? নারীসঙ্গ? নাকি, তুমি যখন নিভৃতে কিছু লেখালেখি কর, সেই মুহূর্তগুলো? সেই সময় তোমার মুখখানি কেমন হয়ে যায়, তুমি জানো? সেই সময়কার রোমাঞ্চের সঙ্গে অন্য কিছুর তুলনা হয়?

বেশ কিছুক্ষণ আমি আয়নার প্রতিমূর্তির সঙ্গে তর্কবিতর্ক করেছিলাম। শেষ পর্যন্ত আমি অস্বীকার করতে পারিনি যে আমার কবিতা লেখার মুহূর্তগুলি সবথেকে ভালো লাগার মুহূর্ত। নারী সংসর্গের চেয়েও একটা কবিতার শেষ লাইনটি লিখে আমি বেশি তৃপ্তি পাই। আর সে লেখাগুলি বাংলায়। বাংলা ভাষার ধ্বনি-মাধুর্য আমার অন্তরে গেঁথে গেছে, আমি নতুন করে ইংরিজিতে লেখালেখি শুরু করতে পারব না।

সেই দুপুরটিতেই আমি প্রথম উপলব্ধি করি যে বাংলা ভাষায় কিছু লেখালেখি করাই আমার জীবনের প্রধান কাজ হবে। সার্থক লেখক হতে পারব কি পারব না তা জানি না। কিন্তু ভালো লাগাটাই তো জীবনে প্রধান! আর আগে আমি এ ব্যাপারে এত নিশ্চিত ছিলাম না। সত্যিকারের লেখক হবার মতন প্রতিভা আমার আছে কিনা জানি না, হয়তো কেউ পাত্তা দেবে না, প্রকাশক-সম্পাদকরা ছাপতে চাইবে না। তবু, গায়ক যেমন গান ছাড়া বাঁচতে পারে না, তেমনি আমিও বাংলা ভাষার শব্দ-মোহ-বন্ধনে জড়িয়ে গেছি, আমার আর মুক্তি নেই।

আর বাংলাতেই যদি লিখতে হয়, তাহলে সাহেবদের দেশে থাকার কোনো মানে হয় না। আমাকে ফিরে যেতে হবে বাংলা ভাষা-ভাষী মানুষদের মধ্যে, যেখানে এই জীবন্ত ভাষা মাঝে মাঝে একটু একটু করে সূক্ষ্মভাব বদলায়। সেই প্রবহমান ভাষার মধ্যে মিশিয়ে দিতে হবে নিজেকে।

সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে গেল, আমি অনেক শুভার্থী এবং অতি প্রিয় বান্ধবীর কাছ থেকে জোর করে নিজেকে ছাড়িয়ে ফিরে এলাম দেশে। ফেরার পর যা আশঙ্কা করেছিলাম তা-ই হল। পড়তে হল ঘোর বিপদে। আমেরিকাতে আমি টাকা জমাইনি। যা উদ্বৃত্ত ছিল তা দিয়ে ফেরার পথে যতগুলি দেশ সম্ভব ঘুরে এসেছি। দমদম এয়ারপোর্টে যখন পৌঁছোই তখন আমার পকেটে মাত্র দশ টাকা।

ফিরে এসে আমি বেকার ছিলাম টানা ছ' বছর। গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য গদ্য লেখা শুরু করতে হয়েছে পত্র-পত্রিকায়। বারবার নিজের নামে লেখা সম্পাদকরা ছাপবেন কেন, তাই

উদ্ভাবন করতে হয়েছে আরও তিনটি ছদ্মনাম, নীললোহিত, সনাতন পাঠক ও নীল উপাধ্যায়। অর্থাৎ চার হাতে গদ্য লিখেছি পাগলের মতন। সেই বেকার অবস্থাতেই স্বাতীর সঙ্গে পরিচয় এবং বিবাহ। অত গদ্য লেখার সুবাদেই দেশ পত্রিকার শারদীয় সংখ্যায় উপন্যাস লেখার আমন্ত্রণ। সাগরময় ঘোষ বোধহয় আমাকে নিয়ে একটা পরীক্ষা করতে চেয়েছিলেন। পরবর্তী বৎসরগুলিতে অন্যান্য সম্পাদকরাও উপন্যাস চাইতে লাগলেন, তখনও কিন্তু কবিতা ছাড়িনি, 'কৃত্তিবাস' পত্রিকা চালিয়ে গেছি, কবিতার বইও বেরিয়েছে, কিন্তু পরের পর উপন্যাসে কবিতার বই যেন চাপা পড়ে যায়। কয়েক বছর বাদে টের পেলাম, আমি পুরোপুরি লেখক হয়ে গেছি। আজীবন লিখে যাওয়াই আমার নিয়তি।

এরপর আর 'কেন লিখি', এ প্রশ্নের উত্তর অবান্তর হয়ে যায়।

কেন লিখি?

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়
(১৯৩৫)

কেন যে লিখি তার জবাবদিহি করতে বসলে অনেক কথা। লেখক টেখক হবো বলে তেমন কিছু ভাবিনি তো ছেলেবেলায়। তখন কত কী হওয়ার ইচ্ছে হত। ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, ভবঘুরে, খেলোয়াড়। তবে আমার পরিবারটি পড়ুয়া। আমারও ছেলেবেলা থেকে বই পড়ার নেশা ছিল। বঙ্কিমের লেখা পড়েই লেখালেখির ইচ্ছে হত মাঝে মাঝে। গোপনে গোপনে তাই কিছু কিছু গদ্য বা পদ্য লিখে রাখতাম খাতায়। তা সে ওরকম অনেকেই লেখে। সাহিত্যিক-কবি হওয়ার জন্য নয়, এমনিই খেয়ালখুশির লেখা।

তারপর লেখালেখি একেবারেই বন্ধ হয়ে যায়। তখন বি.এ. পড়ি, হোস্টেলে থাকি, ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণ অনিশ্চিত। তিন চার বছর লেখালেখি করার কথা ভাবিওনি তখন। যখন এম.এ. পড়ি তখন তৎকালীন এক বন্ধুর লেখা মাঝেমধ্যে 'দেশ' পত্রিকায় বেরোয় বলে একটু উজ্জীবিত হয়ে ফের লিখতে উৎসাহ পাই। কিন্তু তেমন সুবিধে হচ্ছিল না, ধরেই নিয়েছিলাম কোনও স্কুল বা খুব বেশি হলে কোন কলেজে শিক্ষকতার একটা চাকরি হয়তো জুটবে। তার বেশি স্বপ্ন না দেখাই ভাল। আমি যে একটু আধটু লিখতে পারি, সেটাই তখন বিশ্বাস হচ্ছিল না, আত্মবিশ্বাস বড্ড মার খেয়ে গিয়েছিল। নিজেকে

লেখকের বুকে কী থাকে তা লেখকই শুধু জানেন— কোনো কোনো মুহূর্তে লেখক তাঁর পাঠক-পাঠিকার সঙ্গে সেই নির্জন দীঘিতে অবগাহন স্নানে পরম আনন্দ পান।

বড্ড 'হেরো মানুষ' মনে হত।

কিন্তু ওই দুঃসময়েই হঠাৎ 'দেশ' পত্রিকায় জমা দেওয়া একটা গল্প প্রকাশিত হয়ে গেল। সেটা চমক এবং উদ্ভাস। তার পর থেকে আমাকে আর লেখা প্রকাশের জন্য আয়াস করতে হয়নি। 'দেশ' কর্তৃপক্ষ যেন আমাকে কোলে তুলে নিলেন।

আমি বলতে চাই যে, হ্যাঁ, আত্মপ্রকাশের একটা তাগিদ তো ছিলই, ছিল আমার কথা সকলকে জানানোর জন্মগত মানবিক ইচ্ছা। অর্থ বা যশের কথা তেমন ভাবিনি, শুধু জগতের সঙ্গে একটা সংযোগের সূত্র খুঁজেছি। লেখা আমার বাড়িয়ে দেওয়ার হাত, তাতে স্পর্শের ক্ষুধা।

কেন লিখি?

বুদ্ধদেব গুহ
(১৯৩৬)

এক কথাতে বলতে হলে বলতে হয়, না-লিখে পারি না তাই।

শিকারীদের সম্বন্ধে একটি কথা আছে, "A Person who has been bitten by the hunting bug"- লেখক সম্বন্ধেও বলা চলে A Person who is bitten by the writing bug. এই নেশার থাপ্পড় খাওয়ার পরে লিখতেই হয়, না-লিখে পারা যায় না।

নিজের মনের দুখ, সুখ এবং নানারকমের অনুভূতি প্রকাশ করার তাগিদ থেকেই শুধু আমিই নই, অন্য অনেকেই লেখালেখি করে থাকেন বলেই আমার বিশ্বাস।

কিছু লেখা থাকে, পাঠকপাঠিকাদের নিজের ভিতরে জমে থাকা নানা বোধ, অনুভূতি এবং অভিঘাতও তাঁদের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়ার তাগিদ থেকে লেখা হয়। কিছু লেখা থাকে যা না লিখলে নিজের মনের ভার লাঘব হয় না। তাই কেন লিখি? তা এক কথায় বলা ভারী কঠিন, হয়ত অনেক কথাতেও তা বলে ওঠা যায় না।

লেখকমাত্রই জানেন যে, লিখি কারণ লেখা লেখককে শুদ্ধ করে, ঋদ্ধ করে এবং তার ভিতরে যে অফুরান কথার ভাণ্ডার জমে থাকে এবং ক্রমশ তার ভার বাড়তে থাকে, তাকে মনের আগল খুলে কোনো নাম-না-জানা পাখির মতো মুক্ত করে দেওয়া।

লেখা একধরনের অবগাহন স্নান। নতুন ও পুরনো গাছেদের ঝরা-পাতা জমে থাকে মনের সেই ছায়াচ্ছন্ন দীঘিতে— এবং সেই দীঘিতে অবগাহন স্নান করতে করতে নানা ঢেউ-এর বৃত্তকে ক্রমশ বাড়াতে থাকার মজার মধ্যেই লেখালেখির সবটুকু মজা অথবা দুঃখ মিলেমিশে থাকে।

লেখকের বুকে কী থাকে তা লেখকই শুধু জানেন— কোনো কোনো মুহূর্তে লেখক তাঁর পাঠক-পাঠিকার সঙ্গে সেই নির্জন দীঘিতে অবগাহন স্নানে পরম আনন্দ পান। নির্জন দুপুরে দীঘির চারপাশ থেকে নানা পাখি ডাকে, ঝরা পাতারা উড়ে উড়ে এসে জমে পাড়ে এবং লেখক সেই প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে— প্রক্রিয়া শুধু নয়, বিক্রিয়াও অবশ্যই, নিজেকে পাঠক-পাঠিকার হৃদয়ের কাছে আনেন।

একজন লেখকের পাঠক-পাঠিকা ছাড়া আর কেউই ত বিশেষ থাকেন না, নিজেকে পুনরায় নির্মাণের জন্যে এবং ভাঙবার জন্যেও।

এ বড় গভীর অনুভূতির কথা। এ অনুভূতি বাইরের দশজনের সঙ্গে ভাগ করার নয়।

কেন লিখি?

পবিত্র সরকার
(১৯৩৭)

স্বাভাবিক স্বাস্থ্যের মানুষকে কেউ কি জিজ্ঞেস করে 'কেন কথা বল?' বিজ্ঞানীরা বলেন মানুষের মধ্যে এমন একটা 'জিন' আছে যা অন্য প্রাণীদের মধ্যে নেই, যার নাম ফক্স পি টু (Fox P2), যার ফলে মানুষ কথা বলতে পারে, অন্য প্রাণী পারে না।

জানি না, যারা লেখে, কবিতা হোক, গল্প হোক, প্রবন্ধ হোক বা অন্য হাজারটা জিনিস

হোক, কিংবা যারা ছবি আঁকে, গান গায় এবং আরও এ ধরনের নানা অকম্মো করে, তাদের মধ্যেও এরকম একটা বিশেষ 'জিন'-এর ব্যাপার আছে কি না। নিশ্চয় আছে।

ফলে এ রকম একটা নিয়তিবাদী উত্তর দেওয়াই যেত যে, আমার মধ্যে লেখার বিশেষ 'জিন' ঢুকে গিয়েছিল জন্মের মুহূর্তে, জানি না বাবা না মা কার কাছ থেকে, (দু-জনেই তো ২৩ বা ২৩ করে মোট ৪৬টা জিন দিয়েছেন আমাকে), তাই আমি লিখি। এ হল একটা ছদ্ম-বৈজ্ঞানিক উত্তর, কিছুটা চালিয়াতের উত্তরও বলতে পারেন। আমার শরীরের জিন-গ্রন্থনা যে ডাক্তার ভাঙতে পারবেন, তিনি আমার চেয়ে অনেক সমর্থ ও সংগত উত্তর দিতে পারবেন।

কিন্তু 'কেন' কথাটার তো আরও অনেক মানে আছে। সম্পাদকেরা নিশ্চয় এই ভাসা-ভাসা এবং চতুর জৈবিক ব্যাখ্যার চেয়ে আরও বেশি চান। তাঁরা নিশ্চয়ই জানতে চান যে আমার লেখার উদ্দেশ্য কী? লিখে আমি কী করতে চাই — উপকার হোক, অপকার হোক, নিজের হোক, অন্যের হোক। অন্যের কথা তো এসেই যায়, কারণ এক হাতে যেমন তালি বাজে না, তেমনি শুধু নিজের জন্যে তো লেখা যায় না। কেউ বা অনেকে পড়বে এই অল্পবিস্তর দুরাশা নিয়েই তো লিখতে হয়।

আমি এমন একটা বিতিকিচ্ছিরি লোক যে, আমি নানারকম লেখা লিখি। নাটক, ভাষাবিজ্ঞান, সমালোচনাতত্ত্ব ইত্যাদি নিয়ে গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ লিখি, ভ্রমণকাহিনি লিখি, রম্যরচনা লিখি — রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক উভয় বিষয় নিয়েই, ছোটোদের ছড়া (অজস্র), গল্প (মোটামুটি), ব্যাকরণ ও ইংরেজি শেখার বই, ছোটোদের গোয়েন্দা উপন্যাস (একটি), বড়োদের রোমান্টিক উপন্যাস (একটি), কিছু সরস অণু ও লঘু গল্প, প্রচুর নাটক ও গ্রন্থ সমালোচনা (এক সময় লিখেছি), ব্যক্তিত্ব, ছন্দ — লেখার বিষয় কী নয় আমার। কয়েকটি সরকারি কমিটির রিপোর্টও লিখেছি নানা রাজ্যের হয়ে। এখন আমার আত্মজীবনী 'অল্প পুঁজির জীবন' বেরোচ্ছে নন্দন পত্রিকায়, আর, আর কিছু নয়, একেবারে 'মৃত্যু' সম্বন্ধে মজা করে একটা বই লেখা হয়ে গেছে।

বলা বাহুল্য, পাঠকেরা জানেন, এর বেশ কিছু অন্যের উপরোধে ঢেঁকি গেলা। ঢেঁকি গিলতে অসুবিধে নেই, সেটাকে দেশের কাজ বলে মনে করেছি, সাধ্যমতো নিষ্ঠা ও সততা নিয়ে কাজগুলো তুলে দেবার চেষ্টা করেছি। সেগুলো সম্বন্ধে তার বেশি বলার নেই।

প্রবন্ধ, পাঠ্যবই লেখার তাগিদ আবার অন্য ছিল। অধ্যাপকের দেখনধারী জীবিকায় ঢুকে পড়বার রাস্তা পেয়ে গেছে একটা অজ পাড়াগাঁয়ের ছেলে, তাকে তো প্রমাণ করতে

নিজের ইচ্ছেয় বা খেয়ালে অনেক কিছু লিখি, কারণ না লিখে পারি না। এই সব অনিবার্য লেখাকে আমার পাঠকদের কাছে এক অনন্ত ও ক্লান্তিকর প্রেমপত্র হিসেবে লিখে যাই।

হবে যে, সে এই জীবিকাটার যোগ্য ছিল, বা সব সময়েই যোগ্য থাকার চেষ্টা করবে। আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়-ব্যবস্থায় একটা কথা চলে, Publish or perish, অর্থাৎ 'লেখো আর ছাপিয়ে চলো বাপধনেরা, নইলে বিশ্ববিদ্যালয়ে পাকা চাকরি হবে না।' আমাদের দেশের ব্যবস্থা অবশ্য অত নিষ্ঠুর নয়, ক্লাসে না এসে, না পড়িয়ে, না লিখে, না ছাপিয়ে দিব্যি চাকরিতে পর পর উন্নতি করা যায়। শুধু কষ্টেসৃষ্টে বেঁচে থাকলেই হল। সবাই না হলেও কিছু কিছু সূক্ষ্মদর্শী লোক সেই বিকল্প গ্রহণ করেন।

আমি যে আবোল-তাবোল নানা লেখা লিখে ছাপিয়ে চলেছি, তার মধ্যে 'সার্থক' ('অর্থপূর্ণ') বিবেচনা নিশ্চয় কিছু আছে, মাইনের বাইরে যদি 'টু-পাইস' হয় তা হলে ছাপোষা গেরস্থের কিছুটা সাশ্রয় হয়, কন্যাদায় সহজে মেটে, আর ক্বচিৎ-কখনও গিন্নির মুখেও হাসি ফোটানো সম্ভব হয়। কিন্তু সেটা বড়ো কথা নয়। বেশির ভাগ লেখার জন্যে আমার পকেটে যে কিছু আসে তা বুক বাজিয়ে বলা যাবে না।

তবু নিজের ইচ্ছেয় বা খেয়ালে অনেক কিছু লিখি, কারণ না লিখে পারি না। এই সব অনিবার্য লেখাকে আমার পাঠকদের কাছে এক অনন্ত ও ক্লান্তিকর প্রেমপত্র হিসেবে লিখে যাই। যে পাঠকের মধ্যে বৃদ্ধবৃদ্ধা আছেন, যুবক-যুবতী আছেন (আশা করি), ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েরা আছে, তাদের সবাইকে একসঙ্গে অ্যাবস্ট্রাক্ট করে এ রকম পাঠক-নারী হিসেবে কল্পনা করার মধ্যে একটা পুরুষ-মহিমা নিক্ষেপের ব্যাপার আছে, তার জন্যে সকলের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। কিন্তু সকলের কাছেই আমি কিছু বলতে চাই, তাই এই প্রেমপত্রের উপমা। সে প্রেমপত্র কেউ পড়বেন কি না, পড়ে ভালোমন্দ কিছু ভাববেন কি না, আমার নাম দেখেই ফেলে দেবেন কি না, তা নিয়ে আমার কোনো মাথাব্যথা নেই। তবু যখন কোনো কোনো পাঠক বা পাঠিকা টেলিফোনে বা সাক্ষাতে বা চিঠিতে জানান যে অমুক লেখা ভালো লেগেছে, তখন ভাবি, 'এই তো, এঁর জন্যেই তো লিখেছি।' তাঁর বয়স আশি হোক, আঠারো হোক, আট হোক, তাঁর জন্যেই আমার ভালোবাসার ভাষার নকশা করে চলি।

জানি না, আমার ব্যাকরণের লেখাকেও প্রেমপত্র বলা যাবে কিনা। আমার দাবি, যাবে। আমার ভাষার জন্যে ওই প্রেমপত্র। তার গুণ বা দোষের কথা আলাদা। প্রেমপত্রের একটা সুবিধে হল, যে কোনো কাগজের মতোই তা যত্নের সঙ্গে রক্ষা করা যায়, আবার বাজে কাগজের ঝুড়িতে অনায়াসে ফেলেও দেওয়া যায়।

কেন যে লিখি ছাইপাশ!

সুবোধ সরকার
(১৯৫৭)

আমি তখন কৃষ্ণনগরে থাকি। আমার পাঁচ বন্ধু সাইকেল সমেত ১ নম্বর প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে বিকেলবেলা আড্ডা দিতাম। ভাঁড়ে চা। ওটাই ছিল আমাদের সিসিডি। সেদিন আমাদের পেছন দিকে একটা ভবঘুরে দাঁড়িয়ে ছিল। তাকে দেখে হোলটাইমার ভিখিরি মনে হয়নি।

শেয়ালদার দিক থেকে কৃষ্ণনগর লোকাল ঢুকছিল ১ নম্বর প্ল্যাটফর্মে। ইঞ্জিনের সামনে লোকটা ঝাঁপিয়ে পড়ল। গেল গেল চীৎকার। ট্রেন চলে গেল এবং প্ল্যাটফর্মে দাঁড়াল। আমি দুটো কমপার্টমেন্টের মাঝখান দিয়ে দেখতে পেলাম, লোকটা ২ নম্বর প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে একটা পাউরুটির ঠোঙা মুখের কাছে ধরে অদ্ভুত একটা হাসি নিয়ে ওপার থেকে সেও আমাকে দেখছে। ভাবটা হল এই যে কেমন দিলাম?

আমি এর আগে জীবনে কোন কবিতা লেখার চেষ্টা করিনি। তার পরের দিন অপকীর্তিটা করলাম। আমার প্রথম কবিতা লিখলাম যেটা লেখার পর হারিয়ে গেছে। হারিয়ে গেছে কথাটা বলা ঠিক হল না। কবিতা লেখার নামে গত তিরিশ বছর আমি একটা সেমিকোলন কাঁধে নিয়ে এক দিগন্ত থেকে আর এক দিগন্তে ছুটে চলেছি। ওই সেমিকোলনটাই হল লোকটার হাসি। দারিদ্র্যরেখার নীচে যার বাসভূমি। যে হাসিটার মূল্য নিউক্লিয়ার বোমার চাইতেও বেশি। কবিতা দিয়ে আর কতটুকু মোছানো যায় সেই হাসি।

তখন আমি স্কুলের ছাত্র। সেদিন যে

সেমিকোলনের জন্য জীবনের প্রথম কবিতাটা লিখতে বাধ্য হয়েছিলাম, আজও, তিরিশ বছর বাদে, একই সেমিকোলনের জন্য কবিতা লিখে চলেছি। আমার কাছে কবিতা কোন পরাবাস্তবতা নয়। ঘোর বাস্তব। কবিতা আমার নিজের বেঁচে থাকাটাকে নিয়ে ঠাট্টা করে, কৌতুক করে, আহা উহু করে।

কবিতাকে আমার পেটের শত্রু মনে হয়। তাকে না পারি ফেলতে না পারি গিলতে। আমার যেহেতু ন্যাকামি করতে ভাল লাগে না, অবচেতনের বল গড়িয়ে দিতে ভাল লাগে না, তবু আমি কঠোর বাস্তবের মধ্যে দাঁড়িয়ে, শোক ও সন্তাপের ভেতর দাঁড়িয়ে আমি দেখতে পাই — গহন অরণ্যে আমি তাড়া করে চলেছি একটি মেয়েকে, তার একহাতে ফুকো, অন্যহাতে দেরিদা, আর তার দুপায়ের ফাঁকে সোনার মেডেল, যা সে আচার্যের হাত থেকে পেয়েছে — আমি তাকে চুম্বন করব বলে ছুটছি, সেও ছুটছে আর হাসছে — সে একটি নদী পার হয়ে গেল — আমি অবাক হয়ে দেখলাম নদীর ওপারে সে হয়ে গেল একটা হরিণ।

তবু আমি বলব আমি সেই সেমিকোলনের জন্য কবিতা লিখে চলেছি যেটার ওজন একটা কুঠারের চাইতে অনেক অনেক বেশি।

লিখলে আকাশ নেমে আসে

অনিল ঘড়াই
(১৯৫৭)

ফসল ফলাতে গেলে মাটি তৈরির প্রয়োজন হয়, মাটি ফসলের উপযুক্ত না হলে বীজ নষ্ট হতে বাধ্য। 'প্যারাবোলা অফ এ সামারিটন'-এ মৃত্তিকা, কৃষক এবং বীজের উল্লেখ আছে যে রূপকের মাধ্যমে যিশু খ্রিস্ট গল্পের মাধ্যমে তাঁর শিষ্যদের বুঝিয়েছেন। বীজ পাথরে পড়লে সেখানে অঙ্কুরোদ্গম হয় না, সেই বীজ মাটিতে পড়লে তা থেকে অঙ্কুর বেরয় এবং উপযুক্ত পরিবেশ এবং জল-হাওয়ায় তা বড় হয়ে ওঠে। লেখক জীবনেরও এরকম অনেক গল্প থাকে যা একজন সাধারণ মানুষকে লেখক হয়ে উঠতে সাহায্য করে। পক্ষিদম্পতি যেমন তার বাচ্চাকে উড়তে শেখায় তেমনি লেখক হয়ে উঠবার জন্য আমাদের সমাজে এমন কোনো মানুষ বা প্রতিষ্ঠান নজরে পড়ে না যেখানে ভর্তি হলে ময়রা দোকানের ছাঁচের সন্দেশ-এর মতো লেখক বা কবি হয়ে শো-

লেখার তাগিদ
আমার ভেতর কে জন্ম দেয়,
আমি তো উজানে
ডিম ছাড়তে আসা
সংসারী ইলিশ নই যে
হাজার হাজার ডিম ছেড়ে
আবার মূলস্রোতে মিশে যাব?

কেসের শোভা বৃদ্ধি করবে। লেখক হয়ে ওঠা এক সহজাত প্রবৃত্তি — এই প্রবৃত্তিকে আমার কথায় বলা যেতে পারে তার জন্মগত এক বিশেষ ক্ষমতা যে অন্তর্গত ক্ষমতা বলে তেঁতুল টক হয়, আখ মিষ্টি হয় আর নিমপাতা হয় তেতো। এই সহজাত প্রবৃত্তি হয়ত সব মানুষের মধ্যে বিদ্যমান কিন্তু অনেকে তা ধরে রাখতে পারেন, আবার অনেকে ফুল ঝরার মতো অকালেই ঝরে যান।

তর্কের মধ্যে না গিয়ে সরাসরি 'কেন লিখি'র প্রসঙ্গে এলে তা অবশ্যই ভাববার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। লেখালেখি অনেকটাই সহজাত — একথা অনেককেই বলতে শুনেছি। যদি সহজাত হবে তাহলে সেটাই কি প্রতিভা? লেখার তাগিদ আমার ভেতর কে জন্ম দেয়, আমি তো উজানে ডিম ছাড়তে আসা সংসারী ইলিশ নই যে হাজার হাজার ডিম ছেড়ে আবার মূলস্রোতে মিশে যাব? তা যদি না হই তাহলে এই অজস্র শব্দের জন্ম কে দেয়, কে তার মাতা-পিতা? একথা ঠিক যে প্রতিটি মানুষের মধ্যে আবেগের তারতম্য ঘটে, কেন না বেহালায় যে সুর তা গিটারের তারে পাওয়া যায় না। তাই প্রতিটি লেখকের মাটি এবং সার জল আলাদা। মাটিতে পা দিলেই একজন সৃষ্টিশীল মানুষ বৃক্ষ হয়ে ওঠেন, বুকের ভেতর পরিশুদ্ধ আবেগ নিয়ে ছুটে যান। এই দীর্ঘযাত্রায় নদীর গতি স্তব্ধ হলে সেটা দুর্ভাগ্যের।

'কেন লিখি'র তাগিদটা হামেশা তাড়া করে বেড়ায়। এমন অনেক প্রশ্ন আছে যার উত্তর এক বাক্যে দেওয়া যায় না, আর দেওয়া গেলেও তা শোভন নয়। নদীকে ভালোবাসি বলেই বর্ষাকাল আমার প্রিয় হবে এমন নয়। বর্ষা যেমন আছে তেমনি খরা-বসন্ত থাকবেই। 'লেখা' যখন আছে তখন না লেখার যন্ত্রণাও থাকবে। আর এই যন্ত্রণা যখন দগ্ধ হতে হতে একেবারে শেষ সীমায় পৌঁছায়, যখন শরীরে আর একটি পেরেকও পোঁতার জায়গা থাকে না, তখন এই মন ফুলতোলা রুমালের মত নিজের ভেতরটাকে মেলে ধরে, মৌমাছির মত শব্দরা গুনগুনিয়ে ছুটে আসে, সাদা কাগজে আলপনা এঁকে তারা জুড়াতে চায় মনের জ্বালা। দহনেও আনন্দ থাকে। আর সেই আনন্দ থেকে লেখা, আরেক জন্ম..পুনর্জন্ম। প্রতিটি লেখায় লেখক নতুন জীবন লাভ করে। সৃষ্টির একটা পাতাই সমস্ত পৃথিবী ঢেকে দিতে পারে। সুরভিত করতে পারে। সৃষ্টির যা শক্তি সে শক্তি আর কারোর নেই।

কেন লিখির যে যন্ত্রণা — সে যন্ত্রণা সমুদ্র হয়। কখনও বিষাক্ত সাপ লুকিয়ে থাকে ফেনার ভেতর, কখনও ঝাউবনে সমুদ্র কাছিমের ডিম খেয়ে আসে বুনো ভোঁদড়। এসব কষ্ট সৃষ্টির কাছে চিরকালীন হতে পারে না। কালো আকাশ দেখলে মন খারাপ হয় আবার আনন্দ হয়। কখনও কালো মেঘ বিষাদের ছায়া, কখনও তা শীতল বারিধারা, সৃষ্টির উৎসাহ। এই দোলাচলের ভেতর সৃষ্টিকর্তার ঘোরাফেরা।

কেন লিখি?

না লিখে মুক্তি নেই বলে।

এরকম অনেক কথাই বলা যায়। যা বলা যায় তা কি সবসময় বুকের ভেতর থেকে উঠে আসে? কেলেঘাইয়ের সব ঢেউয়ের মাথায় কি চকচক করে রোদ? সব ঢেউ কি ভেঙে তছনছ হয়? সব ঢেউয়ের কি ক্ষমতা থাকে গর্ভসঞ্চারের? লেখালেখির ভাবনাটাই একটা টনিক। পথ্য।

যদি প্রশ্ন করেন — কেন?

আমি বলি — লিখলে মন ভালো থাকে। একমাত্র লেখালেখিই পারে মনের পাথরটাকে তর্জনী দিয়ে সরিয়ে দিতে। লেখালেখিই পারে একটা মানুষকে প্রকৃত শিক্ষিত করে তুলতে। যাঁরা লেখেন তাঁদের মনটাকে ড্রেসিং টেবিলের আয়নার মত দেখা যায়। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সবাই চায় নিজেকে দেখতে। আমরা যে প্রতিবিম্ব দেখি তা অনেকসময় স্মরণে থাকে না। সুখের দিনে আমাদের স্মৃতি কলাপাতার চেয়েও পাতলা, সামান্য বাতাসে তা ছিঁড়ে যায়।

আমার মনে হাজার ফাটল। তাকে ভরাট করার জন্য আমি কলম ধরি। একাকীত্বের বাগানটা পেরনোর জন্য কলম ধরি। আমার শব্দগুলো প্রজাপতির মত উড়ুক, আগুনের মত জ্বলিয়ে পুড়িয়ে খাক করে দিক অপবিত্রতা, আমাদের ভিতরের বিদ্বেষ এবং ঘৃণাকে।

আমি লিখি আমার কথা বলব বলে কেন না কেউ নেই যে আমার হয়ে কথা বলবে, ভালোবাসবে যেমন মা ভালোবাসে...। আমার স্বার্থপরতাকে আমি মারতে চাই — সেইজন্য আমি লিখি। আমি লিখি — আমার শব্দ যেন আমাকে গান শোনায়, আদর করে ঘুম পাড়ায়, মাথায় হাত বুলিয়ে দেয় সেইজন্য... আমি লিখি... লিখলে আকাশ নেমে আসে।

(বানান অপরিবর্তিত)

মহাজনসঙ্গ

অমিতাভ চৌধুরি

। পর্ব ১৩।

নীহাররঞ্জন রায়

তাঁর ‘বাঙালীর ইতিহাস’ পড়ে যদুনাথ সরকার বলেছিলেন— ‘মহাগ্রন্থ’।

এমন সুভদ্র সুবেশ ভদ্রলোক সচরাচর দেখা যায় না। তিনি ডঃ নীহাররঞ্জন রায়। ধুতি পাঞ্জাবি গলায় চাদর কিংবা কোট-প্যান্ট-টাই সুশোভিত ভদ্রলোক কোটিতে গুটিক। তাঁকে প্রথম দেখি ১৯৪৪ সালে। শান্তিনিকেতনে। তাঁর অকাল প্রয়াত ছোট বোন লীনা রায় তখন ওখানে সঙ্গীত ভবনে শিক্ষার্থী ছিলেন। নীহাররঞ্জন রায় মশাই আমার পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। আমি তাঁর সুশোভিত চেহারা দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম। ইতিমধ্যে পড়া হয়ে গিয়েছিল তাঁর লেখা দুই খণ্ডের ‘রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা।’ পড়ে ভালো লেগেছিল। সেদিনই তাঁকে বলেছিলাম সে কথাটা। শুনে তিনি খুশি হয়েছিলেন।

তারপর তাঁকে দেখতাম আটচল্লিশ-উনপঞ্চাশ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে। তখন তিনি বাগীশ্বরী অধ্যাপক। গাড়িতে আসতেন, যেতেন। দূর থেকে আমরা ছাত্ররা গাড়ির দিকে তাকিয়ে

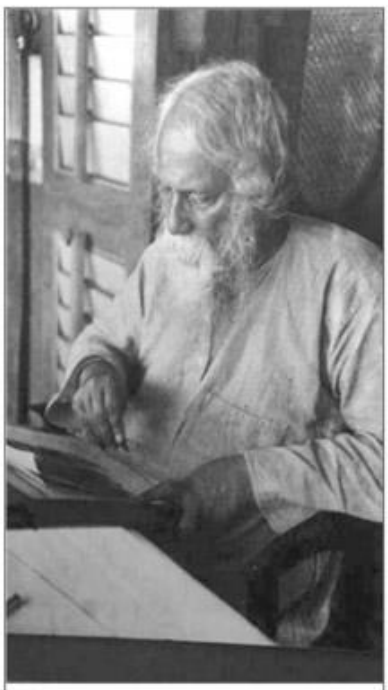

ছবি আঁকায় মগ্ন রবীন্দ্রনাথ

বলতাম— 'ওই যাচ্ছেন নীহার রায়।' তখন তার স্বপক্ষে এবং বিপক্ষে কত সমালোচনা। এমনকি এক ভদ্রমহিলার লেখা কিছু চিঠিও ছাপা হল একটি কাগজে। নীহারবাবু ছিলেন নিরুত্তাপ। তিনি ওইসব চিঠি ছাপাকে কোনও গুরুত্বই দেননি।

রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে তাঁর অনেক বক্তৃতা আমি শুনেছি। সবচেয়ে ভালো লেগেছিল ১৯৫৬ সালে রবীন্দ্রভারতী হলে পুরো দেড়ঘণ্টা বক্তৃতা। যেন ছাপা ভাষণ পড়ছেন। একটিও অনবধান শব্দ নেই। চমৎকার বাংলায় তিনি মানবতাবাদী কবি সম্পর্কে তাঁর মনের কথা ব্যক্ত করেছিলেন। বক্তৃতায় বা লেখায় তিনি ছিলেন সব্যসাচীসম। ইংরিজি বা বাংলা— দুটো ভাষাতেই ছিল সমান দখল। নিজে ইতিহাসের ছাত্র। সবসময় দেখতে পেতেন সাহিত্যের পিছনে ইতিহাসের দ্যোতনা। পরে তিনি যান রেঙ্গুনে। সেখানে ছিলেন ব্রহ্ম সরকারের সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা। মৌর্য ও শুঙ্গ যুগের শিল্পকলা নিয়ে তাঁর কাজ অসাধারণ। 'অ্যান ইনট্রোডাকশন টু দ্য স্টাডি অব থেরাবাদ বুড্ডিজম ইন বর্মা' এবং 'ব্রাহ্মনিক্যাল গডস অব বর্মা'— তাঁর দুটি বিখ্যাত বই। তবে আমাদের মনে চিরস্থায়ী ধরে আছে তাঁর বাংলায় লেখা অতুলনীয় বই— 'বাঙালীর ইতিহাস'। দ্বিতীয় খণ্ড কেন লিখছেন না, তাঁকে একদিন জিজ্ঞেস করাতে তিনি বললেন, 'আমি ফারসি ভালো জানি না। তা না জেনে সে সময়ের কোনও ইতিহাস লেখা সম্ভব নয়। অন্য কেউ লিখলে আমি খুশি হব।' তাঁর 'বাঙালীর ইতিহাস' পড়ে যদুনাথ সরকার বলেছিলেন— 'মহাগ্রন্থ'।

এই বই পড়েই জেনেছিলাম পূর্ববঙ্গের 'মেঘনা' নদী এসেছে পর্তুগিজ 'ম্যাগনাম' শব্দ থেকে। এই বই লিখেই রবীন্দ্র পুরস্কার পান তিনি। অকাদেমি পুরস্কার পান 'অ্যান আর্টিস্ট ইন লাইফ'— রবীন্দ্রবিষয়ক এই বইটির জন্য।

তাঁর 'অ্যান আর্টিস্ট ইন লাইফ'-এর এক জায়গায় আছে, রবীন্দ্রনাথ ছবি আঁকা শুরু করেন শেষজীবনে। আগে এ বিষয়ে তাঁর কোনও প্রকার অভিজ্ঞতা ছিল না।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাগীশ্বরী অধ্যাপক ছিলেন নীহাররঞ্জন

১৯৬৯ সালে ছিলেন সিমলা শহরে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউটের চেয়ারম্যান, রাজ্যসভার এবং বেতন কমিশনের সদস্য। প্রথম দিকে ছিলেন বিশেষ অনুশীলন সমিতির সদস্য। সেই সমিতিই হয়ে যায় আর এস পি। তাঁদের মুখপত্র 'ক্রান্তি' কাগজের সম্পাদক ছিলেন বহুকাল।

আমি তাঁর পূর্ণদাস রোডের বাড়িতে প্রায়ই যেতাম। কথা হত প্রধানত রবীন্দ্রনাথ নিয়ে। তাঁর 'অ্যান আর্টিস্ট ইন লাইফ'-এর এক জায়গায় আছে, রবীন্দ্রনাথ ছবি আঁকা শুরু করেন শেষজীবনে। আগে এ বিষয়ে তাঁর কোনও প্রকার অভিজ্ঞতা ছিল না। আমি তখন তাঁকে প্রথম যুগে আঁকা অনেকগুলি তাঁর স্কেচের কথা বলি। তিনি বলেন, 'আমি জানতাম না, আমাকে দেখিয়ো তো।' আমি অতি সংকোচের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে লেখা কয়েকখানা বই উপহার দিই। তিনি বলেন, কিছু বই আমি আগেই পড়েছি। পরলোকচর্চা নিয়ে বই উত্তম হয়েছে, জমিদার রবীন্দ্রনাথ নিয়ে আলোচনা ভালো। কিন্তু আমার মনে হয় সব রচনাই যেন অসম্পূর্ণ। তুমি শুরু করো গুছিয়ে, সুন্দর করে, কিন্তু শেষ করো বড় তাড়াহুড়োয়। সে কি তুমি মূলত সাংবাদিক বলে? আমি বলেছিলাম— ঠিক তাই। সাংবাদিক, গবেষকসম নয়।

শেষজীবনে তিনি বেশি সিঁড়ি ভাঙতে পারতেন না। একতলার ঘরে বসেই লেখাপড়া, দেখাসাক্ষাৎ ও খাওয়া-দাওয়া সারতেন এবং সন্ধের পর দোতলায় উঠে যেতেন। মনে আছে ১৯৭৭ সালে তাঁর পঁচাত্তর বছর পূর্তি উপলক্ষে আমরা সংবর্ধনার আয়োজন করি সদর স্ট্রিটের একটি হলে। সেই সভায় তিনি ময়মনসিংয়ের বাল্যজীবন, পিতৃপ্রভাব, রবীন্দ্রপ্রভাব ইত্যাদি নিয়ে সুন্দর একটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। সেই সভাতেই হঠাৎ হাজির হন আর এস পি নেতা ননী ভট্টাচার্য। তিনি নীহারবাবুর রাজনৈতিক জীবন সম্পর্কে সুন্দর একটি বক্তৃতা দেন।

১৯৮১ সালে ৭৮ বছর বয়সে তিনি মারা যান। তাঁর ছেলে প্রণবের ফোন পেয়ে তাঁর বাড়িতে ছুটে যাই। অনেক পরিচিতজনের ভিড়। আমি একটু এগিয়ে গিয়ে দেখলাম, তাঁর লেখার টেবিলে নিজের হাতে লিখে রেখেছেন— রবীন্দ্রনাথের 'কল্পনা' কাব্যগ্রন্থের 'অশেষ' কবিতাটির প্রথম পংক্তি—

'আবার আহ্বান? যত-কিছু ছিল কাজ, সাঙ্গ তো করেছি আজ— দীর্ঘ দিনমান' ইত্যাদি।

সত্যিই তাই, সব কাজ সমাপ্ত করে তিনি বিদায় নিয়েছেন। মৃত্যুর সময়ও তিনি সুবেশ সুভদ্র। কে বলে জরা এসে তাঁকে নিয়ে গিয়েছে? শ্মশানযাত্রী হিসেবে আমার বারবার মনে হয়েছিল, নীহার রায় সেই নীহার রায়ই আছেন। সেই শান্ত সৌম্য মূর্তি।

জাহানারা ইমাম

একাত্তরের দিনগুলি

জাহানারা ইমাম

দশ-বারো বছর আগে একবার এক একুশে ফেব্রুয়ারি আর একবার বাংলা নববর্ষে ঢাকার সন্ধানী প্রকাশনীর সাহিত্যানুরাগী কর্ণধার, আমাদের অনেকেরই বন্ধু, গাজী শাহাবুদ্দিন আহমদের আতিথ্যে সারা রাত সারা দিন ঢাকার পথে পথে ঘুরে দেশে ফেরার বেশ কিছুদিন পর গাজী শাহাবুদ্দিন সস্ত্রীক কলকাতায় আমাদের বাড়িতে অতিথি হয়েছিলেন, সেইসময় নিজের প্রকাশনীর একটি বই— জাহানারা ইমামের 'একাত্তরের দিনগুলি' আমাকে উপহার দেন। ওঁরা দেশে ফিরে যাবার দিনই রাতে আমি বইটি শুরু করে ভোরবেলা স্তব্ধ হয়ে বসে থাকি। আমাদের এত কাছে, একদা আমাদেরই ভাঙা হৃদয়ের একটা টুকরো এক ভূখণ্ডের স্বাধীন দেশ হয়ে জন্মানোর রোজকার রক্তাক্ত ঘটনাপঞ্জি এভাবে চোখের সামনে জীবন্ত দেখব কখনও কল্পনাও করিনি। ১৯৭১-এর ২৫ মার্চ পূর্ব-পাকিস্তানের ওপর পাক সেনার আচমকা ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে থেকে বিধ্বংসী ঝড় ওঠার আগের থমথমে মুহূর্তের প্রত্যক্ষ বর্ণনা দিয়ে শুরু করে ১৬ ডিসেম্বর স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা হবার পরদিন পর্যন্ত এ এক পরম মূল্যবান ইতিহাসের সজীব ধারাভাষ্য।

১৯৮৬-তে প্রথম প্রকাশের পর ১৯৯৭ পর্যন্ত বাংলাদেশে বইটির বিংশতিতম মুদ্রণ প্রকাশিত হয়েছে। প্রকাশক গাজী শাহাবুদ্দিন ঢাকা থেকে ফোনে জানালেন, পাকিস্তানেও নাকি এ বইয়ের উর্দু অনুবাদ বেরিয়েছে। আমাদের ঘরের পাশেই বাংলা ভাষাভিত্তিক এই নতুন দেশের জন্মযুদ্ধের একজন ভুক্তভোগী জননী ও জায়ার লেখা এমন মহামূল্য দলিল পাঠ থেকে এপার বাংলার আমরাই বা বাদ থাকব কেন! 'কালের কষ্টিপাথর'-এ বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের এই দৈনন্দিন দলিলের পুনর্মুদ্রণ প্রয়াত লেখিকার স্মৃতির প্রতি আমাদের শ্রদ্ধার্ঘ। বইটির প্রকাশক ও জাহানারা ইমাম স্মৃতিরক্ষা সমিতির সদস্য গাজী শাহাবুদ্দিনের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ, তিনি এই বাংলায় শুধু আমাদেরই এই বই পুনর্মুদ্রণের সানন্দ সম্মতি দিয়েছেন।—সম্পাদক

সাত

৩ মে, সোমবার ১৯৭১

আজ আমার জন্মদিন।

২৯ মার্চ রুমীর জন্মদিনে তবু ভাবতে পেরেছিলাম কিছু স্পেশাল রান্না করা দরকার। কারণ তখনও ২৫ মার্চ কালরাত্রির আকস্মিকতার আঘাত মনকে পুরোপুরি ধরাশায়ী করতে পারেনি, কারণ তখনও এই নিষ্ঠুর মারণযজ্ঞের ব্যাপকতা বুঝে উঠতে পারিনি। তাই তখনও স্বাভাবিক চিন্তাধারা, গতানুগতিক মানসিকতা যেন একেবারে মরে যায়নি। কিন্তু সেই ধ্বংসযজ্ঞের পাঁচ সপ্তাহ পর এখন মনমানসিকতা, চিন্তাধারা কিছুই আর চিরাচরিত, গতানুগতিক খাতে বইছে না। যে জীবন এতকাল যাপন করে এসেছি, তা বড়ই অর্থহীন মনে হচ্ছে। ভিখু, মিলি, সিদ্দিকা, নূরুর রহমানের অনর্থক হত্যা মনকে একেবারে অসাড় করে দিয়েছে।

তবু প্রতিবছরের অভ্যাসমতো, রুমী-জামী যখন আজ সকালে আমাদের ঘরের দরজার ওপাশ থেকে বলল, 'আম্মা আসি?' তখন চোখ ভরা পানি নিয়ে বললাম, 'এসো।'

ওরা প্রতিবছরের অভ্যাসমতোই ঘরে ঢুকল, কিন্তু প্রতিবছরের মতো হাসিমুখে নয়, সুন্দর প্যাকেটে মোড়া হাতভর্তি 'সারপ্রাইজ প্রেজেন্ট' নিয়েও নয়। ওদের মুখও মেঘাচ্ছন্ন, তবে তাতে পানি নেই, বজ্রের আভাস আছে— টের পেলাম। রুমীর হাতে একটা পুরনো বই, জামীর হাতে বাগান থেকে তোলা একটি আধা-ফোটা কালো গোলাপ যার নাম 'বনি প্রিন্স।'

রুমী বইটা আমার হাতে দিয়ে বলল, 'আম্মা এই বইটা তুমি পড়লে মনে অনেক জোর পাবে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শুরুতে জার্মানি অতর্কিত আক্রমণ করে পোলান্ড দখল করে নেওয়ার পর সেখানে পোলিশ ইহুদিদের ওপর নাৎসি বাহিনীর অমানুষিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে পোলিশরা যে অসাধারণ প্রতিরোধ গড়ে তোলে তারই কাহিনী এটা। নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত কীভাবে তারা লড়াই করে গিয়েছে, লড়াই করে মরেছে, তবু মাথা নোয়ায়নি, তারই কাহিনী এটা। এই বইটা পড়লে তোমার মনের সব ভয় চলে যাবে। সব দুঃখ তুচ্ছ হয়ে যাবে। জার্মানরা ইহুদিদের মানুষ বলে গণ্য করত না। পশ্চিম পাকিস্তানিরাও আমাদের মানুষ বলে গণ্য করে না, মুসলমান বলেও গণ্য করে না। অথচ ওদের চেয়ে আমরা বহুগুণে খাঁটি মুসলমান। পড়লে তুমি বুঝতে পারবে, এই বইতে যা লেখা আছে, দেশ আর জাতির নাম বদলে দিলে তা অবিকল বাংলাদেশ আর বাঙালির দুঃখের কাহিনী, প্রতিরোধের কাহিনী, বাঁচা-মরার লড়াইয়ের কাহিনী বলে মনে হবে।'

চেয়ে দেখলাম লিয়ন উরিস-এর লেখা 'মাইলা-১৮'। রুমীর নিজস্ব লাইব্রেরিতে 'এক্সোডাস'-এর বিখ্যাত লেখক লিয়ন উরিস-এর সবগুলো বই-ই আছে। আগে দেখেছি, তবে পড়া হয়ে ওঠেনি।

জামী কালো গোলাপের আধফোটা কলিটি আমার হাতে দিল, রুমী বলল, 'আমাদের স্বাধীনতার প্রতীক। এইরকম রঙের রক্ত ঝরিয়ে তবে স্বাধীনতার রাজপুত্র আসবে।'

বনি প্রিন্স-এর পাপড়িগুলো কালচে ঘন

এক রেডিও কথিকায় পূর্ব পাকিস্তানের বিশিষ্ট কবি ও সমাজকর্মী বেগম সুফিয়া কামাল বলেছেন— যাঁরা তাকে ভালোবাসেন তাঁরা জেনে সুখী হবেন যে তিনি ভালোই আছেন এবং সাহিত্যকর্ম চালিয়ে যাচ্ছেন।

মেরুন রঙের, জমাটবাঁধা কালচে রক্তের মতো। এখনও পুরো ফোটেনি, মখমলের মতো মসৃণ, পুরু পাপড়িগুলো মুঠি বেঁধে আছে। আমাদের স্বাধীনতার এখনও অনেক দেরি।

রুমী বলল, 'তোমার জন্মদিনে একটি সুখবর দিই আম্মা।' সে একটু থামল, আমি আগ্রহে তাকিয়ে রইলাম, 'আমার যাওয়া ঠিক হয়ে গিয়েছে। ঠিকমতো যোগাযোগ হয়েছে। তুমি যদি প্রথমদিকে অত বাধা না দিতে, তাহলে একমাস আগে চলে যেতে পারতাম।'

আমি বললাম, 'তুই আমার ওপর রাগ করিস নে। আমি দেখতে চেয়েছিলাম, তুই হুজুগে পড়ে যেতে চাচ্ছিস, না, সত্যি সত্যি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে যেতে চাচ্ছিস।'

'হুজুগে পড়ে?' রুমীর ভুরু কুঁচকে গেল, 'বাঁচা-মরার লড়াই, নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার যুদ্ধে যেতে চাওয়া হুজুগ?'

'না, না, তা বলিনি। ভুল বুঝিস নে। বন্ধুরা সবাই যাচ্ছে বলেই যেতে চাচ্ছিস কি না, যুদ্ধক্ষেত্রের কষ্ট ও ভয়াবহ অবস্থা সম্বন্ধে সম্যক ধারণা করতে পেরেছিস কি না সেসব যাচাই করবার জন্যই তোকে নানাভাবে বাধা দিচ্ছিলাম। তুই-ই তো বলেছিস, তোর কোনও কোনও বন্ধু যুদ্ধের কষ্ট সইতে না পেরে পালিয়ে এসেছে।'

'তা এসেছে, কিন্তু তাদের সংখ্যা খুবই কম। কোটিতে দু'জনার বেশি হবে না।'

'কবে যাবি? কাদের সঙ্গে?'

'তিন-চারদিনের মধ্যেই। কাদের সঙ্গে— নাম জানতে চেও না, বলা নিষেধ।'

লোহার সাঁড়াশি দিয়ে কেউ যেন পাঁজরের সবগুলো হাড় চেপে ধরেছে। নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে, চোখের বাইরে, নিঃশর্তভাবে ছেড়ে দিতে হবে। জানতে চাওয়াও চলবে না— কোন পথে যাবে, কাদের সঙ্গে যাবে। রুমী এখন তার নিজের জীবনে প্রবেশ করতে যাচ্ছে, তার একান্ত নিজস্ব ভুবন, সেখানে তার জন্ম-দাত্রীরও প্রবেশাধিকার নেই।

মনে পড়ল, খালীল জিবরান তাঁর 'প্রফেট' বইতে এদের সম্পর্কেই লিখে গেছেন:

তোমাদের সন্তানেরা তোমাদের নয়,
... ...
তারা জীবনের সন্তানসন্ততি
জীবনের জন্যই তাদের আকুতি।
তারা তোমাদের সঙ্গেই রয়েছে
তবু তারা তোমাদের নয়।
তারা তোমাদের ভালোবাসা নিয়েছে
কিন্তু নেয়নি তোমাদের ধ্যান-ধারণা,
কেননা তারা গড়ে নিয়েছে
তাদের নিজস্ব ধ্যান-ধারণা।
তাদের শরীর তোমাদের আয়ত্তের ভেতর
কিন্তু তাদের আত্মা কখনওই নয়
কেননা, তাদের আত্মা বাস করে
ভবিষ্যতের ঘরে,
যে ঘরে তোমরা কখনই পারবে না যেতে
এমনকি তোমাদের স্বপ্নেও না।
... ...
তাদেরকে চেয়ো না তোমাদের মতো করতে
কারণ তাদের জীবন কখনওই ফিরবে না
পিছনের পানে।

৪ মে, মঙ্গলবার ১৯৭১

সামরিক সরকার নিজেদের অপকর্ম ঢেকে দেশের সবকিছু স্বাভাবিক দেখাবার চেষ্টায় মরিয়া হয়ে উঠে-পড়ে লেগেছে। আজকের কাগজে একটা হাস্যকর খবর ছাপা হয়েছে কবি সুফিয়া কামালের ছবিসহ। এক রেডিও কথিকায় পূর্ব পাকিস্তানের বিশিষ্ট কবি ও সমাজকর্মী বেগম সুফিয়া কামাল বলেছেন— যাঁরা তাকে ভালোবাসেন তাঁরা জেনে সুখী

হবেন যে তিনি ভালোই আছেন এবং সাহিত্যকর্ম চালিয়ে যাচ্ছেন।

ছবিটাতে দেখা যাচ্ছে অতিশয় বিষণ্ণবদন কবির সামনে রেডিও'র মাইক ধরে আছে একটি অদৃশ্য হাত। মাইকটাকে মনে হচ্ছে যেন উদ্যত সঙ্গীন।

ভারতীয় বেতার তাঁর মৃত্যুর খবর বের করেছিল, সেই প্রেক্ষিতে তাঁর এই ফটো তোলা হয়েছে। কবির মুখের ভাব দেখে মনে হচ্ছে তার পিছে যেন বেয়নেট ঠেকানো রয়েছে। কাগজে আরও ফলাও করে বেরিয়েছে:

গতকাল বাংলা অ্যাকাডেমির ডিরেক্টর কবীর চৌধুরী ঢাকা রেডিও থেকে মুনশি মেহেরুল্লাহ সম্পর্কে এক কথিকা প্রচার করেন।

সম্প্রতি কতিপয় মার্কিন সংবাদপত্রে একটি বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে জনাব কবীর চৌধুরীর পরিবারবর্গকে সাহায্যের জন্য আবেদন ছাপিয়ে, তিনি সাম্প্রতিক গোলযোগে মারা গিয়েছেন— একথা বোঝানোর চেষ্টা করা হয়।

গত পরশুর কাগজেও ঠিক এই একই ধরনের খবর ছাপা হয়েছে: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যক্ষ ডঃ মফিজুল্লাহ কবির ১ মে শনিবার ঢাকা টিভিতে মুসলিম বাংলার দু'জন মহান স্বাধীনতা সংগ্রামী হাজি শরিয়তউল্লাহ ও দুদু মিয়ার জীবন ও অবদানের বিভিন্ন দিক সম্পর্কিত এক আলোচনা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন ইতিহাস বিভাগের রিডার ডঃ মোহর আলী।

ডঃ কবীর সাম্প্রতিক গোলযোগে মারা গিয়েছেন— এই গুজবের অবসানকল্পে তাঁকে টিভিতে হাজির করা হয়েছে।

আমাদের মতো অখ্যাত রেডিও টকার ছাড়াও ওরা এখন বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত বিখ্যাত লোকদের ধরে ধরে রেডিও-টিভিতে হাজির করে সবাইকে জানাতে চাচ্ছে— ওঁরা সামরিক জান্তার হত্যাযজ্ঞের শিকার হয়নি। খুব ভালো কথা। তা সামরিক জান্তা দর্শন বিভাগের অধ্যক্ষ ডঃ জি সি দেব, জগন্নাথ হলের প্রভোষ্ট ডঃ জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা, স্ট্যাটিস্টিক্স বিভাগের অধ্যক্ষ মনিরুজ্জামান, ভূতত্ত্ব বিভাগের সিনিয়র লেকচারার জনাব মুকতাদির, সয়েল সায়েন্সের সিনিয়র লেকচারার ডঃ এফ আর খান, গণিত বিভাগের লেকচারার জনাব শরাফত আলী, ফিজিক্স-এর জনাব খাদেম, অ্যাপ্লায়েড ফিজিক্সের মিঃ ভট্টাচার্য, শিক্ষা ও গবেষণা ইন্সটিটিউটের মিঃ সাদেক ও ডঃ সাদত আলী— এঁদেরকেও একে একে এনে রেডিও-টিভিতে হাজির করুক না। বলুক না সারা দুনিয়ার লোককে— এঁদেরকে ওরা ২৫ মার্চের কালরাত্রে গুলি করে মেরে ফেলেনি।

জীবন যখন ছিল ফুলের মতো। সুখের সময়ে নৌকো-সফরে সপুত্র জাহানারা ইমাম (পিছনের সারিতে মাঝখানে)

৬ মে, বৃহস্পতিবার ১৯৭১

রুমী আগামীকাল রওনা হবে। ওর প্যান্টের কোমরের কাছে ভেতর দিকের মুড়ির সেলাই খুলে সেখানে কয়েকটা একশো টাকার নোট লম্বালম্বি ভাঁজ করে রেখে আবার মুড়ি সেলাই করে দিলাম। পকেট ওয়ালেটে শ'দুয়েকের বেশি রাখবে না, কারণ পথে খানসেনারা হাতিয়ে নিতে পারে।

কাপড়-জামা রাখার জন্য রুমী সঙ্গে নিচ্ছে একটা ছোট আকারের এয়ারব্যাগ। তাতে দু'সেট কাটা কাপড়, তোয়ালে, সাবান, স্যান্ডেল আর দুটো বই— 'জীবনানন্দের শ্রেষ্ঠ কবিতা' ও 'সুকান্ত সমগ্র'।

যে বন্ধু-দু'জনের সঙ্গে যাবে, তাদের নাম অবশেষে বলেছে রুমী— মবু আর শিরাত। সেইসঙ্গে এটাও বলেছে যে, নাম দুটো কাল্পনিক।

রাতে শোওয়ার সময় রুমী বলল, 'আম্মা আজকে একটু বেশি সময় মাথা বিলি করে দিতে হবে কিন্তু।'

জামী বলল, 'মা, আজ আর আমার মাথা বিলি করার দরকার নেই। ওই সময়টাও তুমি ভাইয়াকেও দাও।'

ছোট বয়স থেকে ঘুমোবার সময় দু'ভাইয়ের মাথার চুলে হাত বুলিয়ে দিতে হয়। মাঝে-মাঝে এ নিয়ে দু'ভাইয়ে ঝগড়াঝাটিও বাধে। রুমী বলে 'আম্মা তুমি জামীর কাছে বেশিক্ষণ থাকছ।' জামী বলল, 'মা তুমি ভাইয়ার মাথা বেশি সময় বিলি দিচ্ছ।'

আমি রুমীর মাথার চুলে বিলি কেটে দিতে লাগলাম, রুমী 'একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি' গানটার সুরে আস্তে আস্তে শিস দিতে লাগল।

> একটা লোহার সাঁড়াশি যেন পাঁজরের দুই পাশ চেপে ধরে আছে। মাঝে-মাঝে নিঃশ্বাস আটকে আসে। মাঝে-মাঝে চোখ ঝাপসা হয়ে ওঠে। মাঝে-মাঝে সব কাজ ফেলে ডুকরে কেঁদে উঠতে ইচ্ছে করে। কিন্তু মাছের মাকে নাকি শোক করতে নেই।

৭ মে, শুক্রবার ১৯৭১

সকালে নাস্তা খাওয়ার সময় রুমী বলল, 'আম্মা, আমাকে সেক্রেটারিয়েট সেকেন্ড গেটের সামনে নামিয়ে দিয়ো। জামী, তুই এয়ারব্যাগটা আগেই গাড়িতে রেখে আয়। পায়ের কাছে রাখবি, যেন দেখা না যায়।'

নাস্তা খেয়ে রুমী তার দাদার পাশে বসে তাঁর হাতটা ধরল। বাবা চোখে দেখেন না, তাই যে-ই আসুক, আগে তার হাত ধরে। হাত

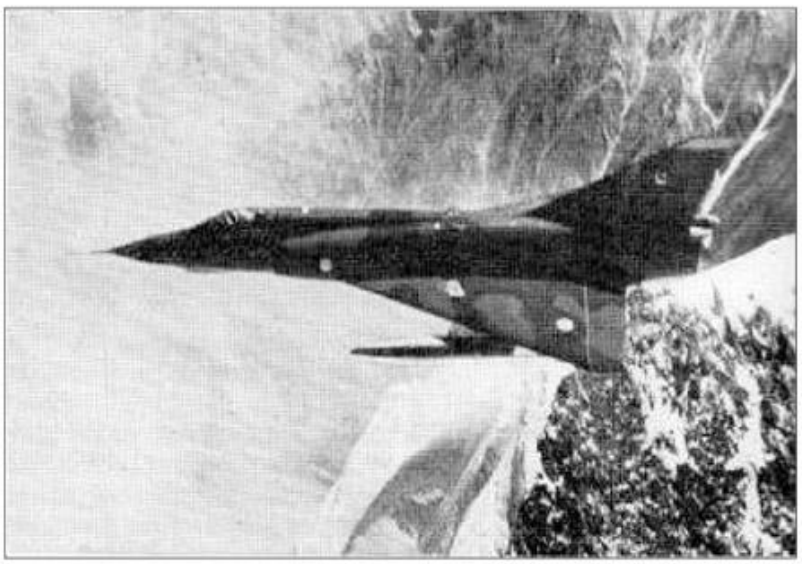

ওই সময় আমরা প্রায়ই দেখতাম বম্বার প্লেনগুলো এদিক-ওদিক উড়ে যাচ্ছে। ঘরে বসে বুঝতে পারতাম না, কিন্তু সন্দেহ করতাম— যেসব এলাকা তখনও জয়বাংলার দখলে রয়েছে, সেইসব এলাকায় বোমা ফেলতে যাচ্ছে।

ধরতেই বাবা আস্তে বললেন, 'কে?'

'আমি রুমী, দাদা।'

খানিক একথা সেকথার পর রুমী বলল, 'দাদা, আমি দিনকতকের জন্য বাইরে যাচ্ছি- একসকারসনে।'

'একসকারসনে? কি— তোমাদের কলেজ থেকে?'

'ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ তো বন্ধ। ঠিক কলেজ থেকে নয়; তবে কলেজেরই কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে— মানে, বাড়ি বসে বসে একেবারে ঘেঁতিয়ে গিয়েছি— কোনও কাজকর্ম তো নেই, তাই—'

বাবা খানিকক্ষণ চুপ করে থাকলেন, তারপর তাঁর স্বভাবসিদ্ধ মৃদু গলায় থেমে থেমে বললেন, 'একসকারসন খুব ভালো জিনিস। আমাদের সময়ও হত; তবে ছুটির সময়। তা সাবধান থেকো, এখন তো সব জায়গায় খুব গোলমাল শুনি।'

'না দাদা, গোলমাল আর নেই। সব জায়গা এখন তো শান্ত-'

'শান্ত? জামীদের স্কুল তাহলে এখনও বন্ধ কেন? তোমার কলেজ খোলে না কেন?'

বাবাকে নিয়ে এই এক সমস্যা। চোখে না দেখলে কী হবে, চিন্তা ও ধারণাশক্তি এখনও টনটনে। সবকিছু জানতে চান, একটু কোথাও উনিশ-বিশ হলেই উত্তেজিত হয়ে পড়েন। ব্লাড প্রেসার ধাঁই করে চড়ে যায়। সেইজন্য ওঁকে সবকিছুর খবর বেশ ভালোমতো সেন্সার করে বলতে হয়। তবে বাবার একটা পরিমিতিবোধ জন্মে গিয়েছে। আগে যেমন অনেক ব্যাপারে বিধিনিষেধ আরোপ করতেন, এখন আর তা করেন না। সবই মেনে নেন।

ক'দিন থেকেই মাঝে-মাঝে বিকেলে ঝড়বৃষ্টি হচ্ছে। লেট কালবৈশাখী। আজ আবার সকাল থেকেই আকাশে মেঘ। ইয়া আল্লা, আজ যেন ঝড়বৃষ্টি না আসে।

জামীকে পাশে বসিয়ে আমি স্টিয়ারিং হুইল ধরলাম। ড্রাইভারকে গতকালই বলে দেওয়া হয়েছে, আজ তাকে লাগবে না। পিছনে শরীফ আর রুমী বসল। শরীফের হাতে খবরের কাগজ। খুলে পড়ার ভান করছে।

রুমী বলল, 'সেকেন্ড গেটের সামনে আমি নেমে যাওয়া মাত্র তোমরা চলে যাবে। পিছন ফিরে তাকাবে না।'

তাই করলাম। ইগলু আইসক্রিমের দোকানের সামনে গাড়ি থামালাম। রুমী আধাভর্তি পাতলা ছোট এয়ারব্যাগটা কাঁধে ফেলে নেমে সামনের দিকে হেঁটে চলে গেল। যেন একটা কলেজের ছেলে বইখাতা নিয়ে পড়তে যাচ্ছে। আমি হুস করে এগিয়ে যেতে যেতে রিয়ারভউ-এর আয়নায় চোখ রেখে রুমীকে এক নজর দেখার চেষ্টা করলাম। দেখতে পেলাম না, সে ফুটপাতের চলমান জনস্রোতের মধ্যে মিশে গিয়েছে।

৯ মে, রবিবার ১৯৭১

একটা লোহার সাঁড়াশি যেন পাঁজরের দুই পাশ চেপে ধরে আছে। মাঝে-মাঝে নিঃশ্বাস আটকে আসে। মাঝে-মাঝে চোখ ঝাপসা হয়ে ওঠে। মাঝে-মাঝে সব কাজ ফেলে ডুকরে কেঁদে উঠতে ইচ্ছে করে। কিন্তু মাছের মাকে নাকি শোক করতে নেই। চোরের মাকে নাকি ডাগর গলায় কথা বলতে হয়। রুমী যাওয়ার পর উঁচু ভল্যুমে ক্যাসেট বাজানো হয় প্রায় সারাদিনই। সন্ধে হলেই সারা বাড়িতে সব ঘরে বাতি জ্বেলে জোরে টিভি ছেড়ে রাখা হয়। অর্থাৎ বাড়িতে বেশ একটা উৎসব উৎসব পরিবেশ। বেশ গান বাজনা, হইচই, কলকোলাহল। আশপাশে কোনও বাড়ির কেউ যেন সন্দেহ না করে যে এ বাড়ির লোকগুলোর বুক খাঁখাঁ করছে, ব্যথায় কলজেয় টান ধরছে।

আকাশের বুকেও অনেক ব্যথা। তার কিন্তু আমার মতো চেপে রাখার দায় নেই। তাই সেও কদিন থেকে মাঝে মাঝে অঝোরে ঝরাচ্ছে। না জানি রুমীদের কী কষ্ট হচ্ছে এই বৃষ্টিতে।

জামীও আবদার ধরেছিল সে রুমীর সঙ্গে যাবে। তাকে অনেক করে বুঝিয়েছি, দু'ভাই একসঙ্গে গেলে পাড়ার লোকে সন্দেহ করবে। সবচেয়ে বড় কথা বাবাকে কী কৈফিয়ত দেব? ওঁকে তো কিছুতেই বলা চলবে না মুক্তিযুদ্ধের কথা। তাহলে উদ্বেগে, উত্তেজনায় ব্লাড প্রেসার বেড়ে স্ট্রোক হয়ে যাবে। তাছাড়া আমিই বা থাকব কী করে?

কাল সারারাত ঘুম হয়নি। সারারাত জোরে জোরে মাইকে হামদ, নাত, দুরূদ, মিলাদ, মওলানা সাহেবদের ওয়াজ-নসিহত এসব শোনা গিয়েছে। এবছর ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী অনেক বেশি শান-শওকত ধুম-ধড়াক্কার সঙ্গে পালিত হচ্ছে। চার-পাঁচদিন আগে থেকে খবরের কাগজ, রেডিও-টিভিতে ঢোল-শোহরতের কী ঘটা! ইসলামকে পুরো গলা কেটে জবাই করে এখন তাকে জোড়া লাগানোর চেষ্টা!

সকালে উঠে চোখ করকর করছিল, শরীরও ম্যাজম্যাজ। ভাবলাম গোসল করলে ঝরঝরে লাগবে। গোসল করে নাস্তা খেয়েও স্বস্তি লাগছে না। শরীফ বলল, 'বিষ্টি নেই, চল লিলিবুদের বাড়ি যাই। ওখান থেকে নারিন্দা।'

কোথাও বেরতে ইচ্ছে করে না, আবার ঘরে বসে থাকলেও ফাঁপর লাগে। তাই জোর করেই

বেরিয়ে পড়লাম। ঠিক আছে, সব আত্মীয়স্বজনের বাড়িতেই বেড়াব আজ। লিলিবুদের বাসায় খানিক বসে লিলিবু ও একরাম ভাইকে সঙ্গে নিয়ে নারিন্দায় গেলাম আতাভাইদের বাসায়। ওখান থেকে কাছেই নওয়াব স্ট্রিটে খোকাদের বাসায়। গিয়ে দেখি খোকার বোন আনা তার স্বামী পুত্র শাশুড়িসহ এ বাড়িতে। আনাদের বাড়িও কাছেই— ক্যাপ্টেন বাজারে। ওদের বাড়ির পিছনে বিহারিদের বস্তি। সামনে রেললাইন পেরিয়ে আওয়ামী লীগের অফিস। ২৫ মার্চ রাতে আওয়ামী লীগের অফিস আগুনে পোড়ানো হয়। ২৭ তারিখ সকালে কারফিউ উঠলে আনারা ভাইয়ের বাসায় চলে আসে। খোকা ও আনার বড় বোন মীরা আমার চাচাত দেবর আনুর স্ত্রী। আনু ও মীরা এখন করাচিতে রয়েছে। ওদের জন্যও খোকারা সবাই খুব উদ্বিগ্ন, বিশেষ করে খোকার আম্মা। খানিকক্ষণ পরস্পরের জানা খবর বিনিময় করে আমরা উঠলাম। ফেরার পথে একরাম ভাই বললেন, 'মকু মিয়ার বাড়ি চল ক্যানে একবার? ভিখুর ছেলেমেয়েরা, মা, বোন সবাই ফিরেছে শুনলাম। দেখে আসি।'

আমি বললাম, 'ভিখুর ছেলে রুবেল ফেরেনি। ও নাকি আগেই রাজশাহী দিয়ে ইন্ডিয়া চলে গিয়েছে। ভিখুর দুই মেয়ে লীরা, ইয়েন মকু মিয়ার বাড়িতে আছে। বুলু, তার মা-ও আছেন।'

মকু চৌধুরীর বাড়ি গিয়ে বুলুর দেখা পেলাম না: ও আজ ভোরের প্লেনে পোলান্ডের পথে করাচি রওনা হয়ে গিয়েছে। তবে আরও অনেক আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে দেখা হল— তনজিম, তার বউ ডলি, বুলুর ছোট বোন গুলু অর্থাৎ মওদুদা। তনজিম, ডলি, গুলুর মুখেও খানসেনাদের বিভিন্ন জায়গার বিভিন্ন রকমের নিষ্ঠুরতার কাহিনী শুনলাম। এ ছাড়া অন্য কোনও কথা নেই কারও মুখে। কানু ছাড়া গীত নেই।

বাসায় ফিরে ঘরে পা দিয়েই চমকে গেলাম। বসার ঘরে সোফায় বসে এক রোগাপাতলা লোক, চুলদাড়ি সব সাদা, গর্তে ঢোকা চোখ, কপালে গভীর ভাঁজ। চিনতে না পেরে তাকিয়ে রইলাম। তিনি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'সালাম আলায়কুম, আমি রসুল। চিনতে পারেননি, না?'

লজ্জিত হেসে বললাম, 'ওয়ালায়কুম সালাম। কী করে চিনব! এত রোগা হয়ে গিয়েছেন! চুলদাড়ি সাদা হল কী করে? বসুন।'

রসুল সাহেব আমার এক ছাত্রীর স্বামী। ছাত্রী মানে সেই ১৯৫২ সালে আমি যখন প্রথম সিদ্ধেশ্বরী স্কুলে চাকরি করতে যাই, সেই বছরের ক্লাস টেনের ছাত্রী। মাত্র বছরখানেক

গ্রামের লোকেরা এত ভালো ব্যবহার করেছিল যে কী বলব। খেতে দিয়েছে, শুতে দিয়েছে। কিন্তু হলে কী হবে, পাকিস্তান আর্মি যেভাবে গ্রামকে গ্রাম জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে দিচ্ছিল, তাতে ওরা নিজেরাই একগ্রাম ছেড়ে আরেক গ্রামে দৌড়চ্ছিল। সেইসঙ্গে আমরাও।

পেয়েছিলাম তাকে, তাতেই পরবর্তী সময়ে যখনই তার সঙ্গে দেখা হয়েছে, আমাদের 'বড় আপা' বলে উচ্ছ্বসিত হয়েছে। বিয়ের পরে স্বামীকে সঙ্গে এনে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে। রসুল সাহেব সরকারি চাকুরে। বদলির চাকরি। বিভিন্ন জেলায় ঘুরে বেড়ান। যখনই ঢাকা আসেন, একবার আমাদের বাসায় আসবেনই। ধর্মভীরু পরহেজগার মানুষ। কালো চাপদাড়ি, মাথায় কালো জিন্না টুপি— এইভাবে তাঁকে দেখে আসছি গত পনেরো-ষোলো বছর ধরে। সেই মানুষের একি চেহারা হয়েছে!

আমার প্রশ্নের উত্তরে তিনি বললেন, 'বয়েস হচ্ছে, একটু-আধটু পাক ধরেছিল আগেই, কিন্তু গত দেড় মাসে হঠাৎ সব সাদা হয়ে গেল ভয়ে, দুর্ভাবনায়, ছুটোছুটিতে।'

আমি বারেককে চা'র কথা বলে এসে বললাম, 'বলুন তো কী ব্যাপার? এবার প্রায় চার বছর পর এলেন। কোথায় পোস্টেড ছিলেন? কীভাবে কাটালেন এই দেড় মাস?'

'ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় বদলি হয়েছিলাম মাত্র ছ'মাস আগে। ভালোই ছিলাম। ক্র্যাকডাউনের পরেও ওখানেই ছিলাম। প্রথম কিছুদিন এলাকাটা জয় বাংলার দখলেই ছিল। তারপর যখন প্লেন থেকে বোমা ফেলা শুরু হল, তখন জানের ভয়ে সব ফেলে বউ-ছেলেমেয়েদের হাত ধরে গ্রামের দিকে পালিয়েছিলাম। সে যে কী কষ্ট। কোনও একটা গ্রামে থিতু হয়ে থাকতে পারিনি। আমার বাড়ি উত্তরবঙ্গে। এদিকের কোনও গ্রামে কোনও আত্মীয়স্বজন, চেনাজানা কেউ নেই। কিন্তু গ্রামের লোকেরা এত ভালো ব্যবহার করেছিল যে কী বলব। খেতে দিয়েছে, শুতে দিয়েছে। কিন্তু হলে কী হবে, পাকিস্তান আর্মি যেভাবে গ্রামকে গ্রাম জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে দিচ্ছিল, তাতে ওরা নিজেরাই একগ্রাম ছেড়ে আরেক গ্রামে দৌড়চ্ছিল। সেইসঙ্গে আমরাও।'

শরীফ জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, কোন সময় বম্বিং করে, মনে আছে?

মার্চের শেষে হবে। তারিখ ঠিক মনে নেই।'

শরীফ বলল, 'ওই সময় আমরা প্রায়ই দেখতাম বম্বার প্লেনগুলো এদিক-ওদিক উড়ে যাচ্ছে। ঘরে বসে বুঝতে পারতাম না, কিন্তু সন্দেহ করতাম— যেসব এলাকা তখনও জয়বাংলার দখলে রয়েছে, সেইসব এলাকায় বোমা ফেলতে যাচ্ছে। আচ্ছা, আপনি কি বলতে পারবেন ওই অঞ্চলে কীরকম যুদ্ধ হয়েছিল?

রসুল মাথা নেড়ে বলল, 'না। আমাদের বাড়িটা যে পাড়ায় ছিল, সেখানে বোমা পড়েনি, তবে কাছেই বোমা পড়েছে, বিকট শব্দ, লোকজনের চিৎকার শুনেছি, আগুন দেখেছি। আর তখনই একবস্ত্রে ছুটে পালিয়েছি পাশের এক গ্রামে। কিন্তু সেখানে একরাত থাকার পরই শুনলাম মিলিটারি আসছে। যাদের বাড়িতে আশ্রয় পেয়েছিলাম তারাসুদ্ধ পালালাম। দু'দিন পরে ফিরে এসে দেখি— পুরো গ্রাম আগুনে পুড়ে ছাই। বহুলোক— যারা পালাতে পারেনি মরে পড়ে আছে। গরু, ছাগল মরে ফুলে ঢোল হয়ে আছে। দুর্গন্ধে টেকা যায় না। সে যে কী বীভৎস দৃশ্য।'

রসুল সাহেব দম নেওয়ার জন্য থামতেই আমি বলে উঠলাম, 'তারপর কী আবার ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ফিরে এলেন?'

'না, ব্রাহ্মণবাড়িয়া আর তার আশপাশে তখনও প্রায় রোজই বম্বিং হচ্ছিল। আমরা অন্যদিক দিয়ে অন্য একটা গ্রামে চলে গেলাম। সেখানেও শান্তি নেই। মিলিটারির তাড়া।'

'আপনার ফ্যামিলি কোথায়?'

'অনেক কষ্টে সবসুদ্ধ ঢাকায় এসে পৌঁছেছি। ভূতের গলিতে আমার এক আত্মীয় আছেন, তাঁর বাড়িতে উঠেছি। গ্রামে দৌড়ে পালাতে গিয়ে সালেহার পায়ের তলায় হাড়ের টুকরো ফুটেছিল। প্রথমে কেউ খেয়াল করিনি, একটু আধটু ব্যথা করত। খেয়াল করব কী করে? সে সময়টুকু ছিল নাকি? একটু চুন-হলুদ দিয়ে বেঁধে রাখলেই ভালো হয়ে যেত, সেটাই বা কে করে! এখন ফুলে-পেকে যা-তা অবস্থা হয়েছে।

আমি ব্যস্ত হয়ে উঠলাম, 'কী সর্বনাশ। ডাক্তার দেখিয়েছেন?'

'সেই জন্যই আপনার কাছে এসেছি। সালেহা বলল বড় আপার কাছে যাও। ওনার সঙ্গে অনেক ডাক্তারের চেনাজানা আছে।'

'আমাদের পাড়াতেই ভালো সার্জন আছেন। মেইন রোড ধরে পুবদিকে খানিক গেলেই

বড় আপা, খানসেনারা কি মানুষ নয়? ওরা কি মুসলমান নয়? হিন্দু খুঁজে খুঁজে মেরেছে তো বটেই, কলমা জানা মুসলমানকে পর্যন্ত ওরা কাফের মনে করে মেরেছে।

পলি-ক্লিনিক, ওখানে ডাঃ আজিজ আমার চেনা, খুব ভালো সার্জন।'

তখনই ফোনে আজিজের সঙ্গে কথা বলে রসুলকে বললাম, 'আজিজ ক্লিনিকেই আছে। এখনই পেসেন্টকে নিয়ে যেতে বলল। আপনি সালেহাকে নিয়ে যান। আমি আধঘণ্টা পরে ক্লিনিকে যাচ্ছি। এখন যাবার সময় ডানদিকে তাকাতে তাকাতে যাবেন, পলিক্লিনিকের সাইনবোর্ড চোখে পড়বে।'

আধঘণ্টা পরে পলিক্লিনিকে গিয়ে দেখি রসুলরা তখনও এসে পৌঁছয়নি। ডাঃ আজিজের স্ত্রী সুলতানাও ডাক্তার। পাশাপাশি দুটো বাড়ি ভাড়া নিয়ে ওরা এই ক্লিনিক করেছে। একটা বাড়ির নীচে এমার্জেন্সি, অপারেশন থিয়েটার, দোতলায় রুগিদের কেবিন। পাশের বাড়ির দোতলায় ওরা নিজেরা থাকে, নীচে রুগির কেবিন।

সুলতানা-আজিজ দু'জনেই খুব হাসিখুশি, সবসময় চারপাশটা মাতিয়ে রাখতে পারে। ক্র্যাকডাউনের পর কয়েকটা দিন স্তম্ভিত, হতবাক হয়েছিল। মাঝখানে বেশ কয়েকদিন দেখা হয়নি। আজ দেখলাম, আগের মতোই। বললাম, 'কী খুব যে হাসিখুশি মনে হচ্ছে।'

সুলতানা হিহি করে হেসে বলল, 'হ্যাঁ বুবু, প্রথম ধাক্কাটা কাটিয়ে উঠেছি। আমরা ডাক্তার তো, গোলায় নিজের পা উড়ে গেলেও যদি হাত দুটো ঠিক থাকে, তাহলে ওই অবস্থাতেই আরেকজনের ট্রিটমেন্ট করতে হয়। আর এখন তো ক্যাজুয়ালটির সংখ্যা অনেক বেশি, গোপনে ট্রিটমেন্ট করার টেনসানও বেশি, তাই চাঙ্গা থাকার জন্যই হাসতে হয়।'

সুলতানা অবশ্য এমনিতেই হাসে বেশি। সেজন্য ওকে আমরা আদর করে পাগলি বলি। সে আমার হাত ধরে পাশের বাড়িটায় নিয়ে গেল। এটার দোতলায় ওরা থাকে। গেটটা এক পাশে। গেট বরাবর পোর্চ পেরিয়ে সোজা এগিয়ে গ্যারেজ— পাশের ও পিছনের বাউন্ডারি ওয়াল ঘেঁষে। সুলতানা নিজের হাতে গ্যারেজের দরজা খুলে দিতেই দেখা গেল ভেতরে একটা গাড়ি। গাড়ির পাশ দিয়ে পিছনে নিয়ে গেল আমায়। দেখলাম মেঝের কাছাকাছি দেওয়াল ভেঙে একহাত বাই দেড় হাত একটা ফোকর। বাড়ির দিকে গ্যারেজের যে দেয়াল, তাতে একহাত চওড়া একটা কাঠের দরজা। অর্থাৎ মেইন বাড়ির যে খিড়কি দরজাটা এ পাশে আছে, সেটা দিয়ে বেরিয়ে এই ছোট দরজাটা দিয়ে গ্যারেজে ঢুকে ওই ফোকর দিয়ে পালিয়ে যাওয়া খুবই সহজ। বাড়ির সামনে মেইন গেটের কাছে দাঁড়ানো লোকজন মোটেই টের পাবে না।

'বুঝলেন বুবু, এ গাড়িটা নষ্ট। কখনও বের করা হয় না।' তারপরই আবার হিহি হাসি— 'আর বের করলেই তো বিপদ। ফোকরটা দেখা যাবে যে!'

আজিজ ধমক দিল, 'এত কথা বল কেন?' সুলতানা আগের মতোই হাসতে হাসতে আমার হাত ধরে আবার মেইন ক্লিনিকে চলল।

একটু পরেই সালেহাকে নিয়ে রসুল পৌঁছে গেল। আমাকে দেখে সালেহা কান্নায় ভেঙে পড়ল, 'বড় আপা গো, আমাদের সব গিয়েছে। ফকির হয়ে গিয়েছি। মরে গিয়েছি একেবারে।'

সুলতানা হইহই করে উঠল, 'আরে আরে! কাঁদে কেন? কান্নার কী হয়েছে? হাসুন, হাসুন, হাসলে আদ্দেক অসুখ সেরে যাবে। আসুন আগে এগজামিন করি। দেখি কত তাড়াতাড়ি সারানো যায় আপনাকে।

সালেহাকে ভর্তি করতে হল ক্লিনিকে। ওকে বেডে শুইয়ে ওর পাশে বসে রইলাম, রসুল আবার বাসায় গেল সালেহার কয়েকটা জিনিসপত্র আনতে। সালেহা আমার হাত ধরে কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'বড় আপা, খানসেনারা কি মানুষ নয়? ওরা কি মুসলমান নয়? হিন্দু খুঁজে খুঁজে মেরেছে তো বটেই, কলমা জানা মুসলমানকে পর্যন্ত ওরা কাফের মনে করে মেরেছে। বড় আপা, বাড়িঘর, জিনিসপত্র, সব ফেলে পালিয়ে এসেছি। পা পচে গেছে। আমি আর বাঁচব না। বড় আপা, আমি মরে গেলে কে আমার বাচ্চাগুলোকে দেখবে?'

রুবেল, লীরা, ইয়েনের কথা মনে হয়ে আমার বুকে কান্না উথলে উঠল। বললাম, 'সালেহা আল্লার কাছে হাজার শুকুর করো তোমার পরিবারের সবাই বেঁচে আছে। তোমাদের কারও গায়ে আর্মির গুলি লাগেনি। তুমি খুব ভাগ্যবতী, তাই তোমার পায়ে হাড় বিঁধেছে, আর্মির গুলি বেঁধেনি। সামান্য একটু অপারেশন করে তোমার পা ভালো হয়ে যাবে দু'চারদিনে। জিনিসপত্র গিয়েছে, তার জন্য এত শোক কেন? জিনিসপত্র, টাকাপয়সা আবার হবে। জান যদি চলে যেত। তাহলে আর কি জান ফিরে পেতে?'

ওকে ভিখু, মিলি ও তাদের তিনটি নাবালক বাচ্চার কথা বললাম। শুনে সালেহা আরেক দফা কাঁদল, তারপর বলল, 'না বড় আপা আমার আর কোনও দুঃখ নেই।'

১০ মে, সোমবার ১৯৭১

বেশ কিছুদিন বাগানের দিকে নজর দেওয়া হয়নি। আজ সকালে নাস্তা খাওয়ার পর তাই বাগানে গেলাম। বাগানে বেশ ক'টা হাই-ব্রিড টি-রোজের গাছ আছে। এই ধরণের গোলাপ গাছের খুব বেশি যত্ন করতে হয়— যা গত দু'মাসে হয়নি। খুরপি হাতে কাজে লাগার আগে গাছগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখলাম। মাখনের মতো রঙের 'পিস' অর্থাৎ 'শান্তি।' কালচে-মেরুন 'বনি প্রিন্স' আর এনা হার্কনেস।' ফিকে ও গাঢ় বেগুনি রঙের 'সিমোন' আর 'ল্যাভেন্ডার'। হলুদ 'বুকানিয়ার', সাদা 'পাসকালি।'

বনি প্রিন্স-এর আধফোটা কলিটি এখনও আমার বেড-সাইড টেবিলে কলিদানিতে রয়েছে। কলি অবশ্য আর নেই, ফুটে গিয়েছে এবং প্রায় ঝরে পড়ার অবস্থা। 'পিস'-এর গাছটায় একটা কলি কেবল এসেছে— যদিও সারাদেশ থেকে 'পিস' উধাও।

বাগান করা একটা নেশা। এ নেশায় দুঃখ-কষ্ট খানিকক্ষণ ভুলে থাকা যায়। গত কয়েক মাস ধরে নেশাটার কথা ভাববারই অবকাশ পাইনি। এখন ভয়ানক বিক্ষিপ্ত মনকে ব্যস্ত রাখার গরজেই বোধকরি নেশাটার কথা আমার মনে পড়েছে। (ক্রমশ)

সীতবিতান ছুঁয়ে বলছি

সমরেশ মজুমদার

পূ র্বা নু বৃ ত্তি

পড়াশোনা করার জন্য বাবা-মা পাঠিয়ে দিলেন জলপাইগুড়িতে পিতামহ এবং বিধবা পিসির সংসারে। পাশের বাড়ির কমলা কাকিমার জন্য বই কিনে আনতে গিয়ে স্বপনকুমার ও শশধর দত্তের গোয়েন্দা গল্পের সঙ্গে পরিচয়। পরে ঝুমুরদির কথায় নীহাররঞ্জন গুপ্তের 'কালো ভ্রমর' পড়া এবং বাবুপাড়া পাঠাগারে নাম লেখানো। সেখানে নীপা নামের এক শ্যামবর্ণা কিশোরীর সঙ্গে আলাপ। সন্ধেবেলা তিস্তার পারে কাশবনের আড়াল থেকে দেখি ভেসে আসা কাঠ সংগ্রহ করতে বিবস্ত্র হয়ে জলে নেমেছে বেশ কয়েকজন আদিবাসী মেয়ে। নগ্ন নারী শরীর দেখাও সেই প্রথম। বন্ধুদের সঙ্গে লুকিয়ে সিনেমা দেখে এসে একদিন নীপার কথায় 'বনলতা সেন' কবিতাটি পড়ে মনে হল, বনলতা সেন আমার খুবই চেনা। তিনি সিনেমার সেই নায়িকা। নিশীথ আর স্বপনের প্রেমপত্র লিখে দিতে হয় আমাকে। যুতসই কোটেশনের জন্য পড়ে ফেলি 'সঞ্চয়িতা'। কিন্তু একদিন অকস্মাৎ প্রেমপত্রগুলি পড়ে যায় অভিভাবকদের হাতে। এদিকে স্কুলের শেষ পরীক্ষাও শেষ। কলকাতায় এসে স্কটিশ চার্চ কলেজের বাংলা বিভাগে ভর্তি হওয়ার পর ক্লাস-ও শুরু হয়ে গেল। কলকাতায় কোনও পরিচিত ব্যক্তি ছিলেন না। একজন ছাড়া। তিনি রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। তাঁরই নামে হোস্টেলের রাস্তা। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর ২ বছর পরেই প্রয়াত হন তিনি। বাবার লাইব্রেরিতে তাঁর সম্পাদিত 'প্রবাসী' পত্রিকা অনেক দেখেছি। কলেজে নতুন বন্ধু হল শৈবাল মিত্র। সে একদিন নিয়ে গেল কফি হাউসে। সেখানে একজনের কাছে 'আউটসাইডার' উপন্যাসের নাম শুনে পাঁচ টাকায় কিনে ফেললাম কামু-র দু-দুটো বই।

৮

গুরুদাসবাবুর ক্লাস করতে খুব ভালো লাগত। তাঁর কণ্ঠস্বরে আকৃষ্ট না হয়ে উপায় ছিল না। রবীন্দ্রনাথের কথা বলতে গিয়ে সেই সময়ের শান্তিনিকেতনের কথা এমনভাবে বলতেন যে আমরা ছবির মতো দেখতে পেতাম। ওর মুখেই চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা শুনেছিলাম। তাঁর বিখ্যাত বই রবিরশ্মি একসময় রবীন্দ্রানুরাগীদের মুগ্ধ করেছিল।

স্যারের ক্লাসের পরে লাইব্রেরিতে গিয়ে বইটিকে নেড়েচেড়ে দেখেছিলাম। এই চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় হলেন আমাদের অধ্যাপক কনক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাবা।

কনক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো সুপুরুষ আমি খুব কম দেখেছি। ফর্সা, লম্বা, ছিপছিপে শরীর, পরনে সাদা ধুতি এবং পাঞ্জাবি। মানুষটির মুখে সবসময় হাসি লেগেই থাকত। তাঁর পাণ্ডিত্য নিয়ে কোনও প্রশ্ন ছিল না। আমার মাঝে মাঝে মনে হত কনকবাবু, গুরুদাসবাবু অথবা গৌরমোহনবাবুর মতো মানুষ যাঁরা বাংলা বা বিদেশি সাহিত্য সম্পর্কে চমৎকার ওয়াকিবহাল, যাঁরা অনায়াসে সাহিত্যের রসগ্রাহী বিশ্লেষণ করতে পারেন তাঁরা লেখেন না কেন? অনেক পরে জেনেছি, অধ্যাপক বা শিক্ষকরা ভালো সমালোচক হয়ে থাকেন। ছিদ্র সন্ধান করে

লেখককে নস্যাৎ করার মধ্যেই তাঁরা তৃপ্তি পেয়ে থাকেন। হাজার হাজার, বলা যেতে পারে আজ পর্যন্ত কয়েক লক্ষ অধ্যাপকের মধ্যে সাহিত্যস্রষ্টা হিসেবে দাগ কেটে যেতে পেরেছেন মুষ্টিমেয় কয়েকজন। আমার মাস্টারমশাই নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় এবং শঙ্খ ঘোষের জন্য বাঙালিপাঠক চিরকাল গর্বিত থাকবে। শৈবাল পরে অধ্যাপনা করেছে, কয়েকটি চমৎকার উপন্যাস-গল্প লিখেওছে। কিন্তু সেসময় আমায় বলেছিল, যেসব গানের মাস্টার গান শেখান তাঁদের সবাই বড় গায়ক হিসেবে জনপ্রিয় হন না। কেউ কেউ হন।

অনেকেই লেখেন, কেউ কেউ লেখক। জীবনানন্দ কবিতার ক্ষেত্রে যা বলেছেন তা সাহিত্যের অন্য বিভাগেও প্রযোজ্য। কিন্তু এই যে কেউ কেউ লেখক তাঁদের লেখায় কি থাকলে আলাদা করা হয়? গুরুদাসবাবু বললেন, 'বুঝহ রসিকজন যে জানো যেমন।'

এই গুরুদাসবাবু একদিন আমায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'ওহে তুমি কি কবিতা পড়ো?'

স্বীকার করলাম কবিতার প্রতি আমি আকৃষ্ট নই।

জিজ্ঞাসা করলেন, 'ছোটগল্প?'

'হ্যাঁ।' মাথা নেড়েছিলাম। তদ্দিনে আমি কয়েকটি ছোটগল্পের সংকলন পড়ে ফেলেছি। তাতে সুবোধ ঘোষের ফসিল, বিমল করের আত্মজা, রমাপদ চৌধুরীর তিতির কান্নার মাঠ ইত্যাদি অসাধারণ গল্প ছিল।

'পুনশ্চ পড়েছ? রবীন্দ্রনাথের অসাধারণ ছোটগল্পের বই। অবশ্য বইটিকে কাব্যগ্রন্থ বলা হয় কারণ কবিতার ফর্মে লেখা। কিন্তু প্রায় প্রতিটি কবিতাই একেকটি চমৎকার ছোটগল্প। পড়ে ফ্যালো।' গুরুদাসবাবু বলেছিলেন।

'পুনশ্চ' আমাদের পড়তে হবে দ্বিতীয় বর্ষে। তবু উদ্বুদ্ধ হয়ে বইটি নিয়ে গেলাম লাইব্রেরি থেকে। দেখলাম পুনশ্চের কবিতাগুলো লেখা হয়েছিল মোটামুটি ১৩৩৮ এবং ১৩৩৯ সালে। বলা ঠিক বেশিরভাগ কবিতাই ১৩৩৯-এ। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ তখন যথেষ্ট পরিণত বয়সে, মোটামুটি বাহাত্তর বছর বয়সে। ওই একবছরে অতগুলো দীর্ঘ কবিতা বোধহয় প্রতিভাবান কবিরাও লেখার কথা ভাবতে পারবেন না, লেখা দূরের কথা।

সেই রাতে পুনশ্চের কবিতাগুলো পড়তে পড়তে মনে হয়েছিল গুরুদাসবাবুর কথা খুব সত্যি। আমার মনে হচ্ছিল আমি ছোটগল্প পড়ছি। তখনও আমি লেখালেখির স্বপ্ন দেখিনি। কখনও লিখতে চেষ্টা করব এমন ভাবনা ভাবিনি। বাংলায় অনার্স নিয়ে পড়া একটি ছাত্র যেমন ভাবত, আমিও তাই ভাবতাম। এম এ পাশ করে গবেষণা শেষ করব। ভালো ফল হলে কোনও কলেজে নয়তো স্কুলে শিক্ষকতা করে জীবন কাটাবো। কিছু সহপাঠী রসিকতা করত, বাংলায় এম এ-দের আর একটা চাকরি চেষ্টা করলেই পাওয়া যায়। চিড়িয়াখানায় বাঘের ছালে নিজেকে মুড়ে সারাদিন দর্শকদের মনোরঞ্জন করতে হয়। কোনও ভয় নেই কারণ পাশের খাঁচার বাঘটিও যে বাংলায় এম এ। তা সে রাতে পুনশ্চর কবিতা পড়তে পড়তে মনে হচ্ছিল এসবই আমার জন্য লেখা। স্কুলে যে রবীন্দ্রনাথকে পড়েছি, নীপার জন্য যে 'শেষের কবিতা' পড়েছি তা থেকে এক মাইল আলাদা ওই কবিতাগুলো যা ছোটগল্পের মতো চমকপ্রদ। এই নির্বোধ তখন ভেবে ফেলল রবীন্দ্রনাথ যত বড় দার্শনিক হোন তিনি আমার মতো সাধারণ মানুষের জন্যও লিখতে পারতেন। বস্তুত, রবীন্দ্রনাথকে পাওয়ার তীব্র আগ্রহ মনে জন্মাল পুনশ্চ পড়ার পর থেকে।

পরের দিন ছিল কলেজ ছুটি। এমনই আচ্ছন্ন ছিলাম যে দুপুরবেলায় কাগজ কলম নিয়ে বসে ভাবলাম, রবীন্দ্রনাথ যা কবিতায় লিখেছেন তা যদি গদ্যে রূপান্তরিত করি তাহলে সেটাকে ঠিকঠাক ছোটগল্প বলা যাবে কি? কবিতায় ছোটগল্প নয়, গদ্যে ছোটগল্প। দুঃসাহস ভেতর থেকে এতটাই বেড়ে উঠেছিল যে সারা দুপুর ধরে অনেক কাটাকুটি করে একটি কবিতাকে গদ্যে ছোটগল্প বানিয়ে ফেললাম।

শৈশবে বা কিশোরকালে যা আমার কাছে মূল্যবান মনে হত তা সযত্নে রেখে দিতাম। সেটা লাল মার্বেল হোক অথবা মায়ের হাতের কাজ করা রুমালই হোক। এসবের কোনও মূল্য এখন নেই কিন্তু দেখলেই কীরকম আচ্ছন্ন হয়ে পড়ি। এত বছর পরে ওই লেখাটাকে খুঁজে পেলাম। লাইন টানা ছোট খাতায় লিখেছিলাম রবীন্দ্রনাথের কবিতার গল্পরূপ।

কলেজ খুললে খুব ভয়ে ভয়ে গুরুদাসবাবুকে ব্যাপারটা জানালাম। তিনি আমার মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, 'তুমি একটা সাদা ঘোড়ার গায়ে কালো লাইন এঁকে দিলে লোকে সেটাকে জেব্রা বলবে? গদ্যে লেখার হলে রবীন্দ্রনাথ নিজেই তা লিখতেন। যিনি গল্পগুচ্ছের অনবদ্য গল্পগুলো লিখতে পেরেছেন তাঁর মনে হয়েছে পুনশ্চর লেখাগুলো কবিতাতেই লেখা উচিত। উনি শিব গড়ে গিয়েছেন, তুমি তাকে বাঁদর গড়তে চাইছ? তাছাড়া এটা আইনত অপরাধ, কপিরাইট আইনে তোমার শাস্তি হবেই।' আর কথা বাড়াইনি। তখন রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবার্ষিকী প্রায় এসে গিয়েছে। ওঁর মৃত্যু হয়েছে মাত্র কুড়ি বছর আগে। মৃত্যুর তিন বছর পরে জন্মানো সতেরো বছরের একটি তরুণের যাবতীয় উৎসাহে জল ঢেলে দিয়েছিলেন গুরুদাসবাবু। বুঝেছিলাম, ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর গদ্যে রূপান্তরকরণে কোনও অন্যায় নেই কারণ তাঁর সৃষ্টিকর্মের দাবিদার (কপিরাইট আইনের সময় পার হয়ে যাওয়ায়) নেই। কিন্তু একটা ফর্ম থেকে আরেকটা ফর্মে রবীন্দ্ররচনাকে নিয়ে যাওয়া কেন অন্যায় হবে? এই যে বিভিন্ন রবীন্দ্র-উপন্যাস ছোটগল্প এমনকি কবিতা নিয়ে চলচ্চিত্র বা নাটক হচ্ছে যা রবীন্দ্রনাথ লিখে যাননি, তাদের তো কেউ কপিরাইট অ্যাক্ট ভাঙার জন্য কাঠগড়ায় তুলছে না বা শিবকে বাঁদর করা হচ্ছে বলছে না!

অতএব সেই গদ্যরচনাকে ছিঁড়ে ফেলতে খারাপ লেগেছিল বলে স্যুটকেশে তুলে রেখেছিলাম। এই একটা ব্যাপারের কথা ভাবলে আজ মজা লাগে। শৈশবে বা কিশোরকালে যা আমার কাছে মূল্যবান মনে হত তা সযত্নে রেখে দিতাম। সেটা লাল মার্বেল হোক অথবা মায়ের হাতের কাজ করা রুমালই হোক। এসবের কোনও মূল্য এখন নেই কিন্তু দেখলেই কীরকম আচ্ছন্ন হয়ে পড়ি। এত বছর পরে ওই লেখাটাকে খুঁজে পেলাম। লাইন টানা ছোট খাতায় লিখেছিলাম রবীন্দ্রনাথের কবিতার গল্পরূপ। কীরকম মমতা এল ঝাঁপিয়ে। আজ পড়তে গিয়ে সেই সতেরো বছরের একটি অলেখক তরুণকে

আবিষ্কার করেও কিন্তু মমতাকে সরিয়ে দিতে পারলাম না। আজ যখন কপিরাইট আইনের সময়সীমা পেরিয়ে গিয়েছে তখন সেই বয়সের প্রয়াসটিকে তুলে ধরছি, প্রশ্রয় পেলে ভালো লাগবে। লাইনটানা খাতার পাতার ওপরে লেখা, 'ক্যামেলিয়া'। তার নীচে সই নকল করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তার নীচে মূল কবিতার রচনাকাল, ২৭শে শ্রাবণ, ১৩৩৯। তার পাশে একুশে নভেম্বর, ১৯৬০।

সেদিন ট্রামে উঠেছিলাম কলেজ স্ট্রিট যাব বলে। ফাঁকা ট্রাম। জানলার পাশের আসনে বসতেই নজরে পড়ল সামনের সিটে বসা একজনের দিকে। পাশে বসে আছে একটি বালক। পিছন থেকে প্রথমে তার ঘাড়ের ওপর সযত্নে রাখা খোঁপা দেখতে পেলাম। তারপর সে একটু মাথা ঘোরাতেই মুখের একপাশের নিটোল রেখা চোখে পড়ল। সে কোলে রাখা একটি বই তুলে নিল। পিছন থেকে দেখলে মনে হচ্ছিল, আর একটু দেখি। তাই কলেজ স্ট্রিটে আমার নামা হল না। একটু অন্যমনস্ক হয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়েছিলাম, দেখি ওরা নেমে যাচ্ছে হিন্দ সিনেমার স্টপে। আমাকে নিয়ে ট্রাম চলল ধর্মতলার দিকে। কেন জানি না, মন অন্যরকম হয়ে গেল।

অদ্ভুত ব্যাপার, সবাই বলে আমি সময় হিসেব করে চলতে পারি না। কিন্তু কী অদ্ভুত ব্যাপার, ওরা যে ট্রামে আসে সেই ট্রামটিতে ঠিক উঠে পড়ি প্রায়ই। কিন্তু এগিয়ে গিয়ে কথা বলার ইচ্ছে প্রবল হওয়া সত্ত্বেও সাহস হয় না। আমরা নিছক সহযাত্রী। তার উজ্জ্বল চোখ, অনায়াসে কপাল পড়ে থাকা এক চিলতে চুল সুন্দর আঙুলে সরিয়ে নেওয়া দেখতে দেখতে ভাবতাম একটা ছুতো দরকার। যেটাকে আঁকড়ে ধরে আমি ওর কাছে পৌঁছে যেতে পারি। কত কী তো হতে পারে। কোনও গুণ্ডা যদি অপমান করে ওকে তাহলে আমি ঝাঁপিয়ে পরব সম্মান বাঁচানোর জন্য। যে-কোনও সমস্যা ওকে যদি বিব্রত করে তাহলে আমি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেব। কিন্তু আমার কপালটা যেন একটা ঘোলা জলের ডোবা, সেখানে নিরীহ ব্যাঙ একঘেয়ে ডাক ডেকে যায়। কুমির বা হাঙর দূরের কথা, রাজহাঁসও সাঁতার কাটে না।

সেদিন ট্রামটা এল ঠাসাঠাসি ভিড় নিয়ে। তবু উঠলাম। আর উঠলাম বলেই তাকে দেখতে পেলাম। কিন্তু আজ ওর পাশে ছোট ভাই নেই। তার বদলে বসে আছে একজন ট্যাশ বাঙালি। গলায় টাই আর মাথায় টুপি পরে বসে আছে সঙের মতো। সহ্য করতে পারছিলাম না লোকটিকে। মনে হচ্ছিল টুপিটাকে জানলা দিয়ে ছুড়ে ফেলে ওকে ঘাড় ধরে ট্রাম থেকে নামিয়ে দিই। কিন্তু ও কিছু অন্যায় না করলে এসব করলে লোকে আমাকেই অপরাধী ভাববে। এই সময় লোকটা একটা মোটা চুরুট ধরাল আয়েশ করে। সঙ্গে সঙ্গে ভিড় ঠেলে কাছে গিয়ে হুঙ্কার দিলাম, 'এ্যাই, ফ্যালো চুরুট'। যেহেতু এখনও সিগারেট চুরুট ট্রামে খাওয়া আইনবিরুদ্ধ হয়নি তাই লোকটা আমাকে পাত্তা না দিয়ে ধোঁয়া ওড়াতে লাগল রিং বানিয়ে। অতএব আমি একটানে মুখ থেকে চুরুট কেড়ে নিয়ে জানলা দিয়ে ছুড়ে ফেলে দিলাম। লোকটা কটমটে চোখে আমাকে দেখল। কিন্তু দেখার পর মুখ নিচু করে দ্রুত নেমে গেল ট্রাম থেকে। সে মুখ নামাল তার খাতার দিকে। খাতার ওপর লেখা তার নাম, কমলা। তার হাত কাঁপছিল এবং একবারও আমার দিকে তাকাল না। অন্যান্য যাত্রীরা বাহবা দিলেন, 'বেশ করেছেন ভাই।' কমলা উঠে দাঁড়াল। গম্ভীর মুখে নেমে গেল ট্রাম থেকে।

পরের দিন, তার পরেরও দিন এবং অনেকদিন ধরে কমলাকে দেখতে পেলাম না ট্রামে। সময় বদলেও দেখতে পেলাম না তাকে।

হাওয়া বদলাতে গেলাম দার্জিলিংয়ে। সেখানে দেখা হল মোহনলালের সঙ্গে। তার সঙ্গে ছিল খুব রোগা যে মেয়ে তার নাম তনুকা। মোহনলালের বোন। তার পড়াশুনায় খুব ঝোঁক, খাবারে নয়। যেদিন চলে আসব সেদিন তনুকা বলল, 'একটা জিনিস দেব আপনাকে। নেবেন। যখনই দেখবেন আমাদের কথা মনে পড়বে।'

সম্মতি জানাতেই সে বলল, 'খুব দামি গাছ, এদেশের মাটিতে যত্নে বাঁচে।'

'কী নাম গাছের?'

সে বলল, 'ক্যামেলিয়া।'

শুনে চমক লাগল। মনের অন্ধকার এক মুহূর্তে সরে গিয়ে কমলার মুখ চলে এল সামনে। বললাম, 'সহজে বুঝি এর মন মেলে না?'

তনুকা লজ্জা পেল। খুশিও হল।

টবে বসিয়ে সেই গাছ নিয়ে এলাম কলকাতায়। যত্নে রাখলাম। পুজোর ছুটিতে গেলাম সাঁওতাল পরগনায়। ছোট্ট জায়গা। আমার সঙ্গে আছে ক্যামেলিয়া। সেখানেই দেখা পেলাম কমলার। শিশুগাছের নীচে বসে বই পড়ছে। সে যে আমাকে চিনেছে তা বুঝলাম আমাকে লক্ষ করছে না বলে।

একদিন দেখলাম ওরা চড়ুইভাতি করছে। কমলার পাশে একটি যুবক, শর্ট পরা, গায়ে রেশমের বিলিতি জামা। চুরুট খাচ্ছে পা ছড়িয়ে। আর কমলা অন্যমনস্ক হয়ে টুকরো টুকরো করছে শ্বেত জবার পাপড়ি। পাশে পড়ে আছে একটি বিলিতি মাসিক পত্র।

মুহূর্তে অনুভব করলাম এখানে আমি বেমানান। কোনও প্রয়োজন নেই আমাকে। চলে যাব। যাওয়ার আগে অবাক হয়ে দেখি আমার টবের গাছে ফুল ফুটেছে। যে সাঁওতাল মেয়েটি আমার কাজকর্ম করে দেয় তাকে ডাকলাম। ভাবলাম ওর হাত দিয়ে শালপাতায় মুড়ে ফুলটাকে পাঠাব কমলার কাছে। মেয়েটি এসে হাসল, 'ডেকেছিস কেনে?'

অবাক হয়ে দেখলাম আমার ক্যামেলিয়া ফুল মেয়েটির কানের পাশে চুলের ওপর গোঁজা, কালো গাল যেন আলোয় আলোকিত।

হেসে বললাম, 'এমনি।' তারপর যোগ করলাম, 'এই জন্যেই।'

সেদিনই ফিরে এলাম কলকাতায়।

ক্রমশ

মুহূর্তে অনুভব করলাম এখানে আমি বেমানান। কোনও প্রয়োজন নেই আমাকে। চলে যাব। যাওয়ার আগে অবাক হয়ে দেখি আমার টবের গাছে ফুল ফুটেছে। যে সাঁওতাল মেয়েটি আমার কাজকর্ম করে দেয় তাকে ডাকলাম। ভাবলাম ওর হাত দিয়ে শালপাতায় মুড়ে ফুলটাকে পাঠাব কমলার কাছে।

বরণীয় লেখকের স্মরণীয় সঙ্গ

সবিতেন্দ্রনাথ রায়

। পর্ব ৭ ।

দাদাঠাকুর শরৎচন্দ্র পণ্ডিত

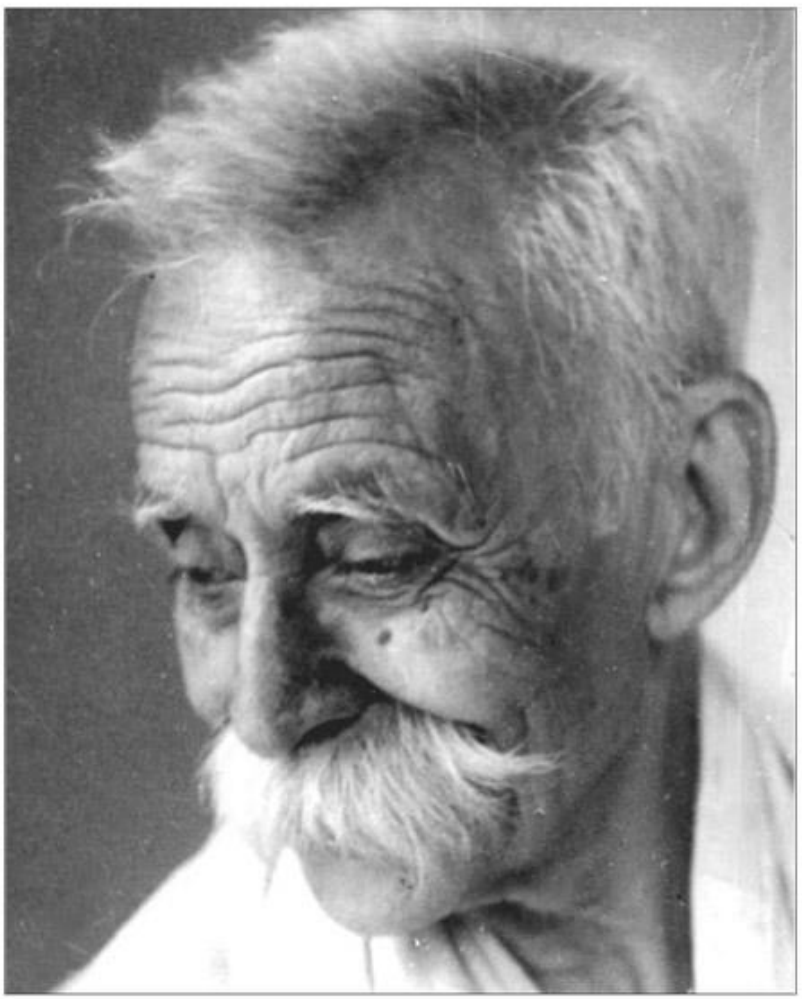

দাদাঠাকুরকে অবশ্য আমি বইপাড়ায় এসেই প্রথম দেখি। লেখকদের জমায়েতে, কখনও সভাতে। গানে সরস কথাবার্তায় মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখতেন সবাইকে।

একবার ১ বৈশাখে গিয়েছি ব্র্যাবোর্ন রোডে ভোলানাথ দত্ত কাগজ ব্যবসায়ীর দোকানে, হালখাতার জন্য টাকা জমা করতে। দেখি কাউন্টারের সামনে দাদাঠাকুর দাঁড়িয়ে। বলছেন, ওরে আমার টাকাটা নিয়ে একটা উশুল দে।

কাউন্টারের লোকেরা টাকা নেবে কী। তাঁকে আপ্যায়ন করতেই ব্যস্ত।

টাকা-পয়সার ব্যাপার চুকে গেলে বললাম, 'দাদাঠাকুর, কলেজ স্ট্রিট যাবেন তো?'

দাদাঠাকুরের এতক্ষণে আমার দিকে নজর পড়ল। বললেন, 'তোদের আড্ডায়? হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয় যাব।'

আমি বললাম, 'আমি একটা ট্যাক্সি ডেকে আনি।'

দাদাঠাকুর হাঁ হাঁ করে উঠলেন, 'দূর, ট্যাক্সি কী হবে? হেঁটে চলে যাব, দুটো দা আছে, কুড়ুল আছে সঙ্গে। ভয় কীসের, সব বাধা কাটতে কাটতে চলে যাব।'

কাউন্টারের ভদ্রলোক বললেন, 'দা, কুড়ুল কোথায় পাবেন দাদাঠাকুর?'

দাদাঠাকুর হেসে বললেন, 'আরে, দাদাঠাকুর, নামের মধ্যেই তো দুটো দা আর ঠাকুর একটু ওলট-পালট করলেই কুঠার।'

শরৎচন্দ্র পণ্ডিত স্বনামে যত না পরিচিত তার থেকে বেশি পরিচিত দাদাঠাকুর নামে। সর্বদা খালি পা, একটা খদ্দরের ধুতি, শীতকাল

দাদাঠাকুরকে নিয়ে নলিনীকান্ত সরকারের লেখা সুখ্যাত বইটির প্রচ্ছদ

হলে গায়ে একটা খদ্দরেরই উড়নি, এই হচ্ছে তাঁর সর্ব-সময়ের পোশাক। তিনি বাংলায় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের শেষতম বা একতম প্রতিনিধি। পোশাকে, তেজস্বিতায়, চরিত্রবলে সর্বরকমে। সুখে-দুঃখে এরকম স্থিতপ্রজ্ঞ মানুষ আমরা খুব কমই দেখি। তেজ-রসিকতার এক অফুরন্ত প্রবাহ তিনি সর্বদা বয়ে নিয়ে চলতেন নিজের মধ্যে।

১৮৮১ সালের ২৭ এপ্রিল, বাংলা ১২৮৮ সালের ১৩ বৈশাখ বীরভূমের সিমলাদ্দি গ্রামে মাতুলালয়ে তাঁর জন্ম হয়। জন্ম দরিদ্র পরিবারে, কিন্তু দারিদ্র্যের জন্য কোনও মনোবেদনা বা কষ্ট তাঁকে কোনওভাবে দুর্বল করতে পারেনি। এন্ট্রান্স পাশ করার পর অর্থাভাবে আর উচ্চশিক্ষা হয়নি। কিন্তু সেজন্য কারও কাছে হাত পাতেননি। সামান্য সম্বল নিয়ে একটি ছাপাখানা স্থাপন করেন জঙ্গিপুরে।

বাল্যকালেই পিতা-মাতাকে হারিয়ে ছিলেন দাদাঠাকুর। পিতৃব্য রসিকলালের কাছেই তিনি বড় হয়ে ওঠেন। রসিকলালের উপদেশ ও আদর্শ তাঁর জীবন ও চরিত্রগঠনে সহায়ক হয়েছিল। এইসঙ্গে ছিল শরৎচন্দ্রের অমিত ধীশক্তি ও স্মৃতিশক্তি। আর তাঁর স্বরচিত গান গাইবার অপূর্ব ক্ষমতা।

তখনকার দিনে আধুনিক চিকিৎসা তো ছিলই না। সংস্কারবদ্ধ মানুষ গ্রামে অসুখ-বিসুখ দেখা দিলে চিকিৎসা বা স্বাস্থ্য সম্পর্কে নিয়মকানুন মানা অপেক্ষা যাগযজ্ঞ হরি-সংকীর্তনে বেশি জোর দিত। এসবে ছোটবেলা থেকেই দাদাঠাকুরের বীতরাগ ছিল। গ্রামে একবার কলেরা দেখা দিয়েছে। বলাবাহুল্য, হরি-সংকীর্তনের দল সক্রিয় হয়ে উঠল,

—ভাই, হরি বল দুই বাহু তুলে
শমন দমন যাতে হবে রে!'

এমন সংকীর্তন দলের পিছনে একটি কচি-কণ্ঠে গান শোনা গেল—

একটা বর্মি, দুটো দাস্ত
করতে পারবে বরদাস্ত, ভাইরে!
দেখিতে দেখিতে নাড়ি নাই রে
ভাই হরি বল দুই বাহু তুলে...

কীর্তন দলের রোষান্বিত দৃষ্টি কিশোর গায়কের প্রতি পড়তেই সে দ্রুত সংকীর্তন দল ছেড়ে পালাল।

এই ভড়ং ও সুবিধাবাদের বিরুদ্ধে দাদাঠাকুরের জেহাদ ছিল আমরণ। তিনি দারিদ্র্যের জন্যই গ্রীষ্মে এবং শীতেও স্বল্পাবাসে অভ্যস্ত ছিলেন। তখন তাঁর মধ্যজীবন। কোনও একটি মজলিশে, শীতের সন্ধ্যায় এক ব্যক্তি তাঁকে বলে বসেন, শরৎবাবু এই শীতেও আপনার গায়ে গরম জামা নেই। এত গরম কীসের আপনার?

তখন তামার পয়সার চল ছিল। ভাগ্যক্রমে দাদাঠাকুরের ধুতির ট্যাকে একটা তামার পয়সাও ছিল। প্রশ্নের জবাবে দাদাঠাকুর তৎক্ষণাৎ পয়সাটি বার করে দেখালেন, বললেন, পয়সার গরম মশাই, পয়সার গরম!

প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর আরও পড়াশুনোর ইচ্ছে ছিল দাদাঠাকুরের। বর্ধমান রাজ কলেজে এফ এ পড়বার জন্য ভর্তি হলেন। কলেজের মাইনে না লাগলেও পড়াশুনোর বাকি জিনিস— বই খাতাপত্র প্রভৃতি তো আর বিনা পয়সায় হয় না। দাদাঠাকুর কলেজের পড়া ছেড়ে অর্থোপার্জনে মন দিলেন। ছাপাখানা সম্বন্ধে তাঁর কোনও পূর্ব অভিজ্ঞতা না থাকলেও, মনের জোরেই শুধুমাত্র তিনি ছাপাখানা বসানোর কাজে নামলেন।

কলকাতায় তখন কাগজ-ব্যবসায়ী ভোলানাথ দত্তের অপ্রতিহত ব্যবসা। টিটাগড় পেপার মিলের সবথেকে বড় এজেন্ট। আসাম, অবিভক্ত বাংলা থেকে উত্তরপ্রদেশ পর্যন্ত ভোলানাথ দত্তের ব্যবসা চলে। ভোলানাথ দত্তের বিজ্ঞাপন দেখা যায় পাঁজিতে, স্টেশনের হোর্ডিং-এ। দাদাঠাকুরের বয়স তখন একুশ-বাইশ। তিনি ভোলানাথ দত্তকে একটি জোড়া পোস্টকার্ডে লিখলেন— 'আমার মাত্র পঞ্চাশ টাকা পুঁজি, এই সামান্য অর্থে একটি প্রেস আর তার আনুষঙ্গিক সাজসরঞ্জাম মিলতে পারে কি? যদি সম্ভব হয়, অনুগ্রহ করে পত্রোত্তরে জানাবেন, আমি নিজে গিয়ে প্রেসটি নিয়ে আসব। আমি কখনও কলকাতায় যাইনি, হোটেলেও খাইনি। যদি কলকাতায় যাওয়া হয়, তাহলে রাত্রিতে থাকার মতো কোথাও একটু স্থানের ব্যবস্থা হতে পারে কি?'

দক্ষ কাগজ ব্যবসায়ী ভোলানাথবাবু মানুষ চিনতেন। দাদাঠাকুরের পোস্টকার্ডের মধ্যেই তিনি খাঁটি কাজের মানুষটির সন্ধান পেলেন। ভোলানাথবাবু একটি কাঠের পুরনো প্রেস এবং ছাপাখানার কিছু সরঞ্জামের খোঁজ পেয়ে দাদাঠাকুরকে চিঠি দিলেন। ভোলানাথবাবুর মধ্যম পুত্র সমবয়সী রঘুনাথবাবুর সঙ্গে দাদাঠাকুরের সখ্য হয়। ছাপাখানা সম্বন্ধে দাদাঠাকুরের অনভিজ্ঞতা জেনে তিনি একটা 'প্রিন্টার্স গাইড' বই কিনে দাদাঠাকুরকে দিলেন। সেই বই ও ৪৬ টাকায় কাঠের ছাপাখানা কিনে দাদাঠাকুর দেশে ফিরে এলেন। শুরু হল দাদাঠাকুরের ছাপাখানা। সেই ১৯০২ সালে।

দাদাঠাকুরের ভাবশিষ্য, পরবর্তীকালে তাঁর কর্মসঙ্গী নলিনীকান্ত সরকারের 'দাদাঠাকুর' বই থেকে এসব তথ্য পাই।

নলিনীকান্ত সরকারের সঙ্গে দাদাঠাকুর শরৎচন্দ্রের পরিচয় ছাপার সূত্রেই। নলিনীকান্ত জঙ্গিপুরে আছেন তখন। একটা নিমন্ত্রণপত্র ছাপানোর প্রয়োজন হল নলিনীকান্তের। তখন সে অঞ্চলে কোনও ছাপাখানা ছিল না। শুনলেন ভাগীরথীর অপরপারে দফরপুরে শ্রী শরৎচন্দ্র পণ্ডিত নামের এক ব্যক্তির একটি প্রেস আছে।

নলিনীবাবুর গরজ বেশি। তিনি ভাগীরথী পেরিয়ে দফরপুরে গিয়ে প্রেসটি খুঁজে বের করলেন। প্রেস-বাড়ির সামনে একটি গ্রাম্য লোককে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'শরৎচন্দ্র পণ্ডিত মশাই বাড়িতে আছেন কি?'

গ্রাম্য লোকটি উত্তর দিলেন, 'আমিই শরৎ পণ্ডিত। কী দরকার?'

শরৎ পণ্ডিতের বেশভূষা দেখে নলিনীকান্ত অবাক!

> আমার এই ছাপাখানার আমি প্রোপাইটর, আমি কম্পোজিটার, আমি প্রুফরিডার, আমিই ইনকম্যান। কেবল প্রেস-ম্যান আমি নই, সেটি ম্যান নয়, উওম্যান। ছাপানোর কাজে আমার ব্রাহ্মণী আমায় সাহায্য করেন।

প্রেসের মালিকের এমন পোশাক-আশাক! গায়ে নয় জামা নেই, চরণ দুটিও যে খালি।

যাই হোক, নলিনীবাবু তাঁর নিমন্ত্রণ পত্রের কপিটি দাদাঠাকুরের হাতে দিয়ে বললেন, 'আমি এইটে ছাপাতে চাই।'

দাদাঠাকুর নিমন্ত্রণপত্রটি দেখে বললেন, 'ছেপে দিতে পারি ভাই, কিন্তু আমার ছাপাখানা হালফ্যাশানে ছাপাখানা নয়। ছাপা দেখে শেষে খুঁতখুঁত কোরো না।'

দাদাঠাকুর তাঁকে কতকগুলি ছাপার নমুনা দেখালেন। ছাপাখানাও দেখালেন। তখন তো হাতে টাইপ গেঁথে গেঁথে কম্পোজ করে ছাপানোর যুগ। আজকালকার কম্পিউটার কম্পোজ ওঠেইনি। কাঠের র‍্যাকের ওপর কাঠের খোপ করে টাইপ সাজানো থাকত। তাই থেকেই টাইপ তুলে তুলে কম্পোজ হত।

কিন্তু দাদাঠাকুরের ছাপাখানা দেখে তো নলিনীবাবুর চক্ষুস্থির। কাঠের র‍্যাক কই! মাটির মেঝেতে ঠিক কাঠের কেসের মতো সারি সারি গর্ত করে ছোট ছোট মাটির ভাঁড় বসানো, তার মধ্যে টাইপ রাখা যেমন কাঠের খোপে থাকে।

দাদাঠাকুরের কথা— 'ওই একই হল, কাঠের কেস-এর ভেতর থেকে টাইপ না তুলে মেঝের ওপরে ফোকরে রাখা ভাঁড় থেকে তোলা। আমার এই ছাপাখানার আমি প্রোপাইটর, আমি কম্পোজিটার, আমি প্রুফরিডার, আমিই ইনকম্যান। কেবল প্রেস-ম্যান আমি নই, সেটি ম্যান নয়, উওম্যান। ছাপানোর কাজে আমার ব্রাহ্মণী আমায় সাহায্য করেন। কম্পোজ করে প্রুফ আমিই তুলি, আমিই সংশোধন করি। তারপর ওই কম্পোজ করা বস্তুটিকে একটি ফ্রেমে শক্ত করে এঁটে একখানা মোটা লোহার স্টোনের ওপর রেখে তাতে কালি মাখিয়ে দিই। কালি মাখানোর কাজ করেন গৃহিণী। এইবারে তার ওপর বেশ চারধার সমান করে কাগজ বসিয়ে গদি চাপা দিই। তারপর হাতল টেনে চেপে ছাপ তুলি। একখানা ছাপা হলে ব্রাহ্মণী আবার কালি মাখান রোলারে, তখন আবার কাগজ বসিয়ে গদি চাপানো। আবার একখানা ছাপা। এভাবে একশো বলো আর দুশো-পাঁচশো বলো, ছাপা হয়ে যায়।'

এই অদ্ভুত চরিত্রের দৃঢ়বল মানুষটিকে দেখে নলিনীকান্ত সরকার মশাই মুগ্ধ হয়ে যান। শেষপর্যন্ত তাঁর ছাপাখানার সহকারী হয়ে যান। তাঁর সারাজীবন দাদাঠাকুর সাহচর্যের ফল 'দাদাঠাকুর' গ্রন্থটি। তাতেই শরৎচন্দ্র পণ্ডিতের জীবন-সংগ্রামের কথা জানা যায়।

দাদাঠাকুর যখন 'জঙ্গিপুর সংবাদ' পত্রিকাখানি বার করলেন, তখন ছাপাখানার পরিবর্তন করা আবশ্যক হয়ে পড়ল। একটা উন্নত ধরণের প্রেস-যন্ত্রের প্রয়োজন। সামান্য কিছু অর্থ সঞ্চয় করে কলকাতার একটি প্রতিষ্ঠানে গেলেন— সেখানে পুরনো ছাপার মেশিন বিক্রি হয়।

প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাটির ঘর সন্ধান করে ঢুকে পড়ে দেখলেন— কর্মকর্তাটি একজন সাহেব। দাদাঠাকুর তাঁকে গুডমর্নিং বলে সম্ভাষণ করতে সাহেব চমৎকৃত হয়ে দেখেন— 'এক অদ্ভুত বাঙালি মূর্তি— খালি পা, খালি গা, হাঁটুর ওপরে কাপড়, কোঁচার কাপড় কোমড়ে বেড় দিয়ে জড়িয়ে বাঁধা, একহাতে টিনের চোঙার মতো একটা বাক্স, অন্য হাতে কলিকাশীর্ষ হুঁকা, বগলে ছাতা।

চেহারা দেখে সাহেবের চক্ষুস্থির। সাহেব জিজ্ঞেস করলেন, 'Are you coming from jungle?'

ইংরিজিতেই দাদাঠাকুর জবাব দিলেন, 'ঠিক ধরেছ, আমি জঙ্গল থেকেই আসছি। (অর্থাৎ জঙ্গিপুর থেকে) তোমার বুদ্ধির তারিফ করি সাহেব।'

সাহেব এবার জিজ্ঞেস করলেন, 'কী করো তুমি?'

'আমি একখানা জংলি কাগজের জংলি এডিটর। একটা পুরনো প্রেস-যন্ত্র কিনতে এসেছি।'

সাহেব দাদাঠাকুরের প্রতি আকৃষ্ট হলেন। সপ্রতিভ, খাসা কথা কয়। দাদাঠাকুরকে আসন গ্রহণ করতে বলে আলাপ শুরু করলেন সাহেব।

কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর, সাহেব দাদাঠাকুরের টিনের বাক্সটির প্রতি আঙুল দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার হাতে ওটি কী?'

দাদাঠাকুর বললেন, 'এটি আমার স্মোকিং অ্যাপারেটাস।'

চমকিত হয়ে সাহেব দেখতে চাইলেন কীভাবে এটি কাজ করে। তখন দাদাঠাকুর বাক্সটির দুই প্রান্ত খুলে দেখালেন— একটির মধ্যে গুড়মিশ্রিত তামাক আরেকটির মধ্যে কালো টিকে, চোঙার মাঝখানে চকমকি, লোহা আর শোলা।

সাহেবের কৌতূহল মেটাবার জন্য এভাবে ভারতীয় পদ্ধতিতে তামাক সেবনের প্রয়োগ-পদ্ধতি বোঝালেন। উপকারিতাও। সাহেব এতে সন্তুষ্ট নন। বললেন, 'তুমি একবার সবটা করে দেখাও।'

দাদাঠাকুর তখন চকমকি ঠুকে শোলায় আগুন ধরিয়ে হুঁকোয় তামাক-টিকে প্রস্তুত করে হুঁকোয় টান দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে হুঁকোর ডাবার ভেতর থেকে জলতরঙ্গের আওয়াজ উঠল। দীর্ঘ টান দিয়ে সাহেবের সামনে ধোঁয়া ছাড়লেন দাদাঠাকুর।

সাহেব সব দেখে অবাক। বললেন, 'তুমি দেখছি বাঙালি বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন।'

দাদাঠাকুর আরও বোঝালেন— এইরকম ধূমপান কতখানি স্বাস্থ্যসম্মত। তামাকের ধোঁয়া নল বেয়ে নিকোটিনমুক্ত হতে হতে ডাবার জলে পরিশুদ্ধ হয়ে তামাকুসেবীর মুখে পৌঁছয়।

সাহেব সব দেখে মুগ্ধ হয়ে বললেন, 'দেখি, আমি একবার চেষ্টা করে দেখি।'

দাদাঠাকুর সাহেবের হাতে লোহা, শোলা আর চকমকি পাথর দিয়ে কায়দাটা বেশ ভালো করে শিখিয়ে দিলেন। কিন্তু এসব জিনিস রপ্ত করা সহজ নয়। কয়েকবার চেষ্টা করেও সাহেব পারলেন না, তবে ছাড়বার পাত্র নয় সাহেব। শেষপর্যন্ত শোলার মুখে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সাহেবের জয়োল্লাস। আনন্দের আতিশয্যে তিনি দাদাঠাকুরকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর গুদামঘরে ঢুকলেন। 'দ্যাখো তোমার কী প্রেস-মেশিন পছন্দ।'

একটা ভালো মেশিন দেখিয়ে সাহেব সেটাই দাদাঠাকুরকে নেওয়ানোর জন্য ঝুলোঝুলি করতে লাগলেন। দাদাঠাকুর নেবেন না। তাঁর পুঁজি মেশিনের

পণ্ডিত প্রেসে ছাপা বই

যোগীন্দ্রনারায়ণ পঁচিশ হাজার টাকা দিতে চেয়েছিলেন, যাতে দাদাঠাকুর জঙ্গিপুর সংবাদ কাগজটি ঢেলে সাজান। দাদাঠাকুর রাজি হননি। সবিনয়ে বলে দিলেন, 'মহারাজ, আমার অনেকদিনের সাধ আপনার মতো বড়লোক হব। কিন্তু আপনারই টাকা নিয়ে আপনার মতো বড়লোক হব তা তো হয় না মহারাজ।...'

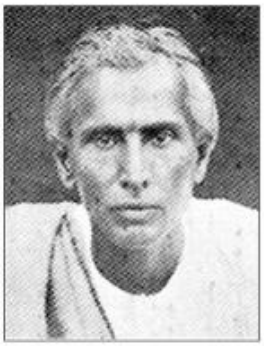

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ডঃ বিধানচন্দ্র রায়

দামের সিকিভাগ মাত্র। সাহেব ধারে দিতে চাইলেন। বললেন, দাদাঠাকুর তাঁর সুবিধেমতোই টাকা দেন। কোনও দলিল লেখাপড়া দরকার নেই।

কিন্তু দাদাঠাকুর রাজি হলেন না। ক্ষমতার বাইরে যাওয়া বা কাজ করা তাঁর স্বভাব-বিরুদ্ধ। শেষে সাহেব নিজেই সন্ধান করে ১০০ টাকায় একটি প্রেস-মেশিন দেখলেন এবং দাদাঠাকুরকে নিজের গাড়ি করে সেখানে নিয়ে গিয়ে প্রেস-মেসিনটি কিনে দিলেন।

এই ছাপাখানায় দাদাঠাকুরের 'জঙ্গিপুর-সংবাদ' ও 'বিদূষক' পত্রিকা ছাপা হত। জায়গাটির নাম রঘুনাথগঞ্জ।

এইমাসেই নলিনীকান্ত সরকার দাদাঠাকুরের ছাপাখানায় সহকারীরূপে যোগ দেন।

রঙ্গ-রসিকতায় অসামান্য ক্ষমতার জন্য ধনী জমিদার-সম্প্রদায় দাদাঠাকুরকে পছন্দ করতেন। একবার লালগোলার মহারাজা যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় দাদাঠাকুরকে লালগোলায় আমন্ত্রণ করেন। লালগোলা তখন জঙ্গিপুর মহকুমার অন্তর্গত। জঙ্গিপুর-রঘুনাথগঞ্জ স্থানটি মহারাজার কাছে অপরিচিত নয়। মহারাজা কথায় কথায় রঘুনাথগঞ্জের এক জমিদারবাবুর নাম উল্লেখ করে জিজ্ঞেস করলেন, 'দাদাঠাকুর, আপনার বাড়ি কি ওই জমিদারবাবুর বাড়ির কাছে?'

দাদাঠাকুর উত্তর দিলেন, 'না মহারাজ, আমার বাড়ির কাছেই ওঁর বাড়ি।'

যোগীন্দ্রনারায়ণ তাঁকে তখনকার দিনে পঁচিশ হাজার টাকা দিতে চেয়েছিলেন, যাতে দাদাঠাকুর তাঁর জঙ্গিপুর সংবাদ কাগজটি ঢেলে সাজান। দাদাঠাকুর রাজি হননি। সবিনয়ে বলে দিলেন, 'মহারাজ, আমার অনেকদিনের সাধ আপনার মতো বড়লোক হব। কিন্তু আপনারই টাকা নিয়ে আপনার মতো বড়লোক হব তা তো হয় না মহারাজ। তবে আপনার এ অনুগ্রহ আমার চিরদিন মনে থাকবে।'

দাদাঠাকুর তাঁর ছাপাখানা থেকে 'জঙ্গিপুর-সংবাদ' ছাড়াও 'বিদূষক' পত্রিকা বার করেন ১৩২৯ সালের মাঘ মাসে। ওপরে সংখ্যার নাম— প্রথম সংখ্যা দ্বিতীয় সংখ্যার পরিবর্তে ছাপা হত প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় বর্ষ ইত্যাদি। কাগজটির ওপর আরও ক-টি কথা ছাপা থাকত— 'ধামাধরা উদারপন্থী দলের সাপ্তাহিক মুখপত্র', বিদূষকের সেবাইত— শ্রীশরৎচন্দ্র পণ্ডিত। মলাটের ওপরে থাকত এক বিদূষকের কার্টুন চিত্র। তার কপালে 'দুঃখ', বক্ষে 'দুরাশা', আর পেটের ওপরে 'উদর রে তুঁহু মোর বড়ি দুশমন' লেখা।

এ পত্রিকাটির তিনি লেখক, তিনি কম্পোজিটর, তিনি মুদ্রাকর, তিনি প্রকাশক, আবার তিনিই কাগজখানির হকার। রঘুনাথগঞ্জে তাঁর পণ্ডিত প্রেসে ছেপে কাগজখানি কলকাতায় এনে ফিরি করে বিক্রি করতেন। অদ্ভুত মানুষ, বিচিত্র তাঁর কীর্তিকলাপ। সপ্তাহের বিশেষ বিশেষ সংবাদ থাকত কবিতায়, ছড়ায়। রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্মনীতি প্রভৃতি নিয়ে রঙ্গব্যঙ্গাত্মক কবিতা কাগজখানিকে খুব উপভোগ্য করে তোলে।

এইসময় তাঁর ছাপাখানার আরেক অভিনব উপহার 'বোতল-পুরাণ'। তিনি কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় তাঁর 'বিদূষক' ও 'বোতল পুরাণ' বিক্রি করতেন বাঙালি-অবাঙালি সকলের কাছে। বড়বাজার অঞ্চলে যখন 'বোতলপুরাণ' ফেরি করতেন, তখন গাইতেন—

কালা এইসা বোতলমে লাল রঙকা মাল।
দো আনা পৈসা দেকে পেয়ালামে ঢাল।।'
ইসমে নেহি দারু
খালি হ্যায় মিঠি ঝাড়ু
পীকে শায়েস্তা হোগা শারাবী মাতাল।।
দো আনা পৈসা দেকে পিয়ালামে ঢাল।।

বোতলের আকারে কালোরঙের মোটা কাগজ কেটে তারই মলাট আর তার ভেতরে লালরঙের কাগজে মাতালদের উদ্দেশে ছাপানো একটি কবিতা। দেখতে ঠিক যেন একটি বোতল। বোতল পুরাণের দাম ছিল দু'আনা।

আগেই বলেছি, দাদাঠাকুর রঙ্গ-রসিকতার ক্ষমতা ও অপূর্ব ব্যক্তিত্বের জন্য ধনী-জমিদার শ্রেণীর মানুষদের কাছে প্রিয় ছিলেন। কালকাতায় কংগ্রেসের Big 5 যাঁদের বলা হত তাঁদের সঙ্গেও দাদাঠাকুরের ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল প্রখ্যাত আইনজীবী ও অ্যাটর্নি নির্মলচন্দ্র চন্দ্রের মারফতে ও ৩৮ নম্বর কর্নওয়ালিস স্ট্রিটে গজেন্দ্রচন্দ্র ঘোষের আড্ডায়। গজেন্দ্র ঘোষের আড্ডায় বাংলার বিশিষ্ট গুণীজন আসতেন। দাদাঠাকুর এখানে আসতেন তাঁর 'বিদূষক' বিক্রির খুচরো পয়সাগুলি গজেন্দ্র ঘোষের সহধর্মিণীর কাছে দিয়ে টাকা-আধুলি করে নিতেন। গজেন ঘোষের সহধর্মিণী দাদাঠাকুর এলেই লুচি-তরকারি খাওয়াতেন। দাদাঠাকুর এখানে এলেই অনেক সময়ে সুর করে গাইতেন 'আল্লা দে আটখানা,' 'আল্লা দে আটখানা'। লোকে ভাবত কোনও মুশকিল আসান আহ্লাদে আটখানা হয়ে সান্ধ্যভজন গাইছে।

এখান থেকেই নির্মলবাবুর সঙ্গে দাদাঠাকুরের ঘনিষ্ঠতা ও আগে যে Big 5-এর উল্লেখ করেছি— বিধান চন্দ্র রায়, তুলসী গোস্বামীদের সঙ্গে আলাপ ও ঘনিষ্ঠতা। কথা সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গেও আলাপ এখানে।

কিন্তু যত বড় মানুষই হন, দাদাঠাকুরকে কেউ কোনও বিদ্রূপ বা ব্যঙ্গ করলে ছেড়ে কথা কইতেন না। কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র একদিন দেখা হতে জিজ্ঞেস করলেন, 'তারপর বিদূষক শরৎচন্দ্র, কেমন চলছে টলছে।'

দাদাঠাকুর উত্তর দিলেন, 'আর কী বলব চরিত্রহীন শরৎচন্দ্র, একরকম করে কেটে যাচ্ছে।'

বিধানবাবু নির্মলচন্দ্র বাবুর বাড়ির আড্ডায় দাদাঠাকুরকে বলেছিলেন, 'শরৎ, এই বয়সে আর খালি পায়ে ঘুরো না, কোথায় কেটে-টেটে গিয়ে গ্যাংগ্রিন হয়ে মরবে।'

দাদাঠাকুর বিধানবাবুর পায়ের জুতোর দিকে চেয়ে বললেন, 'কী করি বল, তোমার কপালে জুতো আছে, তুমি জুতো পরছ, আমার কপালে জুতো নেই, তাই আমার খালি পা।'

দাদাঠাকুর বিধানবাবুর পায়ের জুতোর দিকে চেয়ে বললেন, 'কী করি বল, তোমার কপালে জুতো আছে, তুমি জুতো পরছ, আমার কপালে জুতো নেই, তাই আমার খালি পা।'

আগে বলেছি, নির্মলবাবু ছিলেন বিখ্যাত অ্যাটর্নি। তিনি দাদাঠাকুরের সঙ্গে পরিচয়ে এমনই তৃপ্ত হলেন যে সনির্বন্ধ অনুরোধ করলেন, 'বিদূষক' ফেরি করে বিক্রির ফাঁকে যেন প্রতিদিন নির্মলবাবুর বাড়ি একটু জলযোগ করে যান। বিকেলবেলা অফিসের বাবুদের বাড়ি ফেরার সময়ে 'বিদূষক' বিক্রির ভালো সময়। সেই সময়টা জলযোগে নষ্ট করতে রাজি নন দাদাঠাকুর, তবু নির্মলচন্দ্রের সনির্বন্ধ অনুরোধে রাজি হতে হল।

নির্মলচন্দ্রের মাতৃদেবী একদিন একটি ব্রত উপলক্ষে তাঁকে নৈশভোজনে নিমন্ত্রণ করলেন। নৈশভোজনের পর শরৎচন্দ্রের বাড়ি ফেরার জন্য তিন টাকা গাড়িভাড়া দিতে বললেন মাতৃদেবী। নির্মলচন্দ্রের বাড়ি ওয়েলিংটনে, দাদাঠাকুর থাকেন বাগমারিতে। দাদাঠাকুর তিন টাকা ট্যাঁকস্থ করে হেঁটেই বাড়ি ফিরলেন।

পরে আরেকদিন এরকম নৈশভোজনের পর নির্মলচন্দ্র দাদাঠাকুরকে তিন টাকা দিলেন। তার আগে দাদাঠাকুর নির্মলবাবুর বাড়িতে জমায়েতের মধ্যেই কীভাবে গাড়িভাড়াটা ট্যাঁকস্থ করেছেন বর্ণনা করেছেন। এবারও তিন টাকা হাসিমুখে নিলেন। বাড়ি থেকে বেরতেই নির্মলবাবু পরিচারককে বলে একটা ট্যাক্সি ডেকে দাদাঠাকুরকে তাতে তুলে দিলেন। পরদিন গজেন ঘোষের আড্ডায় নির্মলবাবু বলছেন সরস করে, 'ট্যাক্সিতে তুলে দিয়ে কেমনভাবে জব্দ করেছেন দাদাঠাকুরকে'।

নির্মলবাবুর বলা শেষ হতেই দাদাঠাকুর বললেন— 'আমিও মেডিক্যাল কলেজের সামনে নেমে ট্যাক্সিওলাকে আটআনা দিয়ে বিদায় করেছি। আড়াই টাকা লাভ! এবার অঙ্ক কষে দেখ হিসেব করে, কত পারসেন্ট ঠকিয়েছ আর কত ঠকেছ।'

নির্মলচন্দ্রের বাড়িতে দুর্গাপুজোর সময়ে সবাই এসেছেন। রসরাজ অমৃতলাল বসু এসেছেন। দাদাঠাকুরও আছেন। কংগ্রেসি অনেক নেতাও আছেন। খদ্দর পরা নিয়ে উত্তেজিত আলোচনা চলছে। নির্মলচন্দ্র বলছেন, 'খদ্দর কিনে দিলেও হারামজাদা-হারামজাদিরা মোটা বলে গায়ে ঠেকায় না।' রসরাজ অমৃতলাল আবহাওয়া হালকা করার জন্য এই বিষয় নিয়েই দাদাঠাকুরকে অনুরোধ করলেন একটা গান গাইবার জন্য। নির্মলবাবুও বললেন এই আলোচনার বিষয় নিয়েই গাইতে।

জমায়েতের সামনে বড় উঠোন। সেই উঠোনে নেমে দাদাঠাকুর গাইতে শুরু করলেন—

দুটো মনের কথা বলি তোরে ও মা জগদম্বে!

প্রথম লাইনটি শুনেই রসরাজ অমৃতলাল বললেন— সেরেছে। এবার তো 'জগদম্বে'র সঙ্গে মিল খুঁজে মরবে ব্যাটা!

কিন্তু দাদাঠাকুর অপরাজেয়। গাইতে শুরু করলেন—

দুটো মনের কথা বলি তোরে ও মা জগদম্বে!
বল্ দেখি এই দীনের দুঃখ কোন্ কালে মা কমবে?
যত পাওনাদারে লাগায় ল্যাঠা
তাই পালিয়ে এসেছি ক্যালকাটা,
হেথায় যদি ধরে ব্যাটা পালাবো মা বম্বে।
শুনো মাগো দশভুজা
আমি সেদিন করবো তোমার পূজা
যেদিন নামবে মা অভাবের বোঝা
লক্ষ টাকা জমবে। (নির্মলের মতো)
দেশের দুঃখ দেখে গাঁধি
পরতে বলে গেছেন খাদি
যত হারামজাদা হারামজাদি
ঠেকায় না নিতম্বে।। (মোটা বলে)

গান শেষে উঠে আসছেন, অমৃতলাল 'বাঃ' বলে বাহবা দিয়ে বললেন— আরেকটা কলি গাইতে পারিস বাবা ওই মিল বজায় রেখে?

দাদাঠাকুর উঠোনে নেমে আবার আরম্ভ করলেন—

যদি কষ্ট দেওয়াই মনে থাকে,
আর কেন রাখিস আমাকে,
ডেকে নে মা শেষের ডাকে,
কাজ কী আর বিলম্বে?

এরপর রসরাজ অমৃতলাল দাদাঠাকুরকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

এই সদা হাসিখুশি মানুষটির পুত্র মারা যায় যখন, কী শান্তভাবে জানাচ্ছেন প্রতিবেশীদের, এতদিন তো চেষ্টা করে ঠেকিয়ে রেখেছিলাম, যমকে, বেটা শেষকালে পেনাল্টিতে গোল দিয়ে দিলে।

যখন দাদাঠাকুর এই কথা বলছেন, তখনও স্ত্রী পুত্রশোকে ঘরের ভেতর কেঁদে চলেছেন।

কলকাতা বেতারকেন্দ্র সরকারি হওয়ার আগে নাম ছিল— 'ইন্ডিয়ান ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশন'। এখানে ছোটদের বৈঠক ও পল্লীমঙ্গল আসরে দাদাঠাকুর নিয়মিত অংশ নিতেন। কথা নিয়ে অনায়াসে খেলা করতেন। বিষয়টা ছিল প্রশ্নের মধ্যেই উত্তর— যেমন,

প্রশ্ন- সংসারটা কার বশ? উত্তর-সংসার টাকার বশ।
প্রশ্ন- এটা কোন নগর? উত্তর-এটা কোন্নগর।
প্রশ্ন-এটা কী গ্রাম? উত্তর- এটা টাকি গ্রাম।
প্রশ্ন-অরুচি হলে নিম কি রুচিকর? উত্তর-অরুচি হলে নিমকি রুচিকর।

একদিন দাদাঠাকুরের কথিকা শেষ হল। তখনও দু-তিন মিনিট আছে। তারপর সংবাদ। আর কিছু অনুষ্ঠান শুরু করার উপায় নেই। তখন তো যা হত সবই তখন-তখনই এক্সটেমপোর। রেকর্ড করে রাখার ব্যবস্থা ছিল না। ঘোষক ইঙ্গিতে দাদাঠাকুরকে আরও কিছু বলে অন্তত দুমিনিট কাটিয়ে দিতে বললেন। দাদাঠাকুর শুরু করলেন— 'এরপর তোমরা শুনবে সংবাদ যার ইংরিজি নাম NEWS! NEWS কেন? না সংবাদ আসে চারদিক থেকে—North, East, West, South। প্রত্যেকটির আদ্যক্ষর নিয়ে সংবাদ-এর ইংরিজি হল NEWS। এবার শোনো 'নিউজ'।'

এভাবে দুমিনিট কেটে গেল। যথাসময়ে সংবাদ ভাষ্য শুরু হল।

বেতারকেন্দ্র থেকে বেরবার সময়ে দাদাঠাকুর প্রায়ই দেখেন, এক তরুণ প্রবেশের অপেক্ষায় বসে আছে বা দাঁড়িয়ে আছে। ইনি বিখ্যাত গায়ক রামকুমার

রসরাজ অমৃতলাল বসু

জমায়েতের সামনে বড় উঠোন। সেই উঠোনে নেমে দাদাঠাকুর গাইতে শুরু করলেন— দুটো মনের কথা বলি তোরে ও মা জগদম্বে! প্রথম লাইনটি শুনেই রসরাজ অমৃতলাল বললেন— সেরেছে। এবার তো 'জগদম্বে'র সঙ্গে মিল খুঁজে মরবে ব্যাটা!

রামকুমার চট্টোপাধ্যায়

চট্টোপাধ্যায়। তা তখন তো নবীন, নামও হয়নি। দাদাঠাকুর তাঁকে একদিন প্রশ্ন করলেন, 'তোমাকে প্রায়ই এখানে দেখি, তুমি কী কর?'

রামকুমার সসংকোচে বললেন— 'আমি গাই।'

দাদাঠাকুরকে আর পায় কে! মুচকি হেসে বললেন— 'সকাল বিকেল ক'সের দুধ হয়?'

বেতারকেন্দ্রের সাহেব ডিরেক্টর একবার আলাপের পর মুগ্ধ হয়ে দাদাঠাকুরকে বলেছিলেন— 'You are a devil.'

দাদাঠাকুর উত্তর দিয়েছিলেন, 'ঠিক বলেছ সাহেব, তবে কী জানো, আমাকে behead করলেও evil যাবে না।' অর্থাৎ devil-এর d বাদ দিলেও evil থাকে।

এর বেশ কয়েক বছর পর নলিনীকান্ত সরকার পণ্ডিচেরি থেকে কলকাতা এসেছেন, চোখের ছানি অপারেশন করতে। তখন আজকালকার আধুনিক ছানি অপারেশনের পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়নি। ছানি অপারেশন করে মোটা কাচের চশমা দিতেন ডাক্তারবাবুরা।

দাদাঠাকুরের চোখেও ছানি পড়েছে। তিনি নলিনীবাবুকে দেখতে এসে ছানি কাটানোর ব্যাপারটা কী জানতে চাইলেন।

নলিনীবাবু সব বুঝিয়ে বললেন, ঈশ্বরদত্ত চোখের লেনস বদলে কাচের লেনসের চশমা দেন। পা পচলে যেমন পা কেটে কাঠের পা দেন ডাক্তারবাবুরা তেমনই অনেকটা।

দাদাঠাকুর সব শুনে বললেন, 'দ্যাখ, কাঠের পা কিন্তু আসল পায়ের চেয়ে ভালো।'

নলিনীবাবু সবিস্ময়ে বললেন, 'কেন?'

দাদাঠাকুর বললেন, 'কাঠের পায়ে মশা কামড়ায় না।'

১ বৈশাখ দাদাঠাকুরকে নিয়ে যখন পৌঁছলাম নববর্ষের আড্ডায়, তখন অচিন্ত্যকুমার মা ও ঠাকুরের কথায় সবাইকে জমিয়ে রেখেছেন। দাদাঠাকুরকে দেখে সবাই হৈ হৈ করে উঠলেন।

অচিন্ত্যবাবুই বললেন— 'কদ্দিন শুনিনি দাদাঠাকুর আপনার মুখে কলকাতা ভুলে ভরা গানটি।'

সকলের অনুরোধে দাদাঠাকুর, গান ধরলেন—

মরি হায় রে,
কলকাতা কেবল ভুলে ভরা
সেথায় বুদ্ধিমানে চুরি করে
বোকায় পড়ে ধরা।।
আজকাল কলকাতাতে সব কথাতে
দেখছি ভারি ভুল,
কিবা করি ঘুরে মরি
নাই কিনারা-কুল।।
ভাবলাম কলুটোলায় কলু আছে,
আছে তাদের ঘানি,
দেখি কলুর বলদ বদ্যি সেথায়
করে তেল আমদানি!
আমি মুর্গিহাটায় চুপ করে যাই
কিনতে রামপাখি,
দেখি সারি সারি স্টেশনারি,
আসল জিনিস ফাঁকি!
ভাবলাম রাধাবাজার আছে বুঝি
শ্যামবাজারের বাঁয়ে,
দেখি শ্যাম গিয়েছে বহুদূরে
রাধার মানের দায়ে!
ভাবলাম লালদিঘিতে দেখব গিয়ে
জলটি লাল টকটকে,
দেখতে গিয়ে বেকুব হলাম
এলাম শেষে ঠকে!
একটা সাঁকো নেই যেথায়,
জোড়াসাঁকো নাম,
সেথা দিনে রাতে রবির উদয়
দেখে আসিলাম। .... ইত্যাদি ইত্যাদি

গান শেষ হতে না হতে শনিবারের চিঠির সম্পাদক সজনীকান্ত দাস এসে উপস্থিত। দাদাঠাকুরকে দেখে সজনীবাবুও উচ্ছ্বসিত। আড্ডার শেষপর্বে সজনীকান্ত বললেন— দাদাঠাকুর, কোথায় যাবেন বলুন, আমি পৌঁছে দেব।

দাদাঠাকুর বললেন— তা চল, একটু পুণ্য সঞ্চয় করে নে, অনেক পাপ করেছিস।

এতলোকের সামনে এই কথা! সজনীবাবু ভ্রূ কুঁচকে বললেন, 'অনেক পাপ কী করলাম দাদাঠাকুর?'

দাদাঠাকুর বললেন, 'বাপরে, কত লোককে বধ করেছিস তোর কাগজে। আমি তো বলি তুই নিপাতনে সিদ্ধ।'

অচিন্ত্যবাবু বললেন, 'যা বলেছেন দাদাঠাকুর, পরশুরাম একুশবার নিঃক্ষত্রিয় করেছেন পৃথিবী, সজনী পারলে বাইশবার করে।'

সেদিনের নববর্ষ দাদাঠাকুরের উপস্থিতিতে অন্য রূপ নিয়েছিল।

তেরোই বৈশাখ। এই স্মরণীয় দিনটিতে দাদাঠাকুরের আবির্ভাব। আবার এই তারিখেই তাঁর তিরোভাব। ইংরিজি ১৯৬৮ সালে।

নিজের জন্মের ইংরিজি সাল নিয়ে কত রসিকতাই না করতেন। বলতেন আমি যে সালে জন্মেছি, ভদ্রলোকরাই সেই সালে জন্মায়-১৮৮১। বাঁদিক থেকে ডাইনে গোনো— দ্যাখো ১৮৮১। আবার ডানদিক থেকে গোনো— ওই ১৮৮১ হবে।

আগে বলেছি, নলিনীকান্ত সরকার ছিলেন তাঁর ভাবশিষ্য। তাঁকে গজেন্দ্রকুমার মিত্র কথাসাহিত্য পত্রিকায় দাদাঠাকুর সম্বন্ধে কিছু লিখতে অনুরোধ করেন।

নলিনীবাবু উত্তরে লেখেন— ভাই গজেন, দাদাঠাকুর সম্বন্ধে কথাসাহিত্যে কিছু লেখবার জন্য অনুরোধ করেছ। শরৎচন্দ্র পণ্ডিত-আমাদের দাদাঠাকুর— জন্মেছিলেন বাংলা ১২৮৮ সালের ১৩ বৈশাখ, মৃত্যু ১৩৭৫ সালের ওই ১৩ বৈশাখেই। এপারের দিনটি যেন মিলনের প্রতীক্ষায় সাতাশি বৎসরকাল ওপারে বসে দিন গুনছিল। অদ্ভুত মানুষের অদ্ভুত মৃত্যু!

নলিনীবাবু দাদাঠাকুরকে কাছ থেকে দেখেছেন। আমরা দূর থেকে দেখেছি। একজন মানুষ সৎ থেকে শুধুমাত্র নিজ প্রচেষ্টায় কীভাবে একটি প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠতে পারেন, দাদাঠাকুর তার দৃষ্টান্ত।

দাদাঠাকুর তাঁকে একদিন প্রশ্ন করলেন, 'তোমাকে প্রায়ই এখানে দেখি, তুমি কী কর?' রামকুমার সসংকোচে বললেন— 'আমি গাই।' দাদাঠাকুরকে আর পায় কে! মুচকি হেসে বললেন— 'সকাল বিকেল ক'সের দুধ হয়?'

পুরনো অ্যালবাম

রাজনীতি ও সাহিত্য

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

'রাজনীতি ও সাহিত্য' সম্বন্ধে কিছু লেখার জন্য আমাকে সম্পাদক মশায় বলেছেন। অল্প কথায় বিষয়টির একটু আলোচনা করব।

রাজনীতি নিয়ে সাহিত্য রচনা যে অসম্ভব নয়, তার বহু প্রমাণ সাহিত্যের ইতিহাসে মেলে। মহাভারতের শান্তিপর্বে যেখানে রাজনীতি সম্পর্কে নানা কথার অবতারণা করা হয়েছে, সেখানে সাহিত্যের সন্ধান দেখতে না পাওয়াটাই অস্বাভাবিক। প্লেটো যখন তাঁর 'রিপাব্‌লিক্' লেখেন, তখনও সে লেখাতে সাহিত্যগুণ পরম সৌষ্ঠব নিয়ে দেখা দিয়েছিল। দান্তের 'ডিভাইন্ কমেডি' মহাকাব্য প্রণয়ন করার একটা প্রধান উদ্দেশ্য না কি ছিল ক্যাথলিক চার্চের দণ্ডমুণ্ডের বিধাতা পোপের সঙ্গে 'হোলি রোমান্ এম্পায়ার'-এর যে সংঘর্ষ চলছিল তাতে সম্রাটের পক্ষ সমর্থন করা। টমাস্ মূর-এর 'য়ুটোপিয়া'-তে রাজনীতি তো আছেই, সঙ্গে সঙ্গে সে রচনা সাহিত্য হিসাবে অনবদ্য। সুইফ্‌টের যে অপূর্ব রসরচনা, তার প্রধান উপজীব্যই ছিল রাজনীতি, এ-বিষয়ে সন্দেহের স্থান নেই। বার্ণার্ড-শ'-র গ্রন্থাবলীর ছত্রে ছত্রে রাজনীতির ছাপ অনস্বীকার্য। আরও বহু অনুরূপ দৃষ্টান্ত যে দেওয়া যায়, তা সাহিত্যরসিক মাত্রই জানেন।

এ-ছাড়া অবশ্য নিছক্ রাজনীতি সম্পর্কিত লেখা ভাষা ও ভাবের প্রসাদগুণে সাহিত্য-পদ-বাচ্য হ'তে পারে। কার্ল-মার্ক্‌স্ আর ফ্রেড্‌রিক এঙ্গেল্‌সের যুগ্ম রচনা (যাতে মার্কসের অংশই হল প্রধান) "কম্যুনিষ্টদের ইস্‌তেহার" যিনিই পড়েছেন, তাঁকেই মুগ্ধ হতে হয়েছে, রচনার বিন্যাস ও বীর্য লক্ষ্য করে'। গান্ধীজীর বহু নিবন্ধ রয়েছে যার সাহিত্য-গুণ সম্বন্ধে কারও মনে সন্দেহ জাগতেই পারে না।

কিন্তু "রাজনীতি ও সাহিত্য" সম্পর্কে যাঁরা প্রশ্ন তোলেন, তাঁরা বোধ হয় চান এই কথা বলতে যে রাজনীতি আর সাহিত্যের মধ্যে একটা প্রচণ্ড ব্যবধান আছে। বর্তমানের ক্লেদ, গ্লানি আর তার উপশমের ব্যবস্থা নিয়ে হল রাজনীতির কারবার আর সাহিত্যের রাজ্যই হল স্বতন্ত্র, সেখানে মর্ম ও মানসের নিত্যবস্তু থেকে রসসংগ্রহ ও সযত্ন সৌষ্ঠবে তারই পরিবেষণ হল সাহিত্যিকের ধর্ম। রাজনীতি ব্যাপারে সাহিত্যিকের আগ্রহ কিম্বা রাজনৈতিক বিষয়কে সাহিত্যের অঙ্গীভূত করার চেষ্টা তাই তাঁদের নিন্দাভাজন হয়ে থাকে।

কিন্তু পরম সংবেদনশীল মন নিয়ে এসেছেন বলেই যিনি প্রকৃত সাহিত্যিক, তিনি কেমন করে যে রাজনীতিকে সম্পূর্ণ অস্পৃশ্য মনে করে সে-বিষয়ে নিস্পৃহ, নিরাসক্ত হয়ে থাকতে পারেন তা ধারণা করা শক্ত। আমাদের দেশের কথাই বলি। যে সাহিত্যিক আমাদের স্বাধীনতার স্বপ্ন ও স্বাধীনতার প্রয়াস থেকে নিজের অনুভূতিকে স্বতন্ত্র রাখতে পেরেছেন, তিনি কি সত্যই সুজন, তিনি কি সত্যই স্রষ্টা? আমাদের রবীন্দ্রনাথ রাজনৈতিক ক্লেদের বহু ঊর্দ্ধে ছিলেন নিশ্চয়, কিন্তু মৌলিক যে রাজনীতি, সমাজকে নতুন ছাঁচে ঢেলে গড়ার যে প্রচেষ্টা, জনজীবনকে সুন্দর ও সার্থক করার যে প্রয়াস, তা সর্বদাই রবীন্দ্রনাথের শুধু আশীর্বাদ নয়, প্রত্যক্ষ সহায়তাও পেয়েছে। আজও তারাশঙ্কর-প্রমুখ বহু সাহিত্যিক রয়েছেন যাঁরা কিছুতেই রাজনীতি ও সাহিত্যের মধ্যে একটা অলঙ্ঘ্য চৈনিক প্রাচীর খাড়া করতে রাজী হবেন না।

সন্ন্যাসী যেমন দেখেছিলেন যে তিনি কম্বলকে ছাড়তে চাইলেও কম্বল তাঁকে ছাড়তে চায় না, তেমনই নিরাসক্ত সাহিত্যিকও দেখবেন যে তিনি রাজনীতি থেকে বহুদূরে থাকতে চাইলেও রাজনীতি তাঁকে দূরে থাকতে দেবে না। এ-কথা বিশেষ করে খাটে যখন সমাজে ও রাষ্ট্রে বড়রকমের পরিবর্তন আসন্ন হয়ে ওঠে, সমাজের নিজস্ব প্রেরণাতেই পরিবর্তন হয় অনিবার্য। আর তখন প্রগতি ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে যে-প্রতিযোগিতা, যে সংগ্রাম চলতে থাকে, সে বিষয়ে নিরপেক্ষ থাকার অবকাশ ও অধিকার নিছক সাহিত্যিকেরও নেই। হিটলার যখন প্রথম জার্মাণীর হর্তাকর্তাবিধাতা হয়ে বসেন, তখন বহু শিল্পী, বহু লেখকেরই ধারণা ছিল যে, ফ্যাসিস্ট অমঙ্গল আপনা থেকেই কেটে যাবে, তাঁদের কর্তব্য নিজেদের সাহিত্যধর্ম পালন করে যাওয়া, রাজনীতির কালস্পর্শ এড়িয়ে চলা। এই এড়িয়ে চলার নীতি কিন্তু বিকল হয়ে গেল, স্বয়ং টমাস্ মান্ শেষ পর্যন্ত আমেরিকার আশ্রয় নিয়ে প্রাণে বাঁচলেন, বুঝলেন যে তাঁদের উচিত ছিল, পূর্বেই স্বদেশে যাঁরা ফ্যাসিস্ট আতঙ্কের উচ্ছেদের কাজে সহযোগিতার জন্য সাহিত্যিক ও শিল্পীকে আহবান করেছিলেন তাঁদের হাতে হাত মিলিয়ে চলা। নিছক সাহিত্যিকের বোরখা পরে থাকলেও ফ্যাসিস্ট দুঃশাসনের হাতে চরম অসম্মান থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় নি।

রাজনীতি বিষয়ে কোন সজাগ সাহিত্যিকই তাই নির্বিকার, নিশ্চিন্ত হয়ে থাকতে পারেন না। দৈনন্দিন রাজনীতির আবর্তে তাঁর প্রবেশের কোন প্রয়োজন নেই, কিন্তু যে সচেতন মন বিনা শিল্পসৃষ্টি বাস্তবিকই অসম্ভব, সেই সচেতন মনকে জীবনের অনিবার্য দাবী সম্বন্ধে নিস্পৃহ ও নিরপেক্ষ অবস্থায় কয়েদী করে রাখাও হল অস্বাভাবিক।

লেখক পরিচিতি

১৯০৭ সালে নভেম্বর মাসে কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। এরূপ মেধাবী ছাত্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দুর্লভ। আই, এ, বি, এ, ও এম, এ,তে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করেন। ঈশান স্কলারশিপ ও নানাবিধ বৃত্তি, সম্মান লাভ করেন। ষ্টেট্-স্কলার হিসাবে অক্সফোর্ডে পড়তে যান। সেখানে স-সম্মানে বি, লিট্ ও পরে ব্যারিষ্টার হয়ে স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। কেবল মেধাবী ছাত্র হিসাবে নয়, সাহিত্য, রাজনীতি ক্ষেত্রেও ইনি লব্ধ-প্রতিষ্ঠ। বহু সুচিন্তিত পুস্তকের ইনি রচয়িতা, বিশেষতঃ তাঁর প্রণীত India Struggles for Freedom পুস্তকটী সাহিত্য ক্ষেত্রে আলোড়ন এনেছে। ইনি সদালাপী, অমায়িক, সুবক্তা, সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক হিসাবে ছাত্র মহলে এঁর অসীম প্রতিপত্তি।

প্রতাপকুমার রায় সম্পাদিত, প্রকাশিত ও মুদ্রিত 'কালান্তর' বৈশাখ, ১৩৫৫ থেকে পুনর্মুদ্রিত। বানান অপরিবর্তিত। সৌজন্য: রুবি রায়।

বিষাদগাথা

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

৭

(পরিচ্ছেদ: ১৯, ২০, ২১)

ঋতু আসে, ঋতু যায়। আকাশ-বাতাসের ভাষা বদলায়। স্বভাব বদলায়। প্রকৃতির স্পর্শ গায়ে এসে লেপটে যায়। বালিসোনার ভাগ্যাকাশের মেঘ পাথরের মতো, তার আর নড়চড় নেই।

পাউরুটি কারখানা বন্ধ, মাটি খোঁড়ার কাজ বন্ধ, শ্রমিকদের মধ্যে যারা আগে পুরসভার মেথর ছিল তারা কেউ কেউ হাসপাতালের মেথর বা স্কুলে বাজারে নার্সিং হোমে ঝাড়ুদার হয়ে গেল। তারা বেশির ভাগ রোজ বাদায় এসে অর্ধেক খোঁড়া মরা নদীর দুধারে সারি দিয়ে বসে থাকে। আবার কাজ শুরু হবার আশায় শুধু নলকূপের জল খেয়ে সারা দিন কাটিয়ে সন্ধেবেলা ঘরে ফিরে যায়। যাবার আগে কোনওদিন গুজব শোনে, সবাইকে বাদার উঁচু অংশের জমিতে কলাচাষ করতে দেওয়া হবে। কোনও দিন রটে, বাস রাস্তার ধারে সারি সারি মুড়কি-বাতাসার দোকান করে দেওয়া হবে। আজকাল প্রচুর বাইরের গাড়ি আসে, সেসব গাড়ির যাত্রীরা যাতায়াতের পথে বালিসোনার বিখ্যাত বাতাসা কিনে নিয়ে যাবে। এ অঞ্চলের চিনির বাতাসা ও নলেনগুড়ের মুড়কির খুব খ্যাতি।

একদিন বাদা থেকে ঘরে ফেরার মুখে হঠাৎ জনা কুড়ি যুবক এসে শ্রমিকদের ঘিরে ধরল। তাদের চমকে দিয়ে জানতে চায়, 'তোমরা কাজ চাও?'

কী কাজ? কোথায় কাজ? টাকা পাওয়া যাবে তো? মনে সন্দেহ, তবু কৌতূহলী দিনমজুররা প্রশ্ন না করে পারল না।

অচেনা যুবকদল জানাল— সকলেই কাজ পাবে। প্রথমে কিছুদিন ট্রেনিং, তখন বিনাপয়সায় তিনবেলা পেটপুরে খাওয়া, ট্রেনিং হয়ে গেলে থাকা-খাওয়া ছাড়াও মাস-মাস বেতন। অনেকটা আর্মির কাজের মতো।

মালতী গলা চিরে জিজ্ঞেস করল, 'আমাদের কালবোস আর বেঁচে নেই, তাই তো? তা-ই বলতেই এসেছ তো?' কথার মধ্যেই আহত জন্তুর মতো হিংস্র আর্তনাদ করে উঠল।

সবাই বাদা পেরিয়ে, রেললাইন পেরিয়ে, বন পেরিয়ে যুবকদলের আদেশে এই প্রথম এক জায়গায় এসে থামল। যুবকদের চারজনের হাতে রিভলবার।

শুনে তারা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে। খালিহাতে ঘরে ফিরে রোজই সেই একই হতাশা ও গালমন্দ। তার চেয়ে অজানা কাজের আশায় ভিন গাঁয়ে চলে যাওয়া ভালো!

সবাই বাদা পেরিয়ে, রেললাইন পেরিয়ে, বন পেরিয়ে যুবকদলের আদেশে এই প্রথম এক জায়গায় এসে থামল। যুবকদের চারজনের হাতে রিভলবার।

'তোমাদের ভয় নেই। আমাদের কথা মতো চললে তোমাদের লাভই হবে।'

একজনের এই আশ্বাসবাণী শেষ হবার আগেই চারটি বাগানো রিভলবারের সামনে দশ-বারোজন যুবক এগিয়ে এসে শ্রমিকদের প্রত্যেকের চোখ বাঁধতে বাঁধতে বলল, 'কেউ চেঁচাবে না। একটু পরে আমরাই বাঁধন খুলে দেব। এসো, আমাদের হাত ধরে চলো।'

মাঝরাতে গভীর জঙ্গলে পৌঁছে তাদের চোখের শক্ত বাঁধন খুলে দেওয়া হল। সে রাতে পেট ভরে গরম শাক-ভাত খেয়ে গাছের নীচে শুকনো পাতার আস্তরণে মাথা রেখেই ঘুম।

পরদিন ভোরে গুড়-মুড়ি খেয়ে শুরু হল তাদের প্রশিক্ষণ। লেফট-রাইট, হাত উঠাও, সামনে হাঁটো, পিছে হাঁটো, দৌড় লাগাও, উপুড় হয়ে শুয়ে যাও, এক ঝটকায় উঠে দাঁড়াও, গাছে চড়ো, কাঠবিড়ালীর মতো শাখা বেয়ে চলো, লুকিয়ে পড়ো, বাঁদরের মতো এক ডাল থেকে অন্য ডালে লাফাও— প্রথম কিছুদিন এইসব চলল। পরে ক্রমশ লাঠি খেলা, তলোয়ার চালানো, তীরধনুক বর্শা হ্যান্ড গ্রেনেড ছোঁড়া, বন্দুক চালানোয় হাত পাকানোয়। যে যে-অস্ত্র ভালোভাবে আয়ত্ত করতে পারে তাকে সেই অস্ত্রের আলাদা প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। সেরাদের বেছে নেওয়া হয় অ্যাকশান স্কোয়াডে অংশ নিতে।

চোখ, নাকের ফুটো ও ঠোঁট বাদে আগুনঝরা জ্যৈষ্ঠদিনের মতো সারা মুখ-মাথায় পুরু গামছা বাঁধা বড় এক নেতা এসে একদিন বলল, 'তোমাদের দুঃখদারিদ্র্য দূর করার ক্ষমতা চৌধুরীদের নেই, পুরসভার নেই, কোনও সরকারেরও নেই। তাদের শুধু শাসন আর শোষণ ক্ষমতা আছে। সেই ক্ষমতা থাকলেই গরিবের দুঃখ-কষ্ট তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করার অধিকার থাকে। গরিব চাষি, তাঁতি, মজুর, পাতা-কুড়ুনি— সকলের সঙ্গে থেকে আমরা তাদের শক্তি জোগাব, অস্ত্র জোগাব। সবাইকে লড়াই করতে হবে। মনে রেখো, যখন যেমন নির্দেশ পাবে সেইমতো তোমাদের তা পালন করতে হবে। তোমাদের সকলের নাম, বাড়ির লোকের নাম, কোন পাড়ার কোথায় বাড়ি, সব আমাদের কাছে লেখা আছে। মাসে মাসে প্রত্যেকের বাড়িতে ডাকপিওনের ছদ্মবেশে তোমাদের ভাতা পৌঁছে দেওয়া হবে। ভাতা বলো আর বেতন বলো আর সাহায্যই বলো, এ শুধু তোমাদেরই দেওয়া হচ্ছে। আমরা তোমাদের পাশে আছি। কোনওরকম চালাকি বা বিশ্বাসঘাতকতা বা পুলিশের চরবৃত্তির শাস্তি কিন্তু একটাই— মৃত্যু।'

পাশাপাশি তিন গ্রামের তেইশজন জোয়ান ছেলে বাদায় কাজে গিয়ে আর ফেরেনি দেখে তাদের স্বজনরা দুশ্চিন্তায় উদ্বেগে দিন কাটায়। প্রতিবেশীরাও অজানা আশংকায় দিশাহারা। সংক্রামক ব্যাধির মতো তিন গ্রামের ভয় আশপাশের গ্রামেও ছড়িয়ে পড়ল। একমাস পর ডাকপিওনের কাছ থেকে ছেলেদের পাঠানো টাকা পেয়ে আশায় আনন্দে তারা বুক বাঁধলেও এতগুলো ছেলের একসঙ্গে হঠাৎ নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়া এবং এতদিনে কারও কোনও খবর না পাওয়ায় গ্রামবাসীদের মনের শংকা থেকেই যায়। যে তিন বাড়িতে ছেলেরা টাকা পাঠায়নি সেই তিন বাড়িতে গ্রামে পিওন আসার দিন থেকে সূর্যাস্তের পর আর আলো জ্বলে না।

সেদিন থেকেই নিতাই আকুলির উঠোনে দিনের আলোয় রাতের আঁধারে নাতির জন্য তার বুড়ি মার বিলাপ শোনা যায়। দু-হাত দু-পায়ে মোট যত আঙুল, তার চেয়েও কম বয়েস নাতিটার।

বিলু যেদিন নিরুদ্দেশ হল সেদিনই বৈরাগীবাড়ির হাঁসু বৈরাগী বাদার পাঁক ঘেঁটে অনেকদিন পর বড় একটা শোল পেয়েছিল, বিলুর মা ছেলের পছন্দমতো অসময়ের মুলো দিয়ে এক কড়াই ঝোল রেঁধে সারা রাত ছেলের পথ চেয়ে বসে ছিল। ছেলেকে না পেয়ে সেই ঝোল তারা খায়ওনি, ফেলেওনি। পিওনকে পাশের বাড়িতে টাকা দিয়ে তাদের ঘরের সামনে দিয়ে চলে যেতে দেখে সর-পড়া, পচা শোলমাছের কড়াসুদ্ধ উঠোনে তিনটে ছানা বেষ্টিত একটা কুকুরের সামনে ঢেলে দিল।

তৃতীয় জন দুখিরাম, বিছানায় লেপটে থাকা তার বাবা কিছুদিনের মধ্যেই হাঁপরের মতো শ্বাস নিতে নিতে একসময় শেষবারের মতো বালিসোনার বাতাসটুকু আর নিতে পারল না।

এরা কেউ জানে না, প্রথম সপ্তাহেই তাদের তিন ছেলে পালাতে গিয়ে জঙ্গলে পথ হারিয়ে পিছন থেকে বন্দুকের গুলি খেয়ে মারা গেছে।

ঘোড়াপোষা গ্রামের হারান পই ছেলের পাঠানো টাকায় প্রথমেই নিজেদের জন্য চাল-নুন ছাড়াও তাদের ধান বইবার হাড়জিরজিরে বুড়ো ঘোড়ার জন্য এক বস্তা ছোলা কিনল। ছেলে হারিয়ে সামনের মঙ্গলবার চাষিদের বচ্ছরকার ঘোড়দৌড়ের লড়াইয়ে ঘোড়া নিয়ে যাবার আশা ছেড়ে দিয়েছিল, এবার ঠিক হল, পবন এর মধ্যে না ফিরলে, বারো বছরের নাতি ভোলা ঘোড়া ছোটাবে।

হাড়ভাঙি গ্রামের ঢাংপাড়ার কেষ্ট ঢাং, নয়ন ঢাং দুজনেই ভৃঙ্গরাজ, ঘৃতকুমারী, শতমূলী, বিশল্যকরণীর লতা-পাতা বস্তা ভরে শহরের আয়ুর্বেদ ওষুধ-কারখানায় সরবরাহ করে কোনক্রমে সংসার চালায়। রহস্যময়ভাবে নিরুদ্দিষ্ট ছেলেদের কাছ থেকে টাকা আসায় তারা বেশি করে নয়নতারা ও ঘৃতকুমারী চাষের কথা ভাবে। একজন ফড়ে বলেছে দুইয়েরই এখন খুব চাহিদা, ভালো দামও পাওয়া যাবে।

ছেলের পাঠানো টাকা পেয়ে গোপাল ধীবর মুদির দোকানের ধার মিটিয়ে, আবার ধারেই চাল নুন তেল কিনে ঘরে ফিরে দাওয়ায় বউয়ের সামনে বসে পড়ে হাউহাউ করে কেঁদে উঠল। মালতী চমকে গিয়ে দুবছরের মেয়ে বিন্তির মুখ থেকে বুকের দুধ ছাড়িয়ে নেওয়ায় বিন্তি ভারি অবাক হয়ে বাবার দিকে একমুহূর্ত চেয়ে রইল, তারপর নিজেও কাঁদতে লাগল। মালতী গলা চিরে জিজ্ঞেস করল, 'আমাদের কালবোস আর বেঁচে নেই, তাই তো? তা-ই বলতেই এসেছ তো?' কথার মধ্যেই আহত জন্তুর মতো হিংস্র আর্তনাদ করে উঠল।

২০

বালিসোনায় এমন অদ্ভুত কুয়াশা আগে কেউ কখনও দেখেছে বলে বয়োবৃদ্ধরাও মনে করতে পারে না। সকাল আটটা শুধু ঘড়িতেই, ঘন কুয়াশায় ঢাকা চারপাশ দেখে বেলা বোঝাই যায় না। বকুলবেদি, শিরীষগাছ, ছাতিমবন, শিউলি-চাঁপা গোরস্থান সব কর্পূরের মতো উবে গেছে। গোটা বালিসোনা এক অসীম সাদা শূন্যতায় ঢাকা।

কুয়াশা ফুঁড়ে কে এই অসময়ে এসে চৌধুরীবাড়ির দরজার ভারি কড়া নেড়েই চলেছে, জানার উপায় নেই।

দরজা খুলে দরোয়ানের সঙ্গে বাইরে এসে ভণ্ডুল মানুষটার একহাতের মধ্যে দাঁড়িয়ে ভালো করে দেখে বুঝল একে আগে কোনওদিন দেখেনি। লোকটা ভরাট গমগমে গলায় বলল, 'এটা যদি অম্বরীশ চৌধুরীর বাড়ি হয়, তাকে গিয়ে বলো তার জাহাজের দোস্ত জাহাঙ্গীর এসেছে।'

মা-বাবা দুজনের কেউই বোধহয় কুয়াশায় সময় বুঝতে পারেনি, তাদের দরজা বন্ধ দেখে পরীক্ষিৎ বেরিয়ে এল।

জাহাঙ্গীর পরীক্ষিতের মুখের দিকে অবাক দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে বলল, 'আশ্চর্য! এতটা বয়েস কমালি কী করে?'

'আমি ওঁর ছেলে, পরীক্ষিৎ।'

'অম্বরীশ কোথায়, ডাকো তাকে। দেশে ফিরে শাদি করল অথচ আগে বা পরে একটা খবরও দিল না। ওর ছেলে হিসেবে তোমার বয়েস তো অনেক বেশিই মনে হচ্ছে।'

ভেতরের দালানে জাহাঙ্গীরকে বসিয়ে পরীক্ষিৎ বেরিয়ে যাবার অল্প পরে অম্বরীশ এল, নিজের চোখকেই তার বিশ্বাস হয় না।

তার চেয়েও বেশি অবাক জাহাঙ্গীর, কেউ যেন তার চুলের মুঠি ধরে এক ঝটকায় তাকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। সেই অবস্থায় কয়েক মুহূর্তের স্তব্ধতার পর সে কথা বলতে পারে— 'এ চেহারা তোর হল কী করে? করল কে?'

'ভূতে আর মানুষে।' অস্থিচর্মসার মুখে মৃদু হাসি ফুটিয়ে বসতে বসতে বলল, 'বোস। কত যুগ পরে দেখা! বাড়ি খুঁজে পেলি কী করে?'

'আমাকে হঠাৎ হাবা ঠাওরালি নাকি? বালিসোনার কথা, তোদের রাসমাঠের কথা, বকুলবেদির কথা তোর মুখে লক্ষবার শুনেও তোদের বাড়ি খুঁজে পাব না? অম্বরীশ, সত্যি করে বল তো, তোর কি এড্‌স্‌ হয়েছে?'

'তার চেয়েও বেশি। বালিসোনার গরল গিলেছি। অতীতের, বর্তমানের সব বিষ পান করেছি আমি।'

বালিসোনায় এমন অদ্ভুত কুয়াশা আগে কেউ কখনও দেখেছে বলে বয়োবৃদ্ধরাও মনে করতে পারে না। বকুলবেদি, শিরীষগাছ, ছাতিমবন, শিউলি-চাঁপা গোরস্থান সব কর্পূরের মতো উবে গেছে। গোটা বালিসোনা এক অসীম সাদা শূন্যতায় ঢাকা।

'আগে তো এ ভাষায় কথা বলতিস না। আমাকে বুঝিয়ে বল তো তোর ঠিক কী হয়েছে? আমি বলছি তোর ভয় পাবার কিছু নেই! রিও-র সেই রিভলবার আজও আমার সঙ্গেই আছে।'

সমুদ্র জ্বালানো জ্যোৎস্নায় রিও-ডি-জেনেরোর কোপাকাবানা বিচে তিন গুণ্ডার সমবেত আক্রমণ রুখে দিয়ে একজনের রিভলবার কেড়ে নেবার সেই হাড় হিম করা ধ্বস্তাধ্বস্তি অম্বরীশকে কিছুক্ষণ অন্যমনস্ক করে রাখে।

'সবকিছু খুলে বল আমাকে। দোস্তের জন্য আমি সবকিছুই করতে পারি।'

অম্বরীশ তখনও চুপ করে আছে দেখে বন্ধুকে বাঁচাতে নিজের প্রাণ হাতে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার একটা দৃষ্টান্ত তুলে ধরতে চেয়ে জাহাঙ্গীর চোখমুখ হাত কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলতে থাকে— 'মাইকেল বন্দরের কথা নিশ্চয়ই ভুলিসনি!'

'মাইকেল না, মার্সেই বা হয়তো ভার্সাই। ফ্রান্সে মাইকেলের ঋণজর্জর প্রবাসজীবন কেটেছিল সেখানে। ওখান থেকেই মাইকেল মধুসূদন দেশে বিদ্যাসাগরের কাছে সাহায্য চেয়ে চিঠি লিখতেন। আমার অবস্থাও এখন ওইরকম। ঋণজর্জর। পূর্বপুরুষের ঋণের বোঝা বইছি।'

'কত টাকার ঋণ? আমি মেটাব। আমি একটা জাহাজ কিনেছি। মালবাহী জাহাজ। লন্ডন থেকে আইসল্যান্ডের রেকিয়াভিক হয়ে গ্রিনল্যান্ডের তাসিলাক আর নানোরতালিক রুটে কন্টেনার দেওয়া-নেওয়া করব, ভাব তো! তোকে ছাড়া আমি ভাবতে পারি না। চল, আবার দুই জিগরি দোস্ত সমুদ্রে ভেসে পড়ি।'

'আমার সেই স্বাস্থ্য আর নেই। হয়তো বয়েসও নেই।'

'সে আমি দেখব, আমি বুঝব। আগে হাত মেলা।'

অনেক দিন পর অম্বরীশ আবার বালিসোনার পথে নামল। জাহাঙ্গীরকে নিয়ে পুরনো অস্টিন থেকে নেমে ক্রাচে ভর করে বন্ধ পাউরুটির কারখানার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। বেশির ভাগ পতাকা গ্রীষ্ম-বর্ষার রোদে-জলে পচে গেছে। অবরোধকারীদেরও অনেককেই আর দেখা যাচ্ছে না। যারা তখনও বসে বা শুয়ে আছে তাদেরও আগের সেই উগ্র দৃষ্টি, সেই মারমুখী তেজ আর নেই। তাদের কাছেই জানা গেল, অনেকেই ধরনা ছেড়ে উঠে গেছে। কেউ রোগে শয্যাশায়ী, কেউ অনাহারে মৃতপ্রায়, দুজন চরম দারিদ্র সইতে না পেরে আত্মহত্যা করেছে।

'আমি তোমাদের মালিকের বন্ধু। কী পেলে তোমরা আবার কারখানা চালু করতে পারো?'

কারখানার কাজের শেষে যাত্রার পার্ট করে বিখ্যাত হরিদাস অম্বরীশের দিকে এগিয়ে এসে বলল, 'হাতে কিছু টাকা পেলেই ধার-কর্জ মিটিয়ে বউ-বাচ্চা মিলে পেট পুরে দুটো ভাত খেয়ে আবার আমরা লেগে পড়তে পারি, কত্তাবাবু। মাস-কতক আগে উল্টোরথের দিন বৃষ্টিতে ভিজে জ্বর নিয়েও আমরা ক'জন আপনার কাছে এই কথাটা বলতে যাচ্ছিলাম, আমাদের নেতা যেতে দিল না।'

জাহাঙ্গীরকে নিয়ে বাদার পথে এগোতে এগোতে অম্বরীশের শারীরিক কষ্ট বেড়ে যায়।

'তুই এখন যা বলবি তাতেই এরা রাজি হয়ে যাবে। কাজে ফিরতে ইচ্ছুকদের হাতে কিছু টাকা দিলেই হবে। যদি বলিস আমিই দিয়ে দিতে পারি।'

'আমার অত কষ্টের কারখানা নতুন করে করার আর ইচ্ছে নেই। কারখানায় আমার আর মনই নেই।'

অম্বরীশের দু-চোখ জলে ভরে উঠল। জাহাঙ্গীরের উৎসুক দৃষ্টি থেকে জলভরা চোখ আড়াল করে তার একটা হাত ধরে বলল, 'যাব, নিশ্চয়ই যাব। সমুদ্রেই যাব। এখনই না, তুই বসন্তকালে আসিস।'

বাদায় পৌঁছে সে হাঁপাতে থাকে।

জাহাঙ্গীর শীতের বাদা, আধখোড়া মরা নদী চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখে অম্বরীশের ক্লিষ্ট মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'বালিসোনা ভ্যাম্পায়ারের মতো তোর রক্ত চুষে খেয়েছে। তোকে ছিবড়ে করে দিয়েছে। আমি তোকে শহরে নিয়ে গিয়ে সুস্থ করে জাহাজে নিয়ে যাব। বালিসোনার বাইরে গেলেই তোর রোগমুক্তির শুরু। চল দোস্ত, প্রাণের বন্ধু আমার, আমাকে নিরাশ করিস না। তোকে নিয়ে যেতেই আমি বালিসোনায় এসেছি রে।'

অম্বরীশের দু-চোখ জলে ভরে উঠল। জাহাঙ্গীরের উৎসুক দৃষ্টি থেকে জলভরা চোখ আড়াল করে তার একটা হাত ধরে বলল, 'যাব, নিশ্চয়ই যাব। সমুদ্রেই যাব। এখনই না, তুই বসন্তকালে আসিস।'

বন্ধুকে বিদায় জানাবার পর আর সে মুখ খোলেনি। তিনদিন ধরে পারমিতা পরীক্ষিৎ অবনী সরোজিনীরা বার বার প্রশ্ন করেও তাকে কথা বলাতে পারেনি। চোখের অবিরাম জল ছাড়া অম্বরীশের আর কোনও ভাষা নেই। পঞ্চমদিনে কুয়াশাঢাকা সকালে যখন তার কান্না চিরকালের মতো থেমে গেছে বলে জানা গেল, তখনও অম্বরীশের দু-চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়া জলের দাগ শুকোয়নি।

জঙ্গলের মাথা, রেললাইনের পাথর, দূরের বাদা বিকেলের আলোয় বড় মায়াময়, পরীক্ষিতকে কাতর করে। বাবা এই সেদিনও এই সব কিছুর মধ্যে ছিলেন, এখন আর কোনওদিন তাঁকে দেখা যাবে না— পরীক্ষিতের মন এখনও এ-সত্য সইতে পারে না। সব সময় তার মন জুড়ে থাকেন বাবা। যখন ছিলেন, এখন তার চেয়ে অনেক বেশি। শীতের স্বল্পায়ু বিকেলে রেললাইন ধরে হেঁটে যেতে যেতে তার ভ্রম হয় পাথরকুচির ওপর, কাঠের স্লিপারগুলোর ওপর ক্রাচের মৃদু খটখট শব্দ তুলে বাবাও তার সঙ্গে চলেছেন।

বাবাকে সে কখনও ঠিকমতো বুঝতে পারেনি শুধু নয়, বুঝতে চায়ওনি ভেবে তার মন টনটন করে ওঠে। বাদায় মাটির ঢিবির গায়ে হেলান দিয়ে তাঁর সেই বসে থাকা সে চেষ্টা করেও আর ভুলতে পারে না। তার কেবলই মনে হয়, মানুষের জীবন কোথায় শুরু হয়ে কোথায় গিয়ে শেষ হবে, কেউ জানে না। এক যুগ আগে রাঙা-জ্যাঠাইমা হয়তো ঠিকই বলেছিলেন, 'মেথর তাড়া করে সেই যে বালিসোনা ছাড়ল, তারপর থেকে তোর বাবা সারা জীবন শুধু নিষ্ফল যুদ্ধই করে গেল।'

২১

বসন্তের সূচনায় এক সন্ধের মুখে বিষাদগ্রস্ত পরীক্ষিৎ তিকানদের বাড়ি গিয়ে দেখে একসময়ের পোড়-খাওয়া লড়াকু নেতা জগদীশ আচার্যের নিম্নাঙ্গ বহু কসরৎ করে সাবান দিয়ে ধুইয়ে তিকান নোংরা লুঙ্গি বদলিয়ে দিচ্ছে। পরীক্ষিৎ নিমেষে উল্টো মুখে ঘুরে গেল। ভারি অপ্রস্তুত হয়েও বাবাকে কাচা ফতুয়া পরাতে পরাতে তিকান বলল, 'বাইরের দরজা বন্ধ করিনি? আমার আর মাথার ঠিক নেই। ভেতরে এসো। বাবা তো আর আমাকেও চিনতে পারছে না!'

এদিকে ফিরে পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করল, 'ডাক্তার দেখিয়েছ?'

'ডাক্তার দেখেছেন, ওষুধ খাওয়াচ্ছি, খুব করে হলুদ খাওয়াতে বলেছেন তাও দিচ্ছি, কিন্তু ফল কিছু দেখছি না।'

'আমি একটু আসছি' বলে চলে গিয়ে পরীক্ষিৎ অবনীমোহনকে নিয়ে যখন ফিরে এল, তখন হিংস্র পাঁচ যুবকের একটা দল শাসাতে শাসাতে তিকানদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। একজন মাঝারি মাপের নেতাকেও ওদের সঙ্গে দেখা গেল।

অবনী জগদীশের চোখের শূন্যদৃষ্টি অনেকক্ষণ ধরে নিরীক্ষণ করার পর চেয়ারে বসে বলল, 'স্মৃতি হল আরণ্যক মৃত্তিকা। তার স্তরে স্তরে জীবনের শিকড় নেমে গেছে। এঁর তো মূল শিকড়টাই ছেঁড়া। আর জোড়া লাগবার নয়, এখন দরকার শুধু সেবা আর সাহচর্য।'

পরীক্ষিৎ তিকানকে জিজ্ঞেস করল, 'ওরা কারা, ওভাবে শাসিয়ে গেল!'

ভয়ে উত্তেজনায় তিকান তখনও স্বাভাবিক স্বর ফিরে পায়নি। বলল, 'বাড়িটা ভেঙে পাঁচ-সাত তলা তুলবে, ফ্ল্যাট করে বিক্রি করবে। আমাদের তাড়াতে চায়। বাবা যতদিন পার্টিতে ছিলেন, কিছু বলতে পারেনি, এখন মাঝেমাঝেই শাসাতে আসে।'

বালিসোনার শিমুলগাছ লাল ফুলে ভরে গেছে, সজনে ফুল শেষ হয়ে ডালে ডালে ডাঁটার সূচনা হয়ে গেল, হঠাৎ-হঠাৎ মন-উদাসী হাওয়া দিচ্ছে, সেই পূর্ণ বসন্তে একদিন তিকান হারিয়ে গেল।

বুধবারের 'বিষাদগাথা' আজকাল পরীক্ষিতের বুকের পাঁজর-ছেঁড়া রক্তক্ষরণে ভরে যায়। তার কলাম ক্রমশ মানুষের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ে। কোনও কোনও দিনের কোনও লেখার কয়েক লাইন তুলে স্টেশনে রাস্তায় পোস্টারও দেখা যায়।

ফাল্গুনের শেষে একদিন সকাল থেকেই মেঘবৃষ্টিতে আকাশ কালো হয়ে আছে। স্যাঁতসেঁতে আবছা অন্ধকার ফুঁড়ে চৌধুরীবাড়ির দরজার ভারি কড়া নাড়ার শব্দে দরজা খুলতে পরীক্ষিৎকে এগিয়ে আসতে দেখে দরোয়ান ব্যস্ত হল। দরজা খুলেই সেই জলদ গম্ভীর কণ্ঠস্বর— 'অম্বরীশ কোথায়? ডাকো তাকে। বলো গিয়ে, তার জাহাজের দোস্ত জাহাঙ্গীর এসেছে।'

'ভেতরে আসুন। এত দেরি করে এলেন!'

'আমাকে তো বসন্তকালেই আসতে বলেছিল। বলেছিল ওই সময় আমার সঙ্গে জাহাজে যাবে।'

'বাবা চলে গেছেন। আমি আপনার জাহাজে যেতে চাই। আমাকে সঙ্গে নেবেন?'

'প্রথমত, তোমার সমুদ্রের অভিজ্ঞতা নেই। দ্বিতীয়ত, তোমার বাবা বলেছিলেন, তোমাকে বালিসোনার খুব দরকার।'

যেমন মেঘবৃষ্টির অন্ধকারে এসেছিল, তেমনই মেঘবৃষ্টির অন্ধকারেই চলে গেল। যাবার সময় মাছ ধরার জাল-ঢাকা প্লাস্টিকের ছাউনির মেয়ে দুটি তাদের জন্মান্ধ ভাইকে নিয়ে পারমিতার কাছে তাদের আরও দুঃখের কথা জানাতে এসেছিল, নিজেদের ঘরে ফেরার এখনও কোনও ব্যবস্থা হয়নি। জাহাঙ্গীর তাদের সব কথা শুনে 'এই তোমাদের ভাইটির সব দায়িত্ব আমি নিলাম' বলে যেন সম্মতির জন্য অথবা ছেলেটার দুই দিদিকে বুঝিয়ে বলার জন্য পরীক্ষিতের দিকে তাকাল। তাদের অভাগা ভাইয়ের এমন ভাগ্য খুলে যাওয়ার বিষয়ে পরীক্ষিতের কাছে বিস্তারিত শোনবার আগেই দুই বোন আচমকা

এমন শব্দ করে ফুঁপিয়ে উঠল যে জাহাঙ্গীর-পরীক্ষিৎ দুজনেই চমকে গেল।

জাহাঙ্গীর জানতে চাইল, 'তোমাদের এতে মত নেই, এই তো?'

'না, না, বাবু, আমরা দুই বোন জীবনে কখনও এত আনন্দ পাইনি। আনন্দে কেঁদে ফেলেছি। এতদিনে ভগবান মুখ তুলেছেন।'

দু-বোনের এক বোনের মুখে কান্নার কারণ শুনে জাহাঙ্গীর বলল, 'আল্লাহ্ তোমাদের ভালো করুন।'

'আপনি মোছলমান? মোছলমান এমন হয়?'

'কী নাম তোমাদের?'

'ও লজ্জাবতী, আমার নাম ময়নামতী। আপনার দেশ-ঘর কোথায়?'

'শুনলে না আমার কোনও দেশ-ঘর নেই, আমি দেশে-দেশে জাহাজে মাল বওয়া-নেওয়া করি।'

দুই বোনের আরও কী কথা বৃষ্টির সঙ্গে আকস্মিক দিক বদলানো বাতাসের ঝাপটায় ভেসে গেল। জাহাঙ্গীর গায়ের রেইনকোট খুলে ছেলেটার গায়ে বেঢপ চড়িয়ে ক্রমবর্ধমান স্যাঁতসেঁতে আবছা অন্ধকারে এগিয়ে গেল।

একটু পরে অকালের মেঘবৃষ্টির আঁধার ফুঁড়ে সে একাই ফিরে এল। দু-হাতে চোখ-মুখের জল চেঁছে ফেলে পরীক্ষিৎকে হঠাৎ বুকে চেপে ধরে খুব বড় একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, 'তোমার বাবার মৃত্যুদিনে তাঁর কবরে আইসল্যান্ড গ্রিনল্যান্ডের মাটি দিয়ে যাব।'

পরীক্ষিৎ তৎক্ষণাৎ তার অসম্মতি জানাল— 'মাটি তো দেয় কবর দেওয়ার সময়। বাবাকে নিয়ে আর খোঁড়াখুঁড়ি করবেন না।'

ভেতরের বারান্দায় জাহাঙ্গীরের জন্য বাগানের মুচকুন্দ ফুলের সরবত পড়েই রইল, জাহাঙ্গীর দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, 'এই বসন্তেই ওর সমুদ্রে যাবার কথা ছিল।' ক্রমশ

দু-বোনের এক বোনের মুখে কান্নার কারণ শুনে জাহাঙ্গীর বলল, 'আল্লাহ্ তোমাদের ভালো করুন।'

'আপনি মোছলমান? মোছলমান এমন হয়?'

'কী নাম তোমাদের?'

'ও লজ্জাবতী, আমার নাম ময়নামতী। আপনার দেশ-ঘর কোথায়?'

'শুনলে না আমার কোনও দেশ-ঘর নেই, আমি দেশে-দেশে জাহাজে মাল বওয়া-নেওয়া করি।'

ভ্রম-সংশোধন: 'কালের কষ্টিপাথর' ১৬ সেপ্টেম্বর-১ অক্টোবর সংখ্যায় প্রকাশিত 'বিষাদগাথা' ধারাবাহিকের দ্বিতীয় পাতার দ্বিতীয় কলামের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদটিতে কিছু মুদ্রণ-প্রমাদ থেকে গেছে। অনুচ্ছেদটি পড়তে হবে: **কারখানার ভেতরে দাঙ্গা ঠেকানো গেলেও, দাঙ্গায় উৎসাহদাতা দুই সম্প্রদায়ের মোট সাতজন কর্মীকে বরখাস্ত করার প্রতিবাদে কারখানায় ঢোকবার মুখে ডজন ডজন ঝাণ্ডা পুঁতে দু-সম্প্রদায়েরই কর্মী ও অকর্মী বহু লোক স্লোগান দিতে থাকে। পিছনের দরজার সামনেও একই ব্যবস্থা।** —এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য আমরা দুঃখিত।

সেরা ভ্রমণ কাহিনী
প্রথম খণ্ড

প্রখ্যাত লেখক-পর্যটকদের
দেশ-বিদেশ ভ্রমণের
অন্তরঙ্গ কাহিনী। সহস্রাধিক পাতা।
ম্যাপলিথো কাগজে ছাপা।
মজবুত বোর্ড বাঁধাই।
তৃতীয় মুদ্রণ। ₹৩৫০

সেরা ভ্রমণ কাহিনী
দ্বিতীয় খণ্ড

দ্বিতীয় মুদ্রণ।
৭০০ পাতা। ₹২৭৫

অনলাইনে পেতে
www.swarnakshar.in
লগ অন করুন

স্বর্ণাক্ষর **Swarnakshar Prakasani Pvt. Ltd.**, 29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-19
Phone: 2283-2320 **Fax:** 2287-6448 **E-mail:** books@swarnakshar.in

দে বুক স্টোর, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, **বলাকা বুক স্টল** (কলেজ স্ট্রিট), **স্টার মার্ক**-এর সব দোকান ও অন্যান্য বইয়ের দোকানে পাবেন।

আমার ছবি জীবন

শুভাপ্রসন্ন

আমার জীবন ছবি নিয়ে। তাই ছবিজীবন। সেই শৈশব থেকে যা দেখি তাই আঁকি। তখন অন্তরের কী বাইরের তা বুঝতাম না। জানার আগ্রহের সঙ্গে সঙ্গেই জানাবার আগ্রহ চলে আসে। অযুত মানুষের কাছে দেখা, শোনা, জানার ভিন্নতাই— ভিন্নভাবে জানাবার সুযোগ দেয়। মূর্তপথে, বিমূর্তপথে, শব্দে, বাক্যে, সুরে, কবিতায়, ছবিতে প্রকাশ পায় তা। এ পৃথিবীর সৃষ্টি রহস্যে এ খেলা চলে অবিরত। তাই সকলের জীবনবোধ-উপলব্ধি-অভিজ্ঞতা আর জীবনপ্রবাহের বিচিত্রতাই এক অন্যরকম ছবি বা গাথার জন্ম দেয়। কেউ তা জড়ো করে মালা গাঁথেন, কেউ অনীহায় কিংবা আলস্যে ফেলে দেন। ঝরাপাতার মতো আপনি ঝরে যায় সে পল্লব। বনপথের মর্মরধ্বনির কলতানে নির্দিষ্ট হয় না সে ঝরাপাতা। হারিয়ে যায় অনন্তের কাছে। মিলিয়ে যায় অস্তিত্ব ক্রমশ। তবুও বেঁচে থাকার আশা, জানা আর জানাবার আশা অফুরান থেকে যায়। 'আপনাকে এই জানা আমার ফুরাবে না।' তাই আঁকি, গড়ি, লিখি ছবিজীবন নিয়ে। প্রথম কিছু পর্ব পুনর্মুদ্রণ হলেও তা পরিমার্জিত করার সুযোগ পেয়েছি। আশা করি আমার এ ছবিজীবন কষ্টিপাথরে পাঠক যাচাই করে নেবেন, যদি আদৌ আমি নিজেকে কোনও ধাতুর দাবিদার মনে করতে পারি!

৩

প্রফুল্ল সেন খুব ভালোবাসতেন, আমার আবদারের প্রশ্রয়ে ওঁর জুড়ি ছিল না। প্রথম আবদার নিয়ে সরাসরি পৌঁছে যাই ওঁর কাছে। রানি এলিজাবেথ কলকাতা আসছেন, আমার ইচ্ছা ওঁর ছবি আঁকি। কিন্তু কীভাবে রানির কাছে পৌঁছই? কেউ একজন বলেছিলেন, রাজভবনের পশ্চিমদিকের বাড়িতে মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল সেন থাকেন, উনিই ব্যবস্থা করতে পারবেন, আর সকাল আটটার মধ্যে পৌঁছলে উনি দেখা করবেন। সেইমতো পৌঁছে যাই। গেটের লোকজনদের বুঝিয়ে অনুমতি পাই ওঁর কাছে যাওয়ার। কী সহজ সরল মানুষ, কী স্নেহপ্রবণ। আমার ইচ্ছার কথা শুনে বলেছিলেন, 'তুমি ওনার ছবি আঁকবে কেন? জানো, আমরা তো বহু কষ্ট করে ওদের এদেশ থেকে তাড়িয়েছি, দেশ স্বাধীন হয়েছে। তুমি আঁকবে বাপুজির ছবি, পণ্ডিতজির ছবি...' আমি চুপ করে থাকি। তারপর উনি বলে দেন কবে কখন কোথায় আসতে হবে। উনি সেইমতো ব্যবস্থা করে রাখবেন। আমি সেই ব্যবস্থামতো সামনাসামনি হয়েছিলাম রানির। পিছনে দীর্ঘদেহী ডিউক অব এডিনবরা— অনেকটাই চিররক্ষীর মতো। প্রফুল্ল সেনের সঙ্গে সেই থেকে দীর্ঘ সময় ধরে যোগাযোগ ছিল। আমি যখন-তখন যেতাম ওঁর কাছে। রাজভবনের কোয়ার্টারে, কখনও মুখ্যমন্ত্রীর গাড়িতে চেপে যেতাম রাইটার্সেও।

রাজ্যপাল পদ্মজা নাইডুর সঙ্গে লেখক

উৎসাহ দিতেন ছবি আঁকার, প্রশ্রয়ও। একদিন একজন পরিচিত মানুষের জন্মদিনের জন্য ওঁকে নিমন্ত্রণ জানাতে গিয়েছি, উনি শুনে বললেন, 'তোমরা ওর জন্মদিন করছ, কই আমার তো কেউ করে না।' আমি বলি, আপনার জন্মদিন কবে জানি না তো? তখন টেবিলের পাশ থেকে ছোট চিরকুট টেনে লিখে দিলেন ১০ এপ্রিল। পরের বছর অনেক মানুষকে জড়ো করে রাজভবনে আয়োজন হয়েছিল ওঁর প্রথম জন্মদিনের অনুষ্ঠান, আমি তার অন্যতম উদ্যোক্তা।

এমনিভাবেই বিধান রায়ের সঙ্গে পরিচয়। ওঁর ছবি এঁকেছি নির্মলচন্দ্র স্ট্রিটে ওঁর চেম্বারে। ছবি দেখে বলেছিলেন, আমার চেয়ে অনেক বেশি সমঝদার লেডি গভর্নর পদ্মজা নাইডু। উনি তোমার ছবি দেখলে খুব খুশি হবেন। সঙ্গে সঙ্গে আমি উত্তর দিই, ওঁর কাছে অত বড় বাড়িতে ঢুকব কী করে? পুলিশ তো ঢুকতেই দেবে না। উনি আমার মুখের দিকে চেয়ে মৃদু হেসে লিখেছিলেন পদ্মজা নাইডুকে দু-চার লাইন আমার কথা। সেই চিঠিই ছিল আমার গেট পাস। রাজভবনে পদ্মজা নাইডুর সঙ্গে সময় ধার্য হয়েছিল পনেরো মিনিট। কিন্তু ছবি এঁকে শিঙাড়া-সন্দেশ খেয়ে কেটে গিয়েছিল একঘণ্টা পনেরো মিনিট। সেই বিধান রায়ের শেষ জন্মদিনের অনুষ্ঠানে অতুল্য ঘোষের নির্দেশে চারকোলে এঁকেছিলাম সহাস্যে দাঁড়ানো তাঁর ছবি। পয়লা জুলাই সকাল সাড়ে বারোটায় ওঁর বাড়ির ঘরোয়া জন্মদিনের অনুষ্ঠানে সেই ছবি সাজিয়ে অনুষ্ঠান হবে। সাজানোর দায়িত্বও আমার। বিজয় সিং নাহার, অজয় মুখার্জি, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, প্রফুল্ল সেন, অতুল্যবাবুরা জড়ো হবেন সেখানে। সেইমতো সেদিন ছবি নিয়ে প্রস্তুত হয়ে আমায় নিয়ে যাওয়ার নির্ধারিত মানুষের অপেক্ষায় আছি সেই সকাল ন'টা থেকে। হঠাৎই শহরের আকাশ-বাতাস থমথমে হয়ে গেল। এক অজানা আশঙ্কা অনুভব করলাম। তখন টেলিভিশন কোথায়? যিনি নিতে আসবেন তিনি এলেন আমায় নিতে অনেক দেরি করে। জন্মদিন মৃত্যুদিন হয়ে গেল। গোটা শহর শোকস্তব্ধ। লক্ষ লক্ষ বিহ্বল নাগরিক রাস্তায় নেমে পড়েছে। আমি সেদিন সারাদিন সেই শবদেহ নিয়ে, রাতও কাটল অনেকটা। শেষপর্যন্ত বিধানসভা ভবনে দেহ শায়িত রেখে পুলিশের গাড়িতে ফিরলাম, রাত তখন সাড়ে বারোটা।

তাঁর মৃত্যুর পর অতুল্য ঘোষের তত্ত্বাবধানে বিধানচন্দ্র রায় স্মৃতিরক্ষা কমিটি হয়েছিল। ওঁরা সাধারণ মানুষকে আহ্বান করেছিলেন দান দেওয়ার জন্য। লাইন দিয়ে মানুষ রাজভবনে রাজ্যপালিকা পদ্মজা নাইডুর হাতে যে যার মতো 'দান' দিতে লাগলেন। আমিও ছিলাম সেই কাতারে। আমার দান প্যাস্টেলে আঁকা বিধান রায়ের ছবি। অতুল্য ঘোষ রাজভবনে তদারকি করছিলেন সবটা, পদ্মজা নাইডুর হাতে সেই ছবি দিতেই অতুল্যবাবু নিলাম হাঁকলেন। দাঁড়িয়েছিলেন শিল্পপতি আর স্মৃতিরক্ষা কমিটির কোষাধ্যক্ষ দেবেন ভট্টাচার্য। কিনে নিলেন গজানন খৈতান চারশো টাকার বিনিময়ে। বাষট্টি সালে সেটা খুব কম নয়, বিশেষ করে আমার মতো অজানা কোনও ক্ষুদ্র চিত্রীর ছবির ক্ষেত্রে। সেই আমার প্রথম নিলামে ওঠা ছবি।

মনে আছে, বালিগঞ্জে 'ভালো-বাসা' বাড়ির মালিক গোঁফওয়ালা দীর্ঘদেহী কবি নরেন্দ্র দেব কী মজার গল্প বলতেন। কোনও কিছু চাইলে পোস্টকার্ডে ছড়া পাঠিয়ে দিতেন। নরেন দেবের কাছাকাছি বাড়ি সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের। কী সুন্দর গৃহসজ্জা। সাদা পুরু কার্পেট— এখনও খুব কম ধনীর গৃহে তা দেখা যায়। ঘরে ঢুকতে-ঢুকতেই গল্প শুরু করতেন। মনে আছে একদিন রাশিয়াতে রাজকাপুর-নার্গিসের জনপ্রিয়তা নিয়ে কত টুকরো গল্প বলেছিলেন। আবার ওঁদের এক ইতিহাসের মাস্টারমশাই, যাঁর উচ্চারণে একটু গলদ ছিল, সে প্রসঙ্গে সেই অধ্যাপকের লেকচার অনুকরণ করে বলতে লাগলেন, অস্ট্রিয়ার রাজা দ্বিতীয় হেনরি... বিয়ে না হইতে সস্ত্রীক ইত্যাদি ইত্যাদি। উনিও বলতে বলতে লুটোপুটি যান, আমিও।

নানাভাবে নানা সময়ে তাঁকে দেখেছি, কথা শুনেছি। শেষের দিকে বিধান পরিষদের দায়িত্বে দুপুরে চলে আসতেন তাঁর ঘরে। সেখানে ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে পড়াশুনো, লেখালিখি করতেন। তাঁর হাতের লেখা ছিল অসাধারণ। লাইনের ওপর দিয়ে বর্ণমালার সঙ্গে সাযুজ্য রেখে টেনে দিতেন নানান আলঙ্কারিক রেখা। ছবি আঁকতেন অবসরে। শেষ বক্তৃতা শুনেছি এক রবিবার আকাদেমিতে। সত্যজিৎ রায়ের বই উদ্বোধনে সুবেশ নীহাররঞ্জন রায়ের বিপুল প্রশস্তির পর, ওঁর পালা। খাটো ধুতি আর ফতুয়া গায়ে তিনি বলতে শুরু করলেন, শুনেছি বিভূতিবাবুর 'পথের পাঁচালি'কে নিয়ে সুকুমারের পুত্র মানিক একটা সিনেমা করেছে... তারপর সুকুমার রায়েদের সঙ্গে আড্ডা ইত্যাদি। পরে ইংরিজি ভাষায় লেখার ব্যাপারে বিলেতে তাঁদের ছাত্রজীবনে এক বিখ্যাত অধ্যাপকের উক্তি আর মন্তব্য সভাটিকে অত্যন্ত সরস করেছিল। দর্শকাসনে সত্যজিৎ রায় সবটাই উপভোগ করছিলেন আর মাঝে মাঝে ছোট চিরুনি নিয়ে তাঁর সংযত চুলগুলি আরও পরিপাটি করছিলেন। প্রসঙ্গ ছিল সত্যজিৎ রায়ের ইংরিজি ভাষায় লেখা 'আওয়ার ফিল্মস দেয়ার ফিল্মস'।

তারপর সেই পার্ক সার্কাসে— সেই তিনতলায়। পুরনো সিঁড়ি দিয়ে উঠে যেতাম সোজা। ডানদিকের ঘরে অসংখ্য বইয়ের স্তূপে বসে আছেন কাজি আব্দুল ওদুদ। ওঁর কণ্ঠস্বর ভরাট, কিন্তু জড়ানো। অদ্ভুত মাধুর্যমাখা ব্যবহার। মনে আছে ডঃ কালীদাস নাগের কথা। কী সুন্দর দেখতে। ধবধবে সাদা চুল, লালচে রঙের গায়ের রং, রবীন্দ্রচ্ছটায় স্নাত। এক প্রাজ্ঞ শিক্ষাবিদ। আবলুশ কাঠের অলংকরণে সজ্জিত, বিশাল পালঙ্কে আধাশোয়া হয়ে রয়েছেন আরও এক সুন্দর, সুকণ্ঠী, সুবক্তা রবীন্দ্রবলয়ের মানুষ— সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর। উল্টোদিকের দেওয়ালে ট্রটস্কির ছবি। একদিকে

সংসারে কোনও গুরুত্ব নেই আমার। বাবা-মা দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়েন, আমার ভবিষ্যতের কোনও নিশানা খুঁজে না পেয়ে। তখন আমি রোগা। চুলদাড়ি নিয়ন্ত্রণে রাখার কোনও খরচ করি না। খাদি গ্রামোদ্যোগ ভবনে গান্ধি জন্মদিন আর পুজো উপলক্ষে পঞ্চাশ শতাংশ ছাড়ে কাপড় পাওয়া যেত।

গোঁড়া ব্রাহ্ম, অন্যদিকে গোঁড়া বিপ্লবী কমিউনিস্ট। দর্শনে শান্ত, সমাহিত, প্রাচীন বেদ-পুরাণের ঋষির মূর্ত-প্রতীক। শব্দ নিক্ষেপণে প্রতিটি যতিচিহ্নের ব্যবহারে এক অসম্ভব পারদর্শী বাচিক শিল্পীকে প্রত্যক্ষ করেছি। জীবনের এই দেখা ছবির অফুরান স্মৃতি আমার ছবিজীবনের বাইরের নয়।

কোনওরকমে স্কুলের গণ্ডি শেষ করলাম। বাবার শত চেষ্টাতেও ডাক্তারি পড়ার যোগ্যতা অর্জন করতে পারলাম না। সেইসময় এক পরিচিত বন্ধু আমাকে ইন্ডিয়ান আর্ট কলেজ চিনিয়ে দিল। বাড়িতে না জানিয়ে আমহার্স্ট স্ট্রিট থেকে সোজা শশীভূষণ দে স্ট্রিট হয়ে ক্রমশ আঁকাবাঁকা সরু পথ দিয়ে ধর্মতলার চওড়া রাস্তায়। পুরনো বিশাল বাড়ি। চারদিক এলোমেলো, খানিকটা ধ্বংসস্তূপের মতো। ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অসংখ্য মূর্তি। কয়েক ধাপ সিঁড়ি দিয়ে উঠে প্রশস্ত বারান্দা, ঘর। ইসলামি প্রভাবের ছাপ মেঝেতে মোজাইকে। বেশ কয়েক বছরের জন্য আমার আস্তানা। আমার মন্দির। আমার চেনা গন্ধ ওই সৌধের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেল। বাড়ির কেউ জানল না। আমি যে কোনও অপকাজে যুক্ত হয়েছি, আমি যে বাবার ইচ্ছার বিরুদ্ধে গিয়েছি, আমার জীবন যে অন্ধকার— এসবই দুশ্চিন্তার কারণ হল বাড়ির। বছরখানেক লুকোচুরি চলল। বাড়ি থেকে পালিয়ে গোপন অথচ অজানা নয় এরকম আস্তানায়। এখন ভাবলে হাসি পায়। আর্ট কলেজেও অনেক ঘটনা ঘটতে লাগল। আমার অহংকারের কৌটোটা মাঝে মাঝে খুলে দেখি। তখনই সমস্যা দেখা যায়। কলেজের শিক্ষকমশাই পেনসিলে যথাযথভাবে ঘটি আঁকা শেখান। আর মাপ, রেখা নিখুঁত হতে হবে। তার জন্য কত বকুনি! খারাপ হলে সোজা ড্রয়িংসিট ছুঁড়ে ফেলে দেন। পেনসিল যত সুন্দর করেই কাটি না কেন, ওঁর পছন্দ হয় না। সারা মাসে কারও ভাগ্যেই তাঁর প্রশংসা জোটে না। আমি ভাবি, আমি কত তাড়াতাড়ি মানুষের ছবি আঁকতে পারি, জলরঙে এমনকি তেলরঙেও। আর এখন কিনা ঘটিবাটি আঁকার পরীক্ষা দিতে হচ্ছে? হয়তো এঁরা আমার যোগ্যতা জানতে পারেননি। বলিই বা কী করে? আজকে বুঝেছি ওই শৃঙ্খলা, ওই কঠোর চর্চা ভবিষ্যৎ জীবনে কতটা প্রয়োজন। আজকে ফর্ম ভাঙার সাহস তখনই আসে যখন সেই ফর্মকে যথাযথ গড়তে পারার কৌশল জানা থাকে। তাই সেই মফস্সল থেকে আসা জীবনসংগ্রামে হেরে যাওয়া গণেশবাবুদের মতো শিক্ষকেরা সুনিপুণভাবে আমাদের ভিত তৈরি করতে সাহায্য করেছিলেন তাঁদের কাছে আমরা চিরঋণী।

যেন দলছুট আমি। পথ হয়ে গিয়েছে ভিন্ন। মন দিয়ে স্কেচ করি। সর্বত্র ঘুরে বেড়াই। একরাশ উচ্চাশা মানে স্বপ্ন নিয়ে ঘুম ভেঙে যায় খুব ভোরে। রাত্রে শুয়ে পড়ি নানা ব্যর্থতার গ্লানি নিয়ে। আকাঙ্ক্ষা একটাই, ভালো ছবি আঁকব আর চিত্রকর হিসেবে পরিচিত হব মানুষের কাছে। সর্বত্র ঘুরে বেড়াই। কখনও একা, কখনও জুটে যায় বন্ধু, দুয়েকজন বান্ধবীও। বান্ধবীরা মাঝে মাঝে বোঝা হয়ে যায়। খালি কাজ করিয়ে নিতে পারলেই খুশি। কিন্তু ওরা টিফিন আনে কিংবা রং-টং ধার দেয়। আমার অনিয়মে দিন-রাত্রের জীবন। অনেক সময় অপেক্ষার বাঁধ ভেঙে মা-ও শুয়ে পড়েন। বাড়িতে এসে দেখি কখনও ঢাকা আছে খাবার, কখনও নেই। খিদে নিয়ে শুয়ে পড়ি। সবই তো বাড়ির অমতে। তাই আমার প্রতি কারও কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই! বাইরে কিন্তু অনেক বড় জগৎ, সংগঠন করি। ছেলেমেয়েদের নিয়ে মেতে উঠি আমার গড়া সবুজ বাহিনীতে। আমি খেলাধুলো করি না কিন্তু খেলাধুলোর আয়োজন করি, শিশু উৎসবের আয়োজন করি। সবাই আমায় ভালোবাসেন। জীবনে প্রথম অজুরা পাই চোদ্দোটি বিখ্যাত মানুষের তেলরঙে পোর্ট্রেট আঁকার। ম্যাসোনাইট বোর্ডের পিছনদিকে ষোলো ইঞ্চি বাই কুড়ি ইঞ্চি মাপে তেলরঙে সে ছবি। গান্ধিজি, নেতাজি, দেশবন্ধু, শ্রীঅরবিন্দ, বিদ্যাসাগর, রামমোহন আরও কত! ছবি প্রতি কুড়ি টাকা। প্রায় দুশো পঞ্চাশ থেকে তিনশো টাকার অর্ডার। একেকটা ছবি বাঁধানোয় খরচ কুড়ি টাকার বেশি। আমি কিন্তু সব টাকা পাইনি। একশো টাকা পেয়েছিলাম মনে আছে, আর একবার হয়তো কুড়ি টাকা, তাতে দুঃখ ছিল না। মনে মনে অহংকার ছিল। আমার আঁকা অতগুলি ছবি পরপর সেই ভারতীয় সংস্কৃতি ভবনের দেওয়ালে উঁচুতে টাঙানো রয়েছে। মাঝে মাঝে লুকিয়ে আমিই দেখি বেশি। পটুয়াটোলার সাইনবোর্ড পেইন্টাররা পোর্ট্রেট করতেন তখনকার হ্যারিসন রোডের কমলা স্টুডিওয়। ওখানেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতাম তেলরঙের ছবি আঁকা। জি সি লাহা থেকে আধশুকনো রং পেতাম ফ্রিতে। এইভাবে আমার পরিচিতি ও স্পর্ধা বাড়তে লাগল। সবুজ বাহিনী থেকে পরপর শিশু উৎসব করলাম। মনে হয় আমিই প্রথম কলকাতায় ছোটদের ছবি আঁকার প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিলাম। প্রায় দুশো পঞ্চাশ জন ছোট ছেলেমেয়ে যোগ দিয়েছিল তাতে। খুব ভালোবাসতেন গৌরীনাথ শাস্ত্রী, সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল তখন। সেই কলেজের বারান্দায় প্রতিযোগিতার জায়গা করে দিয়েছিলেন। প্রায়ই চলে যেতাম ওঁর কাছে। আরামকেদারায় উনি পড়াশুনো করতেন। কী সুন্দর গায়ের রং। সবসময় ফিটফাট। কোনও সংস্কৃত পণ্ডিতের সঙ্গে তাঁর তুলনা চলে না। আমি এত সুন্দর এত ঋজু ব্যক্তিত্বের শিক্ষাব্রতী দেখিনি। ওঁর কাছে এক অনুষ্ঠানে আরেক উজ্জ্বল অনিন্দ্যসুন্দর স্বর্ণকণ্ঠের মানুষকে দেখেছিলাম। তিনি হলেন দিলীপ রায়।

সংসারে কোনও গুরুত্ব নেই আমার। বাবা-মা দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়েন, আমার ভবিষ্যতের কোনও নিশানা খুঁজে না পেয়ে। তখন আমি রোগা। চুলদাড়ি নিয়ন্ত্রণে রাখার কোনও খরচ করি না। খাদি গ্রামোদ্যোগ ভবনে গান্ধি জন্মদিন আর পুজো উপলক্ষে পঞ্চাশ শতাংশ ছাড়ে কাপড় পাওয়া যেত। মুজফফুরি খাদিতে রং করা গেরুয়া আর সাদা পাজামা একসঙ্গে তিন সেট করে নিতাম। খুব ভালো কাপড় পাওয়া যেত এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা মিটারে। পাজামার সেলাই দশ আনা। বড়ুয়াকলার পাঞ্জাবির মজুরি পাঁচ সিকে। কলেজ স্ট্রিটের গোপালবাবু আমার ফ্যাশন ডিজাইনার। আর হ্যাঁ, বাড়ির বাইরে আমার দিন কাটে বেশি, বাড়ির কাছে ভবানী দত্ত লেনে সেই যে ধীরেন ধর যিনি বিপ্লবী কমিউনিস্ট নেতা আর অসম্ভব দিলখোলা, সংসারে এক সন্ন্যাসীর মতো, যিনি আমাকে রাজভবনে ভরোশিলভ-কে ছবি আঁকতে দেখেছিলেন। ওই অনুষ্ঠানের আয়োজক ছিলেন তৎকালীন কমিউনিস্টরা, মানে (ইসকাস) ইন্দো-সোভিয়েত কালচার সোসাইটি। সেই উনি মানে ধীরেন ধর আমায় ছোঁ মেরে ওঁদের বাড়িতে ধরে এনেছিলেন ভবানী দত্ত লেনে। বাড়িতে হইচই করে

সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়েছিলেন। তাঁর বাবা প্রখ্যাত পুস্তক ব্যবসায়ী ইউ এন ধর। সেই যোগসূত্র থেকে আমার প্রশ্রয়, আড্ডা, কৈশোর-তারুণ্যের রসদ ওই বাড়িকে কেন্দ্র করেই চলতে লাগল। ওই বৃহৎ পরিবারের সকলেই প্রতিষ্ঠিত, অর্থবান, সুবর্ণবণিক, শিক্ষিত। জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ নিয়ে সারাবছর ধরে প্রায় প্রতি মাসেই কোনও না কোনও উৎসব লেগে থাকত। আমার বয়সি কিংবা কয়েক বছরের ছোটবড় বিভিন্ন পিসতুতো, জ্যাঠতুতো, মাসতুতো ছেলেমেয়েরা আমার বন্ধু হয়ে গেল। বিচিত্র সেই বাড়ি। গম্ভীর প্রতাপশালী উই এন ধর গড়গড়া টানতেন। বারান্দায় ময়নাপাখি ডাকত। সেজোছেলে ধীরেন ধর ছাড়া তাঁর বড়ছেলে, মেজোছেলে, ছোটছেলে সকলেই বই-ব্যবসায় জড়িয়ে ছিলেন। ওই গোটা বাড়ি জুড়েই বই ব্যবসার কাণ্ডকারখানা চলত। একতলায় লেখকেরা, প্রকাশকেরা বৈঠক করতেন। একদিকে বাঁধাই-ছাপাই এসব চলত। আর ছিল বিশাল গোডাউন। আবার কোনও জায়গায় লাল-নীল মাছের অ্যাকোয়ারিয়াম। কোথাও অজস্র পাখির কিচিরমিচির, গাছপালা। কারও অজস্র গ্রামোফোন রেকর্ড সংগ্রহ। বাড়িতে দু-চারটে সেকেন্ড হ্যান্ড বিদেশি গাড়ি। সবসময় কিছু না কিছু নিয়ে সবাই মেতে আছে। আমি সে বাড়ির সেই পরিবেশের একটা অংশ হয়ে গিয়েছিলাম। আমার রোজনামচায় দিনের আকর্ষণ ছিল ওই বাড়ি। সেখানে সরস্বতী পুজো হত। ঠাকুর সাজানো হত নতুন নতুন ভাবনা নিয়ে। সেই সবুজ বাহিনী থেকেই সরস্বতী পুজোর মাতামাতি। প্রতি বছর নতুন নতুন ভাবনায় ঠাকুর গড়ি। প্রায় দেড় মাস ধরে আমরা ব্যস্ত হয়ে পড়তাম ওই দিনটার জন্য। কী মাতামাতিই না করতাম! কত লোকের বাহবা পেতাম। এখানকার পরিবেশ আমার বাড়ির ঠিক বিপরীত। ছেলেবেলা থেকেই যেসব নিয়ে থাকতে ভালোবাসতাম লাল-নীল মাছ, নানান জীবজন্তু, পাখি, গাছপালা আর ছবি আঁকার প্রশ্রয়— এসবই মিলে যেত এখানে। পড়াশুনো নিয়ে কেউ কথা বলত না। একটা প্রাণবন্ত পরিবেশ ছিল। ধীরেন ধর কাউন্সিলর থেকে এম এল এ হলেন। বাড়িতে কখন আসেন, কখন চলে যান তার ঠিকঠিকানা নেই। বাকিরা ব্যবসা করে, মেতে থাকে সংসারে। উনি পার্টি আর তার আদর্শে অটুট। ভাবধারা রক্তধারার সঙ্গে তার মিল ছিল না সে বাড়ির অন্য কারও। উনি আমায় খুব ভালোবাসতেন। এমনকি যেদিন কলকাতায় চাঁদের মানুষ ইউরি গ্যাগারিন এলেন, উনি নিয়ে গিয়েছিলেন মহাজাতি সদনের সংবর্ধনাসভায়। আমি পাশে বসেছিলাম গ্যাগারিনের। আমার ছবিজীবনের ছেলেবেলার

আর্ট কলেজের খরচপত্তর, বেঁচে থাকার রসদ এসবই সংগ্রহ করতাম কলেজ স্ট্রিট পাড়ার অনেক দোকানে ঘুরে ঘুরে। প্রচ্ছদ এঁকে, ইলাসট্রেশন করে, কখনও পোস্টার লিখে আর বসুমতী, যুগান্তর, আনন্দবাজার— এই তিন প্রতিষ্ঠানে রবিবারের কাগজে গল্পের কিংবা উপন্যাসের অলংকরণ করে। যুগান্তর দিত পনেরো টাকা। আনন্দবাজার পঁচিশ টাকা। রমাপদবাবুর মুড হলেই হল। কাজ পেয়ে যেতাম।

অনেক অংশ জুড়ে ছিলেন ধীরেন ধর, তাঁর পরিবার আর তাঁর পিতা গম্ভীর, বনেদি, সম্ভ্রান্ত পরিবারের মধ্যমণি ইউ এন ধর।

তখন সেকেন্ড ক্লাস ট্রাম আমার স্থলযান। বাসের চেয়ে ট্রামকে ভালোবাসতাম বেশি। কলকাতার পড়ন্ত বিকেলে ট্রামে জানালার ধারে বসে সুখী-নগরের হাওয়া গায়ে দোলা দিত। ট্রাম না পেলে আমার মহাযান ছিল দোতলা বাস। দোতলা বাসের ওপর একেবারে সামনের সিটে বসে পড়তাম। তখনও পৃথিবীর জটিলতা বুঝতাম না। তাই সবকিছু থেকেই মজা-সুখ-আনন্দ ছেঁকে নিতাম। বহুদিন পরের টাইটানিক জাহাজের সামনে তরুণ প্রেমিক-প্রেমিকা যেমন উত্তাল হাওয়ায় রোমাঞ্চিত হবে, দোতলা বাসের সামনের সিটে বসে আমি তখনই ওই জুটির যৌথ রোমান্সের যেন একক ভাগীদার হতাম। আর মাঝে মাঝে তখন দোতলা বাসে চড়লেই কলকাতার যিশুর কথা মনে পড়ে যেত। কোনও যিশু রাস্তা পারাপার করছে কিনা দেখে নিতাম। কলকাতাকে জানা, কলকাতার গন্ধ উপলব্ধি করা, আর্ট কলেজের পদাতিক জীবনে যেভাবে উপলব্ধি করেছি বা চিনেছি তা জীবনের বিভিন্ন স্তরে আমার কাজে লেগেছে। এখনও আমি শ্যামবাজার, বাগবাজার থেকে ভবানীপুর, রাসবিহারী পর্যন্ত যে-কোনও রাস্তা শুধু ফুটপাথ দেখে চিনে নিতে পারি। অভাব ইন্দ্রিয়শক্তিকে অনেক সজাগ রাখে। অভাব গ্রহণ করার ক্ষমতা, জীবনের গতিশক্তি বাড়িয়ে দেয়। তাড়না ও আকুতি দুই-ই তো আমাদের গতিশীল রাখে! অভাবি সময় শরীরে, মনে মেদ জমতে দেয় না। আর্ট কলেজের খরচপত্তর, বেঁচে থাকার রসদ এসবই সংগ্রহ করতাম কলেজ স্ট্রিট পাড়ার অনেক দোকানে ঘুরে ঘুরে। প্রচ্ছদ এঁকে, ইলাসট্রেশন করে, কখনও পোস্টার লিখে আর বসুমতী, যুগান্তর, আনন্দবাজার— এই তিন প্রতিষ্ঠানে রবিবারের কাগজে গল্পের কিংবা উপন্যাসের অলংকরণ করে। যুগান্তর দিত পনেরো টাকা। আনন্দবাজার পঁচিশ টাকা। রমাপদবাবুর মুড হলেই হল। কাজ পেয়ে যেতাম। এছাড়া আমার বাড়তি রোজগার হত পোর্ট্রেট করে। আরেকটা ঘটনার কথা বলি, তখন থার্ড ইয়ারে। সর্বপল্লি রাধাকৃষ্ণণ এসেছেন কলকাতায়। ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে বক্তৃতা দেবেন বেলা এগারোটায়। আনন্দ মুখুজ্যেকে প্রস্তাব দিই, উইংসের আড়ালে বসে আমি ওঁর ছবি আঁকতে চাই। সেইমতো সব ঠিকঠাক হয়। আমি জায়গাও দেখে আসি— কখন, কীভাবে কাগজ, পেনসিল, বোর্ড নিয়ে ওঁর স্কেচ করব। আগের দিন রাত্রে হঠাৎই জানতে পারি ওখানে নাকি আমাকে বসতে দেওয়া হবে না। ওই স্টেজ রাষ্ট্রপতির উপস্থিতিতে সবই নাকি কেন্দ্রীয় সুরক্ষাকর্মীর হাতে চলে যাবে। স্টেজে আর স্টেজের চারপাশে কারা থাকবে তাঁরা ঠিক করেছেন। তাতে আমার পাত্তা জোটেনি। মন খারাপ। হ্যাঁ, জেদ ধরলাম। আমি ওঁর স্কেচ করবই। পাড়ায় আর্ট কলেজের বন্ধু রমেন থাকত। রাত্রে তার বাড়িতে গিয়ে ওর পেনসিল ধার চাইলাম। আমার পেনসিল ছিল না। রমেনকে বললাম, আমি প্রফুল্ল সেনের কাছে অনুমতি নিয়ে রাষ্ট্রপতির ছবি আঁকব। উনি আমাকে খুব স্নেহ করতেন, কিছু একটা আমাকে ব্যবস্থা করে দেবেন। সেইমতো সকাল সাড়ে আটটায় রমেনকে সঙ্গে নিয়ে রাইটার্সে গেলাম। মূল ফটকের পাশে ফুটপাথে ওকে দাঁড় করিয়ে আমি পৌঁছে গেলাম দোতলায় মুখ্যমন্ত্রীর ঘরে। রাইটার্সে তখন অবারিত দ্বার আমার। পুলিশরাও আমাকে চিনত। আমি মাঝে মাঝেই প্রফুল্ল সেনের গাড়িতে চেপে মেন ফটক দিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ওঁর ঘরে ঢুকে পড়তাম। সেদিনও নিজেই প্রফুল্ল সেনের ঘরে ঢুকে ওঁকে বলতেই উনি খুব ধমক দিলেন। বললেন, তুমি আগেই বলতে পারতে, আজ ঠাসা কর্মসূচি। এক্ষুনি লেডি গভর্নরের কাছে যাব। ওখান থেকে আমাদের কনভয় বেরিয়ে পড়বে, প্রেসিডেন্ট মিটিং সেরে তিনটেয় কলকাতা

প্রেসিডেন্ট মিটিং সেরে তিনটেয় কলকাতা ছাড়বেন। আমায় নিয়ে খুব চিন্তায় পড়লেন। সঙ্গে সঙ্গে চেয়ার ছেড়ে উনি বললেন, চলো আমার সঙ্গে। লিফটে করে নীচে নামলাম। তটস্থ লোকজন প্রস্তুত। নীল রঙের প্লাই-মাউথ গাড়িতে সওয়ারি আমরা দুজন। মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল সেন আর আমি। গাড়ি দ্রুত চলল রাজভবনের দিকে। কাচ দিয়ে দেখলাম, ফুটপাথে মূল ফটকের কোণে রমেন দাঁড়িয়ে আছে। ইশারায় চোখাচোখি হল। মনে হল ওকে মর্ত্যে রেখে আমি স্বর্গের সওয়ারি হয়েছি। তারপর রাজভবনের দোতলায় উনি একটা ঘরে আমায় বসতে বলে কোথায় চলে গেলেন। একটু পরেই সে ঘরে অতুল্য ঘোষ ঢুকলেন। সঙ্গে বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত।

অতুল্য ঘোষ ও বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতের কথোপকথনে জানতে পারলাম রাষ্ট্রপতি এই ঘরেই আসছেন। আমি পেনসিল, বোর্ড, কাগজ ঠিকঠাক হাতে নিয়ে নিলাম। দু-এক মিনিটের মধ্যে শান্ত-স্থিতধী, সাদা লম্বা গলাবন্ধ কোট, সাদা ধুতি আর সাদা পাগড়ি পরিহিত, উন্নত নাসিকা, বুদ্ধিদীপ্ত দৃষ্টিতে বাইফোকাল, উনি বসলেন। পিছনে বসলেন রাজ্যপাল পদ্মজা নাইডু। জরুরি আলোচনা চলল সাকুল্যে দশ মিনিট। আমি স্কেচ করে ফেললাম। একটু বাকি থেকে গেল। রাধাকৃষ্ণণ উঁকি মেরে জিজ্ঞেস করলেন, হ্যাভ ইউ ফিনিশড? বলতে-বলতেই সবাই উঠে পড়লেন। বেরতেই সামনে দেখলাম প্রফুল্ল সেন কার সঙ্গে কথা বলছেন। আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই উনি ইশারায় আমায় অনুসরণ করতে বললেন। লিফট থেকে নীচে নামলাম আমরা। ইতিমধ্যে নেমে গিয়েছেন রাষ্ট্রপতি এবং অন্যান্যরা। অপেক্ষারত সেই নীল প্লাই-মাউথ। পিছনে বসলেন রাজ্যপাল কুমারী পদ্মজা নাইডু। মাঝখানে রাষ্ট্রপতি সর্বপল্লি রাধাকৃষ্ণণ, পাশে মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল সেন এবং ড্রাইভারের পাশে আমি। রাজভবন থেকে গাড়ি চলল ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটের পথে কলেজ স্কোয়্যারে। উপলক্ষ ইনস্টিটিউটের প্ল্যাটিনাম উদ্‌যাপন। সামনে তিনটি সুদেহী পাইলট মোটরবাইক। খুব দ্রুত নয়, কিছুটা বিলম্বিত লয়ে গাড়ি চলেছে রাজপথ দিয়ে। রাস্তার দুধারে উৎসাহী মানুষের ভিড়। কলেজ স্কোয়্যারের কাছাকাছি আসতেই ভিড় উপচে পড়ল। কেউ কেউ আমার পরিচিত। বিস্ময়াবিষ্ট আমি, তারাও। ইনস্টিটিউটের সভা সেরে গাড়ি নিয়ে গেল মহাজাতি সদনে। সেখানে নিবেদিতা শতবর্ষের অনুষ্ঠান। আমি আর নামিনি। রাষ্ট্রপতি অনুষ্ঠানে ছিলেন সাকুল্যে পনেরো মিনিট। এয়ারপোর্ট যাত্রা করলাম। দুর্গা চক্রবর্তী তখন কলকাতার শেরিফ। এয়ারপোর্টে ঢুকে লাউঞ্জে বসা হল পাঁচ মিনিট। লেবু

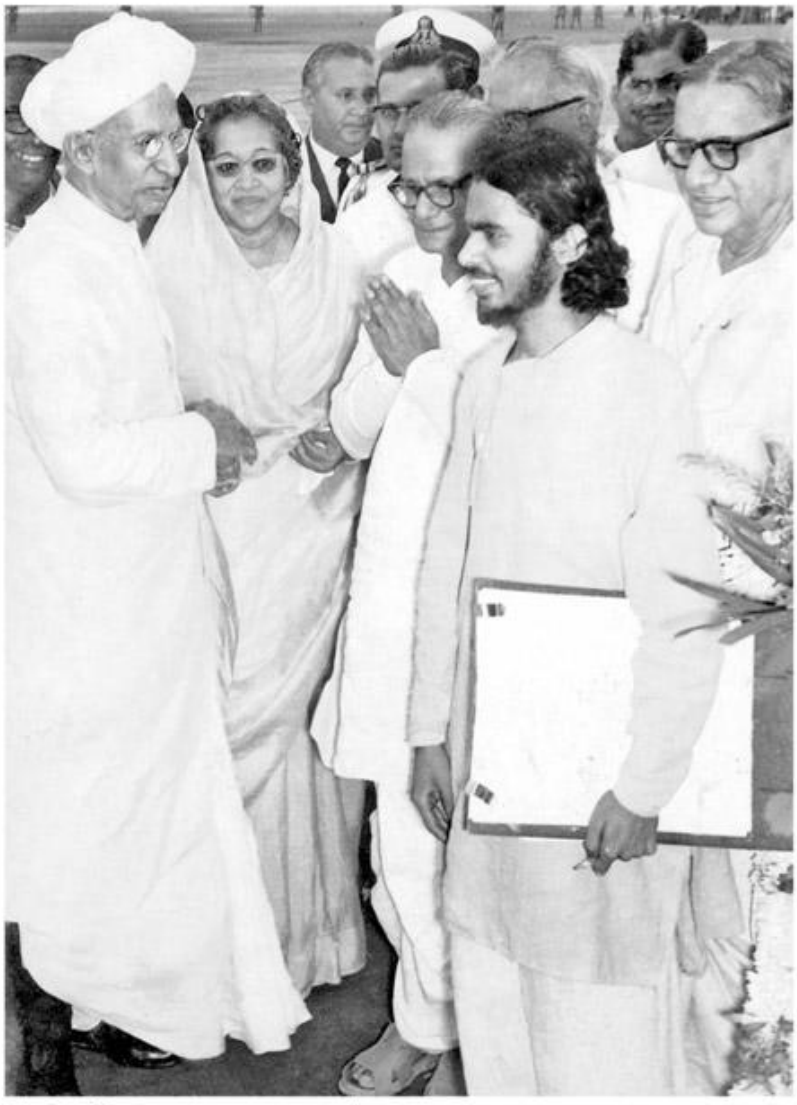

রাষ্ট্রপতি সর্বপল্লি রাধাকৃষ্ণণ ও রাজ্যপাল পদ্মজা নাইডুর সঙ্গে লেখক

শরবতে আপ্যায়িত করলেন আমাদের। আমি এই ফাঁকে বাকি কাজটুকু সারলাম। রাষ্ট্রপতি সস্নেহে আমার স্কেচটিতে স্বাক্ষর এঁকে দিলেন। আমরা একেবারে রানওয়ে পৌঁছে গেলাম। পরস্পর শুভেচ্ছা বিনিময় করলেন। উড়ে গেলেন দিল্লি। প্রফুল্ল সেন হ্যারিসন রোডের মুখে আমাকে নামিয়ে দিলেন। আমার বাড়ি তো ওখান থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে।

ইতিমধ্যে আরও কিছু ইতিহাস-প্রসিদ্ধ মানুষের আগমন ঘটেছে এ শহরে। খ্যাতনামা মানুষের আসা শুনেই ছুটে যাই, ছবি আঁকি। নিজের উৎসাহে নিজেই ডগমগ করি। কিছু কিছু বন্ধু আমরা জড়ো হয়ে এখানে-ওখানে যাই। স্কেচ করি, জলরঙে ছবি আঁকি। মনে আছে আশি টাকা সংগ্রহ করে দার্জিলিংয়ে যাওয়া জলরঙে ছবি আঁকার জন্য। আমার বন্ধু প্রবীর আমার সঙ্গ নেয়। আমিই টিকিট কাটি। আর জানাশুনো ভদ্রলোকের সূত্র ধরে দার্জিলিংয়ে একটি বাড়িতে থাকার ব্যবস্থা করি। গন্তব্যে পৌঁছে প্রবীর জানায়, ও কোনও পয়সা সঙ্গে আনেনি। খুব রাগ হয়। কিন্তু বন্ধু-সঙ্গর দাম তো অনেক। সারাদিন ঘুরে ঘুরে ছবি আঁকি। আর রাত্রে ওই বাড়ির একতলায় কাঠের মেঝেতে শতরঞ্চি, কম্বল পেতে মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ি। একদিন মাথায় আসে, মলের একধারে ছবি টাঙিয়ে বিক্রি করব আর পোর্ট্রেট আঁকব। যদি কেউ আমায় দিয়ে আঁকিয়ে নেন। সেই মতলবে ক'দিনের জমানো ছবি, সুতো আর সেফটিপিনে টাঙিয়ে আর পাঁচ টাকার বিনিময়ে পাঁচ মিনিটে ছবি আঁকার বিজ্ঞাপন সাঁটি দার্জিলিংয়ে মলের ধারে একটা কোণায়। বিকেলের পড়ন্ত রোদে ঝকঝকে মানুষেরা

কৌতূহলী হয়ে একেকজন বসে যান মুখ আঁকাতে। বেশ ভিড় হয়। রোজগার হয় পোর্ট্রেট করেই বেশি। দুয়েকটা জলরঙের ছবিও বিক্রি হয়ে যায়। দর করে কেউ দেন তিরিশ কিংবা চল্লিশ।

এখানেই এক ভদ্রলোক আমন্ত্রণ করে বলেন, আমি যদি তাঁদের হোটেলে গিয়ে অনুরূপভাবে পোর্ট্রেট করি তাহলে বেশ কয়েকজনের ছবি আঁকতে পারব। ওঁরা জানান, বিনিময়ে একেকটি পোর্ট্রেটে পাব দশ টাকা। কথামতো পৌঁছে যাই পরদিন সকাল ন'টায়। এলগিন হোটেল। হোটেলের ফুরফুরে পরিবেশে একেকজন বাসিন্দা আসেন বাগানছাতার তলায়। আমি একপাশে, অন্যদিকে আমার মডেল। আমি এঁকে যাই আর টাকা পাই। পাঁচটা কি ছ'টা মুখের পর একজন ভদ্রমহিলা আসেন। বোধহয় তিনি খুব নামি, বোধহয় ধনীও, বোধহয় অন্য দেশের। মোটাসোটা। গাঢ় কালো। তায় পুরো রং মুখে, ঠোঁটে।

ভদ্রমহিলাকে দেখাশোনা করার জন্য তিনজন সহকারী ব্যতিব্যস্ত। কেউ তাঁর বসার কেদারা সরিয়ে দেন, ভ্যানিটি ব্যাগটা ঠিকঠাক রেখে দেন। তিনি তাঁর ছোট আয়না বার করে দেখে নেন শেষবারের মতো মনের মুখটি। আমি আঁকতে শুরু করি। দশ বাই পনেরো ইঞ্চি মাপের সাদা কার্টিজ পেপার। একটি বোর্ডে আটকানো, আর হাতে সিক্স-বি পেনসিল। এই পেনসিলে খুব গাঢ় কালো দাগ ফোটে। ভদ্রমহিলারও রং বেশ গাঢ় কালো। নাক-চোখ খুব বলিষ্ঠ। ঠোঁট পুরু। মনে হয় শ্রীলঙ্কা কিংবা মলদ্বীপের বাসিন্দা। আমি মনের আনন্দে এঁকে চলি। কোঁকড়ানো চুল। বড় বড় কালো চোখ। রোদছায়াতে ধাতুর মূর্তির মতো আমার চোখে সেই ভদ্রমহিলার মুখ। তাঁর সহকারী আর হোটেলের উৎসাহী কিছু বাসিন্দা ঘিরে রয়েছেন আমাকে। সাদা কাগজ থেকে ফুটে ওঠা ছবির প্রতি কৌতূহল সকলের। ছবি শেষ হওয়ার মুহূর্ত। মডেলের ভালোলাগার মুহূর্ত। আর পকেটে টাকা ঢোকানোর সুখ। এই তিন ক্ষণের জন্য অপেক্ষায় থাকি। ছবি শেষ হয়। সই করি। পাশে ঘিরে-থাকা দর্শকের অনুমোদন উপলব্ধি করি। তারপর সেই ভদ্রমহিলার হাতে ছবিটি তুলে দিই। তিনি হাতে নিয়ে একপলক দৃষ্টিতে দেখেন। বিরক্ত মুখে কেদারা ছেড়ে উঠে দাঁড়ান। আর মুহূর্তের মধ্যে কাগজটি ছিঁড়ে ফেলে বাগানে ছুঁড়ে দেন। গাঢ় পেনসিলে তাঁর যে সৌন্দর্যকে আমি বার করতে চেয়েছিলাম— আয়নায় ধরা পাউডার লিপস্টিকে ঢাকা সে মুখ তাঁকে চেনাতে দেয়নি! আমার অহংকারের কৌটো আটকে যায়। তিনি আমায় টাকা দেননি। আমিই বা চাই কী করে! তারপর আর হোটেলে বসিনি। হয়তো আরও কেউ অপেক্ষায় ছিলেন। হঠাৎই দার্জিলিংয়ের পাহাড়ি আকাশে জলভরা মেঘ এসে ঝলমলে রোদ ঢেকে দিল। বন্ধুর সঙ্গে মুখ চাওয়াচাওয়ি করে চলে গেলাম কোনও এক চিনা রেস্তোরাঁয়। দ্বিপ্রহর। সাকুল্যে ছিলাম সাত কি আট দিন। আমার পুঁজি ছিল আশি টাকা। বন্ধুর কিচ্ছু ছিল না।

সারাদিন ঘুরে ঘুরে ছবি আঁকি। আর রাত্রে ওই বাড়ির একতলায় কাঠের মেঝেতে শতরঞ্চি, কম্বল পেতে মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ি। একদিন মাথায় আসে, মলের একধারে ছবি টাঙিয়ে বিক্রি করব আর পোর্ট্রেট আঁকব। যদি কেউ আমায় দিয়ে আঁকিয়ে নেন। সেই মতলবে ক'দিনের জমানো ছবি, সুতো আর সেফটিপিনে টাঙিয়ে আর পাঁচ টাকার বিনিময়ে পাঁচ মিনিটে ছবি আঁকার বিজ্ঞাপন সাঁটি দার্জিলিংয়ে মলের ধারে একটা কোণায়।

তখন টিকিটের আর কী দাম। টিকিট কেটে আর যাবতীয় ব্যবস্থা করে রং, তুলি, জলরঙের কেক আর অনেক হ্যান্ডমেড পেপার নিয়ে দার্জিলিংয়ে পাড়ি। কলকাতায় ফিরি বড়লোক হয়ে। নগদ সাতশো টাকা আমার রোজগার, প্রবীরের অন্তত তিনশো টাকা। কম কী!

ওইসব সময়ে এখনকার মতো একটা বহুজাতিক পরিবেশ এ শহরে গড়ে ওঠেনি। অন্যদিকে বাঙালিদের স্বাভাবিক উদারতা, কিছুটা মূল্যবোধ, আর হ্যাঁ, পরনিন্দা-পরচর্চা এই ছিল চরিত্রগত মোদ্দা বৈশিষ্ট্য। গুন্ডামি, রকবাজি, মাস্তানি, প্রেম নিয়ে দাঙ্গাবাজি মাঝে মাঝে চরম আকারও নিত।

তখন একচেটিয়া কংগ্রেস রাজত্ব। কমিউনিস্ট মানে বিরোধিতা। তাদের চোখে নেতাজি খারাপ। গান্ধিজিও খারাপ, রবীন্দ্রনাথ বুর্জোয়া। কংগ্রেস মানে টাটা-বিড়লা আর ব্যবসাদার দালালের পার্টি। আমরা মধ্যবিত্তরা একধরণের রক্ষণশীলতার শাসনে থাকি। তখন বাঙালি-সমাজে ঘটি-বাঙালের অদৃশ্য লক্ষ্মণরেখা ছিল। পার্টিশন অনেকদিন আগে হলেও এই কলকাতা, শহরতলির অনেক এলাকা জুড়ে বাস্তুচ্যুত বাঙালিরা রয়েছেন, জনসংখ্যা বেড়ে গিয়েছে এ শহরে হিসাবহীনভাবে। কোনও কোনও পরিবারে বন্ধুতা, আত্মীয়তা সূত্রে পূর্ববঙ্গের বাঙালিরা স্থান করে নিয়েছেন, আর কোনও জায়গা দখল, কোনও জায়গা জবরদখল। মাঝে মাঝে তিক্ততা চরম আকার নিত— তাঁদের চোখে আমরা যারা, এদেশীয়রা হলাম বুর্জোয়া, ঘটি, নির্জীব, শয়তান। আর ঘটিদের চোখে বাঙালরা হল লুটেরা, ছুঁচ হয়ে ঢুকে ফাল হয়ে বেরনো এক দস্যুর দল। কোনও ঘটি এলাকায় যদি কোনও বাঙাল অপরাধী হয় তাহলে এককাট্টা হয়ে তার হয়ে প্রতিরোধ করা— এটা ছিল পূর্ববাংলার বাস্তুচ্যুত বাঙালিদের খুব স্বাভাবিক ব্যাপার। এতে ইন্ধন জোগাত কমিউনিস্টরা। তারাই স্লোগান ছড়িয়েছিল— ঘটি বুর্জোয়ারা সর্বহারাদের শত্রু। এখন বুঝি এসব কিছুই অস্বাভাবিক নয়। বিদ্বেষের মধ্যে থেকেই রাজনৈতিক ফায়দা উঠে আসে। রাজনীতির মানুষেরা বিশেষ করে যাঁরা ক্ষমতার রাজনীতি করেন তাঁদের কাছে আদর্শ, ন্যায়বোধের কোনও মূল্য থাকে না। তাঁদের লক্ষ্য সস্তা জনপ্রিয়তা। আর যে-কোনও উসকানিতে মানুষকে তাতানো। সৌহার্দ্য, সহিষ্ণুতার রাজপথগুলো স্তব্ধ। শুধুই বিদ্বেষের চোরাগলি। অথচ এই পশ্চিমবঙ্গবাসী তাঁদের সাজানো শহর, সাজানো জমিজমা, বাগানবাড়ি সমস্ত জলাঞ্জলি দিয়ে সহোদর পূর্ববঙ্গবাসীকে ঠাঁই দিয়েছিলেন। বিপর্যস্ত বাঙালিরাই ঠাঁই পেয়েছিলেন এই পশ্চিমবঙ্গবাসীর কাছে। হয়তো মধুর সম্পর্ক থেকে আমরা অনেক শক্তিশালী বাঙালি হতে পারতাম! কয়েক যুগ লেগেছে বিদ্বেষ কাটাতে। সর্বহারা বাঙালিরা কঠোর পরিশ্রমে জীবনযুদ্ধে জয়ী হয়েছেন। পৃথিবীর কাছে সেই ছিন্নমূল বাঙালিরা আত্মপরিচয় প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছেন। কিন্তু আমার দেখা রাজনীতি, রাজনীতির মানুষরা বিশেষ করে যাঁরা বিদ্বেষের মধ্য দিয়ে অসময়ের সুযোগ নিতে চেয়েছিলেন— ইতিহাস তাঁদের ক্ষমা করবে না। কংগ্রেস নেতা, অত্যন্ত বলিষ্ঠ সংগঠক অতুল্য ঘোষ শহিদ মিনারের জনসভায় একদিন বাধ্য হয়ে বলেছিলেন— পশ্চিমবাংলার সমস্যা বাঙালদের জন্য। এক ভয়ংকর জটিল পরিস্থিতি কমিউনিস্টরা তৈরি করেছিল তাই বাঙালি দুটো জাতিতে বিভক্ত হয়েছিল— ঘটি আর বাঙাল।

গোড়া থেকেই এক বিষাক্ত রাজনৈতিক পরিবেশ তৈরি করেছিল এই দল। তারা

দেশপ্রেমিক ছিল না, দায়িত্ববোধসম্পন্ন ছিল না, একধরণের অবাস্তব আরোপিত ধারণায় তারা তথাকথিত প্রগতিশীল কমিউনিস্ট দল। এঁদের মধ্যে কিছু ধনী বংশের যুবক-যুবতী ঢুকে পড়েছিলেন বিপরীত অবস্থানের বিলাসিতায় রোমাঞ্চিত হতে কিংবা তথাকথিত প্রগতিশীলতার সুযোগ লাভের জন্য। আর ছিলেন সত্যকার আদর্শবাদী আত্মত্যাগী, তাঁরা সৎ কিন্তু কট্টর এবং বাস্তববোধহীন। ওঁরা ছাড়া, ওঁদের মতাদর্শ ছাড়া বাকিরা শত্রু, শোষক, বুর্জোয়া ও দালাল। তখন আমার এসব বোধ ছিল না। কিন্তু সমস্ত উন্নয়নকে থমকে দিয়ে সংস্কৃতি, ধর্ম, বিশ্বাস, দেশাত্মবোধ— সব গুঁড়িয়ে দিয়ে এক মেকি নতুন বিশ্ব গড়ার অজুহাতে এরা লেলিয়ে দিয়েছিলেন অনেক মধ্যবিত্ত মানুষকে। ভারত স্বাধীন হওয়ার পর, দেশ গড়ার সময়টায় কঠোর অনুশাসন আর শৃঙ্খলায়, দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, শেকড়কে জানার প্রয়োজন ছিল। জানা দরকার ছিল যে ভারত একটা দেশ ছিল না, ছিল খণ্ড খণ্ড রাজত্ব। অসংখ্য গরিব মানুষের অদ্ভুত সরলতা, বিশ্বাস আর বিভিন্ন ধর্মের সহাবস্থানই ছিল মানুষের প্রাণশক্তি। ইংরেজ বণিকের শাসন-শোষণের সঙ্গেই ছিল আধুনিক বিশ্বের মূলস্রোত। হিমালয়ের সুকঠিন প্রাচীর ভেদ করে উত্তাল মহাসাগর পেরিয়ে সেই মহাস্রোত পৌঁছে গিয়েছিল ভারতবর্ষের গ্রামেগঞ্জে। স্বাধীনতার পর হয়তো নতুন ভারত গড়ে উঠত তার নিজস্ব ঐশ্বর্যে। ভারতবর্ষ বিশ্বকে শিক্ষা-সংস্কৃতি-মানবতার ক্ষেত্রে এক নতুন দিশা দেখাতে পারত। বিবেকানন্দ-গান্ধি-রবীন্দ্রনাথের প্রকৃত উত্তরাধিকারী হতে পারত। সমাজ-রাষ্ট্র-দর্শন-অর্থনীতির অন্য পথ দেখাতে পারত। কিন্তু তা থেকে আমরা সরে এলাম, আমরা হলাম 'না ঘরকা না ঘাটকা'। পিছিয়ে পড়লাম। ভারতবর্ষ হয়ে গেল কিছু সুযোগ-সুবিধা পাওয়া মানুষ, আর হাড়হাভাতে, গরিবগুর্বো, আদিবাসী, মধ্যবিত্ত, চাষাভুসোর দেশ। অথচ কী অসম্ভব প্রতিভাবান শিক্ষিত, সৃষ্টিশীল, উচ্চকোটির মানুষ জন্মেছিলেন স্বাধীনতার আগে, পরেও। অধ্যাত্মচিন্তা, সমাজচিন্তা, রাষ্ট্রচিন্তা তো বটেই, সংস্কৃতির প্রতিটি অঙ্গনে, সৃষ্টিশীলতার প্রতিটি স্তরে বিপুল শক্তিধর মানুষের দেশ এই ভারতবর্ষ। কিন্তু সেই সুফল সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছয়নি। হয়তো এজন্য সহজ গণতন্ত্রই দায়ী। গণতন্ত্রী না হয়ে আমরা গণতন্ত্র পেয়েছি। কিছু চতুর রাজনীতিক গণতন্ত্রের সহজ পথ জেনে ক্ষমতা দখল করেছেন, করে চলেছেন। আমাদের ভারতবর্ষে, আমাদের পশ্চিমবঙ্গে কমিউনিস্ট দলের ইতিহাস যদি দেখি তা বিভেদের ইতিহাস, অবাস্তবতার ইতিহাস, সাম্প্রদায়িকতার ইতিহাস, ধ্বংসের ইতিহাস। অন্য কিছু নয়। আমার জন্ম এই সন্ধিক্ষণে। দেশকে ভালোবেসে, সমাজকে ভালোবেসে, গোষ্ঠীকে ভালোবেসে, স্বপ্নকে বাস্তবায়িত যা কিছু করতে গিয়েছি, বাধা পেয়েছি অদৃশ্য থেকে। আর সামনাসামনি বাধা এসেছে কোনও না কোনও রাজনীতিকের নির্দেশ থেকে।

ডাঃ বিধান রায় শুধু কৃতী সুচিকিৎসক ছিলেন না, অত্যন্ত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ও দূরদর্শী প্রশাসক ছিলেন, যিনি স্বাধীনতার পর দেশ গড়ার কাজের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুরুষ। তিনি কতখানি ঘৃণিত হয়েছিলেন, কীভাবে বিদ্বেষের বীজ বপন করেছিল কমিউনিস্টরা তাঁর বিরুদ্ধে! দেশের স্বার্থে যে পদক্ষেপই তিনি নিতেন, প্রতি পদে বাধা পেতে হত তাঁকে। আজকের আন্দামান হয়তো অনেকটাই আমাদের পূর্ববঙ্গের আত্মীয়দের গন্তব্য হতে পারত। সেই বাস্তুচ্যুত বাঙালিদের কঠোর পরিশ্রম, মেধায় সে দ্বীপ হয়তো পৃথিবীর কাছে ভারতবর্ষের উজ্জ্বলতম চিহ্ন হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেতে পারত। কিন্তু দায়িত্বজ্ঞানহীন কমিউনিস্ট বিরোধিতায় তা হতে পারেনি। বিদ্বেষের বীজ ছড়িয়ে রাজনৈতিক ফায়দা লুটতে তারা এসবকে গুরুত্ব দেয়নি। এমনিভাবেই পরবর্তীকালে এই কমিউনিস্টদের আরেক গোষ্ঠীর নকশাল আন্দোলন। 'চিনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান' এই স্লোগানে অসংখ্য যুবক নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। বাঙালির তারুণ্য, যৌবন রক্তাক্ত হল। নিজেদের সমস্যা, হাহাকার বাদ দিয়ে মার্কিন-ভিয়েতনাম দ্বন্দ্বে মুখরিত হলাম আমরা। ভিয়েতনাম কিন্তু মার্কিনিদের এখন বন্ধু। সে দেশের লাল পতাকা শুধু একটি রং মাত্র। সেখানে কোনও মেকি দর্শন নেই। আর আমরা এখন কেবল বিবাদেই মত্ত আছি। তথাকথিত সংসারের ঘেরাটোপে আমার তারুণ্য-যৌবন না থাকায় এসব খুব যন্ত্রণা দিত। সমাধানের কোনও পীঠস্থান পাইনি।

ফিরে দেখার কথায় এসব চলে আসে। প্রতিটি মুহূর্তকে, প্রতিটি ভালোবাসা-বেদনাকে হয়তো কোনও জারণ প্রক্রিয়ায় সঠিক রূপান্তর করা যায় না। তবু ছবি আঁকার ভেতরে যে হৃদয় কাজ করে তা কিন্তু এসব থেকেই। একটা কৌশল, একটা কারুকাজ জানা মন আবেগকে সংগঠিত করতে কাজে লাগে। তাই প্রেক্ষাপট চলে আসে। সেই হ্যারিসন রোড/মহাত্মা গান্ধি রোড, কর্নওয়ালিশ স্ট্রিট/নির্মলচন্দ্র স্ট্রিট। কলেজ স্ট্রিটের মোড় পেরিয়ে হিন্দু স্কুল, সংস্কৃত কলেজিয়েট স্কুল, প্রেসিডেন্সি কলেজ, হেয়ার স্কুল, ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি, মেডিকেল কলেজ, কলেজ স্কোয়্যার (গোলদিঘি) আর বিশাল বইপাড়া, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিটকে ঘিরে। এখানকার প্রতিটি অলিগলি, বাড়ি, দোকান, ক্লাব, হোটেল, রেস্টুরেন্ট প্রতিটির ইতিহাস আছে যা বাংলার রেনেসাঁ থেকে ক্ষয়িষ্ণু সমাজের স্বাক্ষর বহন করে। আমার লেখায় জীবনকাহিনির পাশাপাশি কিছু উপলব্ধির শব্দ বেরিয়ে আসে। কিছুদিন আগে ইস্কুলের একদল সহপাঠী বন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হল। পেশাজীবনের বিভিন্ন খাতে তারা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে গিয়েছে নানা স্থলে, নানা স্তরে। আমার দিন কাটে বেশিরভাগই আগামীর স্বপ্ন দায়িত্বে। বিগত দিনের চোরা-অম্বল যাতে না আসে তার জন্য পথ্য নিই। কিন্তু আসে। অনেকদিন পর পুরনো বন্ধুদের সান্নিধ্যে এসে দেখি তারা সকলেই অম্বলের রোগী। শুধুই পুরনো দিনের ঢেকুর তুলে চলেছে। এর মধ্য দিয়েই বাংলার শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের বন্ধ্যাত্বের কারণ বুঝতে পারি। কারও মাথাব্যথা নেই দেশের জন্য। সমাজের জন্য, অন্যায়-অসাম্যের জন্য কোনও উত্তেজনা নেই। যখনই ওদের কাছে এসব কথা বলার চেষ্টা করি ওরা ভাবে আমি রাজনীতির লোক। এরা এত সাবধানি! এরা এত নিজেকে বাঁচিয়ে চলায় বিভোর যে আমার বিস্ময় লাগে। শিক্ষাদীক্ষার মানে কী! শিক্ষা মানে তো একটা চাকরি পাওয়া, গেরস্ত হওয়া, আর নিজেকে বাঁচিয়ে চলা নয়! অথচ ফ্ল্যাশব্যাকে যখন ওই সময়ে ফিরে যাই— ফিটন গাড়ি চেপে কোচওয়ান, দেহরক্ষী নিয়ে নামত আমার বন্ধুরা। বিখ্যাত সব পরিবারের ছেলে তারা। বাবা-ঠাকুরদার বিশাল প্রতিষ্ঠা, আমি তুলনায় দরিদ্র। বাবা কৃতী ছিলেন কিন্তু তকমাওলা কোনও হর্ম্যের বাসিন্দা আমরা ছিলাম না। সে সময় বন্ধুদের বাড়িতে খুব যাতায়াত করতাম, আদর পেতাম এবং প্রশংসাও। এখন স্বপ্নের মতো লাগে। কারও বাড়িতে ফোয়ারা, বিশাল বারান্দায় কাস্ট-আয়রন-এর কারুকাজ করা রেলিংয়ের ছায়া। ইতালিয়ান মার্বেলে ঢাকা বিশাল বারান্দায় স্বপ্নের মজলিশ। এককোণে কেউ বসে বাবুদের ধুতি কুঁচোচ্ছেন। অদ্ভুত দুধে-আলতা গায়ের রঙে, কটা চোখে সুন্দরী নারীরা ইতিউতি ঘোরাঘুরি করছেন। শরীরী-ভাষায় আমার কাছে তারা সলজ্জ আভিজাত্যে সংকোচ প্রকাশ করছেন। আমি খুদে হলেও, সন্তানতুল্য হলেও পুরুষ কিনা! সেইসব কয়েক মহলা বাড়ির ছাদে-ছাদেও ঘুরেছি। কত কাহিনির জন্ম, সংস্কার আর বংশমর্যাদার শাসনে। বেগুনি হয়ে যাওয়া কত নিষ্পাপ প্রেম, ভালোবাসা, ইচ্ছা, স্বপ্নের কথা শুনতে পাই। কলকাতার ভেতর যে কলকাতা, ভারতের ভেতর যে ভারতের কত বৈচিত্র্য, ফ্ল্যাশব্যাকে দেখতে পাই তা। অর্ধশতাব্দীর কিছু বছর আগেও যা ছিল, যা হত, সেই বাস্তব এখন স্বপ্ন। সেই স্বপ্ন এখন বাস্তবে নিরেট হয়ে গিয়েছে।

ক্রমশ

কবিতা-পরিচয়

*একটা ঘটনা মনে পড়ছে যাতে বুঝতে পেরেছিলাম সুনীল কত খোলা মনের মানুষ ছিলেন এবং বিরোধী মত বা চিন্তার প্রতি কখনও কোনও বিদ্বেষ পোষণ করতেন না। সেটা ১৯৬৬ সাল। এক বার 'কবিতা-পরিচয়' পত্রিকায় সুনীল একটা কবিতা নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছিলেন। এরপর ওই পত্রিকাতেই অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত সুনীলের লেখার তীব্র প্রতিবাদ করে একটা লেখা লেখেন যার মূল কথা সুনীল লেখাটার কিছুই বোঝেননি। সুনীল আবার এর একটা ব্রিলিয়ান্ট উত্তর দিয়েছিলেন। যাই হোক ঠিক এর দিন কয়েক পরে পড়তি দুপুরে আমারই বাড়িতে আমি আর অলোকরঞ্জন গল্প করছি, হঠাৎ সুনীল এসে হাজির। অলোকরঞ্জন একটু অপ্রস্তুত। আমার মনেও একটা আশঙ্কার ভাব। কয়েক দিন আগেই দুজনের মধ্যে একটা বেশ ধারালো বাদানুবাদ হয়ে গেছে। এখন কী হবে। শেষে অলোকরঞ্জন বললেন, 'আপনার লেখাটা পড়লাম।' সুনীল আশ্চর্য সহজ ভাবে হাসতে হাসতে উত্তর দিলেন, 'বেশ তো এবার তাহলে এরও জবাব লিখুন।' নিমেষে পরিবেশটা সহজ হয়ে গেল। এরপর তিনজনে দীর্ঘক্ষণ আড্ডা চলল। —**শঙ্খ ঘোষ***

সৌজন্য: 'এই সময়' ২৬ অক্টোবর, ২০১২

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় আলোচিত যে কবিতাটির কথা শঙ্খ ঘোষ উল্লেখ করেছেন, কবি বা কবিতার নাম ছাড়াই, সেটি আসলে শঙ্খ ঘোষেরই 'সুন্দর'।

প্রসঙ্গটি আরও প্রাঞ্জল হবে যদি কয়েক বছর আগের এই কথার টুকরোটি এখানে উদ্ধৃত করি। নেপথ্যের এই ঘটনা অবশ্য আরও আগের। সম্ভবত 'কৃত্তিবাস'-এ প্রথম উল্লেখ করেছি। —সম্পাদক

শঙ্খ ঘোষ নামে যে ব্যক্তিমানুষটি তাঁকে কি খুব ঘনিষ্ঠভাবে চিনি? না, সে-যোগ্যতা আমার নেই। তবে, কখনও কখনও তাঁর সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ কেটেছে। কথায় কথায় চৈত্রের বাতাসে শিমূলতুলোর মতো ভাসতে ভাসতে প্রহর থেকে প্রহরে ছড়িয়ে গিয়েছি। একবার তাঁর শ্যামবাজারের ফ্ল্যাটে রাতে কথা বলতে বলতে গরম খিচুড়ি ভোগ শেষ করে কথা যখন শেষ হল তখন সকাল হয়ে গেছে, দুজনেরই খিচুড়ি-খাওয়া হাত শুকিয়ে খরখরে। আরেকদিন। সেদিন অবশ্য রাত বারোটা বাজার একটু আগে পনেরো মিনিটের বিরতিতে আমাকে একবার উঠে যেতে হয়েছিল— ঠিক রাত বারোটায় শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড়ে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় আমাকে 'কবিতা-পরিচয়'-এর জন্য তাঁর লেখাটা দেবেন। ক'দিন আগেই যতদূর মনে পড়ে, 'কবি ও কবিতা' পত্রিকায় সদ্যপ্রকাশিত শঙ্খ ঘোষের 'সুন্দর' কবিতাটি কলেজ স্ট্রিটে পাতিরামের স্টলে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে পড়েই আমি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কে এই কবিতাটি নিয়ে 'কবিতা-পরিচয়'-এ লেখবার অনুরোধপত্র পাঠাই। মধ্যরাতের শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড়ে গিয়ে দেখি সুনীলদা ফুটপাতের রেলিং ধরে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করছেন। আমি ঠিক সময়মতোই এসেছি, অথচ তিনি কথামতো লেখাটা দিতে পারলেন না, সেই অপরাধবোধের গভীর আন্তরিকতা সেদিন আমাকে অবাক করেছিল। আমি যে আজকের রাতটা কাছেই শঙ্খ ঘোষের বাড়িতে আছি, সুনীলদা জানতেন না। আবার সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় যে তাঁরই নতুন একটি কবিতা নিয়ে লিখছেন, শঙ্খবাবুকে তাঁর রুচির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে একেবারেই জানাইনি। যাই হোক, লেখাটা এখনও হয়নি, কাল অবশ্যই দেবেন, তবে আমাকে আর এত কষ্ট করে এত দূরে আসতে হবে না, কাল কলেজ স্ট্রিট কফিহাউসে নিশ্চয়ই দেখা হবে, সেখানেই লেখাটা অবশ্যই নিয়ে আসবেন— এইসব সবিস্তারে শুনে আমি শঙ্খ ঘোষের কাছে ফিরে এসে আবার পুরনো প্রসঙ্গের খেই ধরি।

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

সৌজন্য: কারুকথা এইসময়, মে-জুলাই '০৯

'সুন্দর' : শঙ্খ ঘোষ

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

লোকে তো কোথাও যাবে, তাই আসি, এমন কিছু নয়
নিহিত পাতালছায়া ভরে দেয় আকাশপরিধি।
কিছু তো দেখবে লোকে, তাই দেখি, ফসলের সীমা,
বুকের গেরুয়া জল, দ্বাদশীতে সব গ্রাম মিলেমিশে যায়,
জেগে ওঠে রাত।
স্বভাবই তো পথ হারানো, তাই পথ হারিয়ে ফেলেছি,
তবে জানি, মনে পড়ে কে এনেছে ভুলিয়ে ভুলিয়ে।
পাহাড়িয়া নিঃসাড়, কথকতা ছিল না কোথাও,
গোপনে নিজেই আমি মাছ ধরাবার নাম করে
ডুবিয়ে দিয়েছি তাকে নিরিবিলি সাঁওতাল দিঘিতে!
ধনুক ছোঁড়ে নি কেউ, বেঁচে গেছি খুব বেঁচে গেছি
নিখাত পাতালছায়া ভরে ছিল দিগন্তদখিনা।

লোকে তো জানে না কিছু, জানুক না, টেনে নিক পাপ,
ঝরে যায় নীল স্রোত, গাঢ় খাদে করুণার টান,
যদি বা নিজেরই ছায়া হঠাৎ জড়িয়ে ধরে বলে:
'তুমি কি সুন্দর নও? বেঁচে আছো কেন পৃথিবীতে?'

পাঠককে প্রথমেই জেনে রাখতে হবে, কবিতার কিছু লাইনের মানে থাকে, কিছু লাইনের কোনও মানে থাকে না। প্রতি লাইনের ব্যাখ্যার ইচ্ছে মূঢ়তা ও অসংগত প্রয়াস মাত্র। লিখতে লিখতে কবির কাছে এমন দু-চারটি শব্দ বা লাইন এসে যায়, যেগুলি আপাতত পারম্পর্য-হীন, বা আগের লাইনের সঙ্গে অর্থের যোগ পাওয়া যায় না, কিন্তু লিখে ফেলে— এক ধরণের সবল বাসনায়, কবি সেগুলি আর কাটতে চান না। 'কাটবো না, যা হয় হোক', এই ধরণের একটা মনোভাব আসে। কিন্তু পাঠক অসহায়, তার পক্ষে কবি কোথায়-কোথায় এমন কৌতুক করেছেন, বোঝা অসম্ভব, সুতরাং পাঠক প্রতিটি শব্দ ও লাইনের মানে বা প্রয়োজন খুঁজতে গিয়ে হিমসিম খায়, অনেক সময় সেইজন্যই কবিতাটি নিরর্থক হয়ে যায়। কারণ, একথা নিশ্চিত, ওইসব ধূসর, রহস্যময়ভাবে আগত শব্দ বা বাক্যবন্ধই একটি কবিতার মূল কবিতা। সত্যিকারের কবিতা অন্বয়ের অতীত, অন্য কারুকে বলা যায় না, তা ব্রহ্মেরই মতো অনুর্দিষ্ট। সুতরাং, কিছুটা অনুমানে নির্ভর করেই, আমরা

> প্রথম লাইনের 'এমন কিছু নয়' এবং ষষ্ঠ লাইনের 'স্বভাবই তো পথ হারানো'— এখানে যে-রকম মাত্রা ব্যবহার করা হয়েছে, পয়ারের এই উদার আতিথেয়তা স্পষ্টভাবে শুরু হয়েছে গত পনেরো বছর, এবং শঙ্খ ঘোষই এর অন্যতম মূল প্রবর্তক। (আমরা যখন নিতান্ত কলেজ-বালক মাত্র, তখন সেই ১৯৫২-৫৩-তে শঙ্খ ঘোষের বিপুল আবির্ভাব কয়েকটি পত্র-পত্রিকায় এবং চকিতে তিনি আমাদের মুগ্ধ এবং আচ্ছন্ন করেছিলেন।

'বুকের গেরুয়া জল' ও 'গাঢ় খাদে করুণার টান'— এদের স্পর্শমাত্র করবো না।

প্রথমে কবিতাটির বহিরঙ্গ। পয়ারের মতো পর্বভাগ, কিন্তু এলোমেলোভাবে সাজানো, আশানুরূপ বাঁদিকে রেঞ্জ নেই। একটা কবিতা কেন পয়ারে বা ত্রিপদীতে বা শ্বাসাঘাতে লেখা হল, লাইনগুলো কী রকম ভাবে ছোট বড় হয়ে এলো— সেটা মোটেই আকস্মিক নয়। এখানে কবিতাটির চেহারাতেই একটা এলোমেলো, উদাসীন, ভ্রাম্যমাণ রূপ আছে। কলকাতা ছেড়ে সাঁওতাল পরগনায় বেড়াতে গেলে যেমন প্রত্যেকদিন মুখমণ্ডন না করলেও চলে, ধুতির সঙ্গে হাওয়াই শার্ট পরলে কে-ই বা দেখছে। কবিতার আরম্ভও সেইরকম, খুব ক্যাজুয়াল, যেন কথার কথা, 'লোকে তো কোথাও যাবে'— নির্জন রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ কথা শুরু করার মতো, বা এক লাইন গান গেয়ে ওঠা। কিন্তু, এখানে নিশ্চিত গান নয়, কথাই। 'লোকে তো কোথাও যাবে, তাই আসি'— এখানে আসার মধ্যে কোনও নির্বাচন নেই, এমনই, যে-কোনও জায়গার মতোই সাঁওতাল পরগনায় আসা। এখানকার পথ দিয়ে আসতে আসতে কবি নিজের সঙ্গে কথা বলতে শুরু করলেন।

'পাতালছায়া'— এ-কবিতায় দুবার আছে (প্রথমবারে শব্দটির বিশেষণ ছিল 'নিহিত', পরে এসেছে 'নিখাত'), এটা এ-কবিতায় একরকম চাবি বাক্যবন্ধ, এ নিয়ে আমরা পরে কথা বলব। 'আকাশ-পরিধি' আছে বলেই স্বাভাবিকভাবে এসেছে, 'ফসলের সীমা'— কারণ এখানে আকাশের বিশালত্বের ইঙ্গিত আছে, কিন্তু আসলে বিশাল আকাশ কেউ দেখতে পায় না,— দেখা যায় বিশাল প্রান্তরের উপরবর্তী আকাশ। এবং এ দেখাও গোধূলিকালীন, দুপুরবেলা বা সকালবেলা কেউ আকাশ দেখে না— অন্তত সে-রকম কবিপ্রসিদ্ধি নেই, তাছাড়া গোধূলিই তো মন-খারাপের সময়। এই মন-খারাপের ইঙ্গিত আছে রাত্রির জেগে ওঠায়।

প্রথম লাইনের 'এমন কিছু নয়' এবং ষষ্ঠ লাইনের 'স্বভাবই তো পথ হারানো'— এখানে যে-রকম মাত্রা ব্যবহার করা হয়েছে, পয়ারের এই উদার আতিথেয়তা স্পষ্টভাবে শুরু হয়েছে গত পনেরো বছর, এবং শঙ্খ ঘোষই এর অন্যতম মূল প্রবর্তক। (আমরা যখন নিতান্ত কলেজ-বালক মাত্র, তখন সেই ১৯৫২-৫৩-তে শঙ্খ ঘোষের বিপুল আবির্ভাব কয়েকটি পত্র-পত্রিকায় এবং চকিতে তিনি আমাদের মুগ্ধ এবং আচ্ছন্ন করেছিলেন। তখন তাঁর প্রতিটি কবিতা আঁটো এবং ঝকঝকে, নিপুণ ছন্দ, অমোঘ শব্দাবলি এবং তীক্ষ্ণভাষণ। বিশেষত, তাঁর অধিকাংশ কথ্য শব্দ ও ভঙ্গির প্রয়োগে গভীর

শঙ্খ ঘোষের 'সুন্দর' কবিতাটির সুনীল-রচিত ভাষ্য আমার কাছে অত্যন্ত সপ্রতিভ এবং অগভীর বলে মনে হয়েছে।

কবিত্বময়তা আমাদের অভিভূত করেছিল। পরবর্তীকালে তিনি সেই ফর্ম ত্যাগ করেছেন, এখন তিনি অস্ফুট শ ব্যবহার ভালোবাসেন, আলগা ছন্দের দিকে তাঁর ঝোঁক। কেন এই পরিবর্তন এলো— সে কথা কোনও ঐতিহাসিক নির্ধারণ করবেন, আমাদের শুধু মনে হয়, কাব্যের কোনও রীতি বা প্রকরণে কোনও কবি যখন সম্পূর্ণ দক্ষতা অর্জন করেন, তখুনি তিনি তাকে পরিত্যাগ করতে চান। যে-বিষয়ে লিখে সার্থক হয়েছেন, ঔপন্যাসিক আবার তারই দ্বিতীয় বা তৃতীয় পর্ব লিখতে চান, কিন্তু কবির কাছে তা সহাস্যে পরিত্যাজ্য।)

যাই হোক, এই যে তাঁর একদা-সার্থক অটুট ছন্দের প্রতি অনাসক্তি, এর ফলে তাঁকে কখনও অতি লঘু বা ভুল শব্দপ্রয়োগেও প্রলুব্ধ করে। এই কবিতার 'পাহাড়িয়া'— সেই রকম ভুল শব্দ, আমাদের মতে। 'পাহাড়িয়া' এখানে মানায় না, শঙ্খ ঘোষকে মানায় না, অমিয় চক্রবর্তীর কাঁচা কবিতা ছাড়া অন্য কোথাও মানায় না। এমন কি 'নিঃসাড়' শব্দটিও শঙ্খ ঘোষের কবিতায় তিনমাত্রা হতে চেয়েছিল, কিন্তু আগে 'পাহাড়িয়া' বলেই পারেনি। যাই হোক, 'পাহাড়িয়া'র ত্রুটি আমরা অবহেলা করতে পারি, কারণ একটু পরেই দুটি সাঙ্ঘাতিক জিনিস আসছে। কাকে যেন নিরিবিলি দিঘিতে ডুবিয়ে দেওয়া হল, এবং দ্বিতীয়বার 'নিখাত পাতালছায়া'। দ্বিতীয়বার দেখা পেয়ে চিনতে পারি, 'নিখাত পাতালছায়া'য় আমরা যা ভেবেছিলুম তাই, পাপবোধ কিংবা অভিমান কিংবা উদাসীনতা— এগুলি আলাদাভাবে যে-কোনও একটি বা সম্মিলিত। কিন্তু কাকে ডুবিয়ে দেওয়া হল? ডুবিয়ে দেওয়া অর্থে খুন করা বা বিস্মৃতি— যে-কোনও, কিন্তু 'তাকে'? সমগ্র কবিতায় এই একবার মাত্র দ্বিতীয় অস্তিত্বের উল্লেখ। এখানে 'তাকে' বলতে তিনজনের যে-কোনও একজনকে বোঝাতে পারে। প্রথমেই যাঁর দাবি তাঁর সম্বন্ধে লিখতে গেলে ইংরিজিতে ক্যাপিটাল অক্ষর ব্যবহার করতে হয়, বাংলা সর্বনামে চন্দ্রবিন্দু। কামিংস অবশ্য তাঁকেও ক্যাপিটাল অক্ষর দিয়ে খাতির করেননি— কিন্তু বাংলায় চন্দ্রবিন্দু আমরা পরিত্যাগ করিনি— এমন কি পূর্ববঙ্গবাসীরাও, সুতরাং সেই মহতো মহীয়ান্‌কে আমরা খারিজ করলুম। বাকি দু-জন হতে পারে কোনও নারী অর্থাৎ তুমি কিংবা আমি। নারীকে শঙ্খ ঘোষ অধিকাংশ কবিতাতেই 'তুমি' অথবা 'তাকে' দিয়ে সেরেছেন, কখনও নাম ধরে ডাকেননি, এমন কি 'নারী' কথাটির উল্লেখও কদাচিৎ। 'তাকে'র অর্থ এই তিন রকম না হয়ে তিনশো রকমেরও হতে পারে, কিন্তু এ-কথা নির্ঘাত, সেই তিনশো এই তিনটিরই কোনও না কোনও প্রতিশব্দ। যেমন স্বপ্ন, সৌন্দর্য এবং নারী— কবিতায় এরা পরস্পরের প্রতিশব্দ, যে-রকম সময়, ক্লান্তি, নীল স্রোত— এরা 'আমি' কথারই প্রতিশব্দ হতে বাধ্য। যাই হোক, নিরিবিলি দিঘিতে 'তাকে' ডুবিয়ে দেওয়া কোনও সরল ঘটনা নয়, কবি এখানে উত্তেজিত এবং ব্যাকুল, সমগ্র কবিতায় এই একটিমাত্র জায়গায় তিনি বিস্ময়ের চিহ্ন ব্যবহার করেছেন। এবং অলক্ষ্য শাস্তির থেকে তিনি বেঁচে ছুটে পালাচ্ছেন।

এরপর থেকে কবিতাটি অলস ভঙ্গি ছেড়ে গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ায়। 'জানুক না'-এর মধ্যে অহংকার ও তাচ্ছিল্য ফুটে ওঠে, 'পাপ' শব্দের সরাসরি উচ্চারণেও দ্বিধা থাকে না। নিখাত পাতালছায়া থেকে চলে আসে বাঁচার প্রশ্ন, যেখানে বেঁচে থাকার সৌন্দর্য পাতালছায়াকে ভ্রূক্ষেপ করে সঙ্গে ডাকে। কিন্তু নিখাত পাতালছায়া থেকে বেঁচে থাকার সৌন্দর্য— কবিতাটির লক্ষ্য বা সিদ্ধি যদি শুধু এই পর্যন্ত, তবে কবিতার রস এখানে সীমাবদ্ধ হত। কিন্তু নিজের ছায়া নিজেকে জড়িয়ে ধরার মধ্যে যে মধুর রহস্যের উল্লেখ, এবং 'তাকে' এই শব্দের মধ্যে ত্রয়ীর সম্ভাবনা ছিল, তার অন্যতমের এখানে ফিরে আসা প্রিয়স্বরে প্রশ্ন উচ্চারণ, কবিতাটিকে সীমাহীনতার স্বর্গে পৌঁছে দেয়।

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

শঙ্খ ঘোষের 'সুন্দর' কবিতাটির সুনীল-রচিত ভাষ্য আমার কাছে অত্যন্ত সপ্রতিভ এবং অগভীর বলে মনে হয়েছে। স্বভাবী একজন পাঠক যেমন নিজের আবেগ/বাসনা/সংস্কারের সঙ্গে কবিকে মিলিয়ে নিতে চেষ্টা করেন, এ-ক্ষেত্রে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তার বেশি কিছু করেননি।

কোনও-কোনও কবিতার ক্ষেত্রে সূচনা-অন্তরা-সমাপ্তি— এই ত্রিনীতি একটি অনিবার্য সত্য। শঙ্খ ঘোষের 'সুন্দর' কবিতাটির প্রত্যংশ পরস্পরস্পর্শী এবং সদ্যোক্ত তিনটি অংশ:

১। লোকে তো কোথাও যাবে... হারিয়ে ফেলেছি,

২। তবে জানি, মনে পড়ে... দিগন্তদখিনা।

৩। লোকে তো জানে না কিছু... কেন পৃথিবীতে?

সূচনা

কবির অচিহ্নিত (unidentified) থাকবার প্রবণতা থেকে কবিতাটির শুরু। কবি মুক্তি চান, পৌর পরিচয়ের অতিনির্ধারিত সংকীর্ণতা থেকে, লোকালয়ের বিশদ-বিদিত সংজ্ঞা থেকে বৃহত্তর নিসর্গের নির্জ্ঞানে। তাঁর অভিপ্রেত নয় এই গোপনতাটুকু রাষ্ট্র হয়ে যায়। ওই নিসর্গে নীত হয়ে অনুভব করা যায় হৃদয়-নিহিত অসীম অপরিচয় ব্যক্তিত্বকে প্রসারিত করছে, নতুনতর সম্ভাবনায় ভরে দিচ্ছে। বর্হিদৃশ্য দেখতে গিয়ে তিনি একটি অবারিত আত্মদৃশ্যপট অবলোকন করেন যেখানে অর্জিত সকল সাফল্যের শেষে একাকার বৈরাগ্য, দশমীর বিসর্জনের অনতি-পরে নিজের গ'ড়ে-তোলা যাবতীয় বাসভূমি তুচ্ছাতিতুচ্ছ প্রতিভাত হয়, মানবসময়ের একটি অবসানকাল নেমে আসে (সুনীল ব্যাখ্যা করেছেন: 'এ দেখাও গোধূলিকালীন...তাছাড়া গোধূলিই তো মন খারাপের সময়।' আমার ধারণা, মন-খারাপের কোনও নির্দিষ্ট রুটিনমাফিক সময় নেই। কোনও গবেষক 'সান্ধ্য কাব্য' নামক এক কাব্যধারা উদ্ভাবিত ক'রে প্রসঙ্গত বলেছেন 'সন্ধ্যাবেলার কাব্যে কবির অসংসক্ত শান্ত প্রাণের প্রকাশ ঘটে। কাব্যে তাই শান্তসুরের সঞ্চরণ'। এই উক্তি যেমন নিরর্থ, আলোচ্য মন্তব্যও তেমনি। তাছাড়া প্রসঙ্গ থেকে বোঝা যায়, কবির নিরীক্ষণ নিশীথকালে সংঘটিত)। মানবস্বভাব নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করতে চায়, অচিহ্নিত সম্রাটের আভিজাত্যে।

অন্তরা

সত্তার নিকটতম পরিবেশে এসে সমস্ত অতীতের আকস্মিক বিস্ফোরণ (paramnesia)। পার্বত্য প্রতিবেশ আত্মিক অবস্থারই প্রতিরূপ (রবীন্দ্রনাথের একটি কিশোরবয়সী, অনুত্তীর্ণ অথচ তীব্র কবিতায় আছে: 'সখা তার তীরে বসি একেলা কাঁদিতে থাকে,/ ডাকে ঊর্ধ্বশ্বাসে—/ কাহারো না পেয়ে সাড়া শূন্যপ্রাণ প্রতিধ্বনি/ কেঁদে ফিরে আসে।' বক্ষ্যমাণ কবিতায় 'পাহাড়িয়া নিঃসাড়' বলতে কিন্তু indifferent শিলাবন্ধুর পরিবেশকে বোঝাচ্ছে না। নিঃসাড় এখানে ছল-শব্দ, যার অর্থ 'অনুকূল'... যে বাধা দিচ্ছে না, যে কাউকেই কবির গতিবিধি ব'লে দিচ্ছে না)। কবির আত্মসংবৃতি বা মন্ত্রগুপ্তির জানাজানি হয়ে যায় না, অর্থাৎ পাহাড়ি অঞ্চল প্রতিধ্বনি তুলে কবিস্বভাবের খবর অন্যতর প্রতিবেশীকে জানিয়ে দিচ্ছে না। কবি এইবারে আত্ম-নাট্যের (self-dramatization) মুদ্রায় নির্ভয়ে, অথচ সচেতন ভঙ্গিতে বলতে পারছেন, আমার আরেক-সত্তাকে আমি বিসর্জন দিয়েছি (কবি সহজিয়া সিদ্ধাচার্যদের থেকে পাঠ না নিলেও এখানে সহজ সেই সত্তার কথা বলেছেন যাকে আমরা জন্মের সঙ্গে নিয়ে আসি ['সহ জায়তে ইতি সহজ'] এবং অতঃপর অভিজ্ঞতার রাস্তায় হারিয়ে ফেলি।) প্রেমেন্দ্র মিত্রের বিখ্যাত ছোটগল্পে সাঁকো থেকে নারীকে জলে ফেলে দেওয়ার ভীষণ স্মৃতি পাঠকের মনে আসে হয়তো, কিন্তু কবি এখানে মৌল সত্তাকে মূর্তির মতো প্রত্যক্ষ ক'রে তুলেছেন। মাছ ধরবার নাম ক'রে নিয়ে গিয়ে বন্ধুকে ডুবিয়ে দেওয়ার মতো মারাত্মক আর কী হতে পারে? বহিরাশ্রয়ের কোনও তরল প্রলোভন, ইন্দ্রিয়নির্ভর কোনও প্রপঞ্চের প্রযোজনায় আকর্ষণ ক'রে কবি তার জন্মাগত সত্তাকে হত্যা করেছেন। 'মাছ' আমাদের ব্রতকল্পের একটি বিশেষ এষণা (motif) — যা অনিবার্যতই ইন্দ্রিয়ঘনিষ্ঠ অভিজ্ঞতার রূপক। কবি এখানে রূপককে জীবন্ত করে তুলেছেন যা ইদানীন্তন কবিতায় বিরল। 'নিরিবিলি সাঁওতালি দিঘিতে' 'ই'-র একটানা মিছিল এই আত্মহননের সার্থকতাজনিত অস্বস্তিকর ছমছমে অনুভূতি অথচ নরহত্যার মতো প্রকাশ্য ঘটনা নয় ব'লে অর্থাৎ ধরা প'ড়ে যাবার সম্ভাবনা না থাকায় তৃপ্তিকর দ্যোতনা। কোনও আদিবাসী ব্যাধ ধনুঃশরক্ষেপ করেনি, কেননা বাইরের দিক থেকে পাপের কোনও সাক্ষ্য ছিল না। কবির মনে একটি প্রবল নিষ্কৃতি অথবা অব্যাহতির সুখ সঞ্জাত হয়েছে যা আসলে অব্যাহতি নয়, আসন্ন কোনও মোকাবিলারই পূর্বাভাস। খনন-করা পাতাল সারা আকাশ জুড়ে ছায়া ফেলে এক অপরূপ ইন্দ্রজালের সৌন্দর্যে কবিকে লুকিয়ে রেখেছিল, যদিও 'নিহিত' যখনি 'নিখাত' হল তখনি বিচারের পালা ঘনিয়ে এসেছে।

সমাপ্তি

কেউ জানে না কবির এই সর্বনাশা আত্মবিলয়ের সংবাদ। কিন্তু জানুক ('জানুক না', 'না জানুক' কখনওই নয়)। জানলে সকলের সমানুভবের মাধ্যমে আত্মক্ষয়ের মহাপাতকের ক্ষালন সম্ভবপর হবে ('করুণা' কবিতাটির অর্গল-শব্দ। নিজের অপরিসীম অপচয়ের দৈন্য বা শোচনা সমবেত মার্জনার স্নানপুণ্যোদকে উত্তীর্ণ হতে পারে)। কোনও বহির্বিচারক কবিকে শাস্তি দিতে পারে না, যতটা শাস্তি দিতে সক্ষম কবির আপন অনুতাপ। কোনও নার্সিসাস-বিহ্বলতা এখানে নেই। কবিকে আদর করার ছলে তাঁর বিবেকী ছায়া তাঁকে ঘিরেই আর্দ্র মিনতির অছিলায় আর্তনাদ ক'রে তাঁকে জিজ্ঞাসা করবে: তুমি জন্ম নেওয়ার পর এমন কী করেছো? কেন তুমি যথার্থ অর্থে সুন্দর নও? 'তুমি কি সুন্দর নও?' এখানে 'কি' প্রকৃত প্রস্তাবে 'কেন'র আরেকটি ভঙ্গি। শঙ্খ ঘোষ এখানে শৌখিন-সুন্দরের চলিত ধারণা থেকে আমদের পরিচ্ছিন্ন করতে চাইছেন। তাঁর মনের অভিসন্ধিটি অনেকটা এইরকম: যা ব্যবহার করা যায় না, যা সত্যি কোনও কাজে লাগে না তাকে কি সুন্দর বলা চলে? বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মানবমনে দায়িত্ববোধ এবং দায়িত্বহীনতার যে লুকোচুরি শুরু হয়ে যায়, এই কবিতায় তার কথাও আছে। আমরা এড়িয়ে গিয়ে (অন্যদের/নিজেকে) কি সুন্দর হতে পারি? এই প্রশ্নটিই সমস্ত কবিতার মোক্ষম গ্রন্থি।

কবিতাটির ঘটনাকাল ও রচনাকালে লেখকের সঙ্গে আমি ছিলাম। কবিতাটির পরিমণ্ডল আমার চেনা বলেই এই তথ্য উল্লেখ করলাম। কোনও মল্লিনাথ যেন সেই সূত্রে দাবি ক'রে না বসেন যে আমি ওঁকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে সাঁওতাল পরগনায় নিয়ে গিয়েছিলাম, অথবা, তিনি আমাকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে নিরিবিলি সাঁওতালি দিঘিতে নিরঞ্জন করেছেন।

কবিতাটির ঘটনাকাল ও রচনাকালে লেখকের সঙ্গে আমি ছিলাম। কবিতাটির পরিমণ্ডল আমার চেনা বলেই এই তথ্য উল্লেখ করলাম। কোনও মল্লিনাথ যেন সেই সূত্রে দাবি ক'রে না বসেন যে আমি ওঁকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে সাঁওতাল পরগনায় নিয়ে গিয়েছিলাম, অথবা, তিনি আমাকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে নিরিবিলি সাঁওতালি দিঘিতে নিরঞ্জন করেছেন।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

শঙ্খ ঘোষের 'সুন্দর' কবিতাটি সম্পর্কে আমার লেখা আলোচনা অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত-র পছন্দ হয়নি। তিনি ওই কবিতাটি সম্পর্কে আরও যে-সব মূল্যবান তথ্য, দিকনির্ণয়, বর্ণালি ও প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ জানিয়েছেন সেজন্য কৃতজ্ঞ হয়ে রইলুম। আমার রচনাটিকে 'অগভীর' বলে তিনি যে মৃদু ভর্ৎসনা করেছেন, তা-ও শিরোধার্য করি।

কিন্তু তাঁর অন্য একটি মন্তব্য বিষয়ে— এবং যা যে-কোনও কবিতা আলোচনার সঙ্গেই বিশদভাবে পরিপ্রেক্ষিত— আমি দু'একটি কথা বলতে চাই। তিনি লিখেছেন, 'স্বভাবী একজন পাঠক যেমন নিজের আবেগ/বাসনা/সংস্কারের সঙ্গে কবিকে মিলিয়ে নিতে চেষ্টা করেন, এ-ক্ষেত্রে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তার বেশি কিছু করেননি।' আমি কিন্তু সত্যি তার বেশি কিছু করিনি এবং করতেও চাইনি। আমি বদ্ধমূল অবাক হয়ে প্রশ্ন করি, তাতে দোষ করেছি কি? অপরের কবিতা পাঠ করার সময় আমি শুধুই একজন বিনীত, নম্র ও উদ্‌গ্রীব পাঠক, এবং নিজস্ব আবেগ ও বাসনার সঙ্গেই কবিতাকে মিলিয়ে নিতে চাই। তা ছাড়া কবিতার কাছে আর কী দাবি করব? কবিতার রস উপলব্ধি করতে গিয়ে আত্মাভিমানবশত এই রকম মনোভাব আনা যে, এই কবিতাটি তো যথেষ্ট ভালোই, কিন্তু বোদ্ধা হিসেবে আমিও কম নই, আমিও কথায়-কথায় বাইবেল বা দাস্তে বা বেদান্ত থেকে ফটফট করে কোটেশান তুলতে পারি আর কবির এক-একটা কথার পাঁচ রকম মানে বার করে দিতে পারি— কবিতার আলোচনায় আমার মতে এ-পদ্ধতি একটি ধারাবাহিক ভুল, তা ছাড়া আমি অত সব রেফারেন্স নিজে জানিও না, তাও একটি কারণ। অলোকবাবু কবিতা সম্পর্কে অনেক কথা জোর দিয়ে বলতে পারেন, তিনি কবিতার মধ্যে 'অনিবার্য সত্য' খুঁজে পান। আমার অবশ্য পদে-পদে দ্বিধা, দুর্বলতা ও ভয় থেকেই যায়, মহৎ কবিতার মধ্যে পরিভ্রমণে গা ছমছম করে, কি রকম যেন একটা রিন রিন করে শব্দ হয়, মনে হয় কিছুই ছুঁতে পারছি না, আমাকে মুগ্ধ অসহায় করাই ছিল কবির উদ্দেশ্য। কবিতার 'অনিবার্য সত্য' জেনে আমাদের লাভ কি? পাঠক হিসেবে নিজস্ব বাসনায় অভিভূত হওয়া— কবিতা পাঠের এই তো একমাত্র উদ্দেশ্য, এতকাল আমার এ-রকম ধারণা ছিল। অলোকবাবুর মন্তব্যে আমি বড়ই সংশয়ে পড়েছি। এ-সম্পর্কে যদি আরও কেউ-কেউ আমাকে কিছু উপদেশ দেন, আমি কৃতার্থ বোধ করব।

বাংলায় যে-ভাবে কবিতার আলোচনা হয়, তা পড়ে এ-রকম মনে হতে পারে যে বাংলাদেশে এতকাল শুধু অ্যালিগোরিকাল কবিতাই লেখা হয়েছে। পাহাড় মানে এই, নদী মানে এই, জ্যোৎস্না বলতে কবি অমুক বুঝিয়েছেন— এসব কথাবার্তায় কবিতাকে খুবই খর্ব করা হয়; ভেসে আসে ক্লাশরুমের গন্ধ। শঙ্খ ঘোষের 'সুন্দর' কবিতার এক জায়গায় আছে নিরিবিলি সাঁওতালি দিঘিতে মাছ ধরার কথা। 'মাছ' বলতে অলোকরঞ্জন ব্যাখ্যা করেছেন, 'আমাদের ব্রতকল্পের একটি বিশেষ এষণা (motif) যা অনিবার্যতই ইন্দ্রিয়ঘনিষ্ঠ অভিজ্ঞতার রূপক।' শুধু এই কবিতাটির জন্যই নয়, সমগ্র বাংলা কবিতার আলোচনাতেই এ-প্রশ্ন অত্যন্ত জরুরি যে, 'মাছ' বলতেই 'অনিবার্যতই' রূপক খোঁজা ঠিক কিনা। মাছ 'ইন্দ্রিয়ঘনিষ্ঠ অভিজ্ঞতা'র সংকেত, খ্রিস্টানদের গোপন চিহ্ন, বাংলাদেশে শুভকর্মের দূত, মেক্সিকোতে কি জানি কি— এ-সবই ঠিক, কিন্তু একজন লোক চুপচাপ দিঘিতে ছিপ হাতে মাছ ধরতে যায় না, যে-মাছ কোনও রূপক বা প্রতীক নয়, নিছকই যে-মাছ রান্নাঘরে ভেজে ফেলার? কবিতায় মাছ কখনও প্রতীক, কখনও রান্নাঘরের; প্রতীক হলে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না, কারণ প্রতীক ব্যবহারের উদ্দেশ্য কীসের প্রতীক তা বুঝিয়ে দেওয়া নয়, সেই অনুভব সৃষ্টি করানো, আর জ্যান্ত মাছ হলে জরুরি হয়ে ওঠে মাছ ধরার জন্য বসে আছে সে, সে, যে আদিগন্ত ফসলের মাঠে ঘুরছে, যে রাত্রি হলে দেখেছে গ্রামের অভ্যুত্থান, আমি 'সুন্দর' কবিতার সেই কবিকে অনুসরণ করেছি, শব্দার্থ খোঁজার একেবারে চেষ্টা করিনি, কবিতায় শব্দার্থ খুঁজে বার করা সত্যি বিপজ্জনক। যেমন, 'গোধূলি' বলতে 'মানবসময়ের অবসান কাল'— এ-রকম মনে করার খুব দরকার আছে কি? এইসব কথাগুলো শুনতে খুব ভারি, কিন্তু কবিতার পক্ষে এমন কিছু নয়, এগুলো যেন কবি-প্রসিদ্ধির মতো এখন। কবিতার মধ্যে কথায়-কথায় বিশ্বজগৎ, মানব-সভ্যতা, বিপুল সত্তা, এগুলি টেনে আনা একেবারে হ্যাক হয়ে গিয়েছে। তাহলে তো বলতে হয়, কবিতা অ্যালিগোরি ছাড়া কিছুই না। অনেক সময় গোধূলি শুধু একটিই গোধূলি এবং সে গোধূলিও তুচ্ছ, শুধু উল্লেখযোগ্য গোধূলির মধ্যে পরিভ্রমণশীল কবি। আমি সেই কবির মন-খারাপ খুব স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিলাম। গোধূলিই তো মন-খারাপের সময়, মনখারাপের কোনও রুটিন-মাফিক সময় নেই— এও তো সামান্য কথা, আমার নিজেরই তো মন-খারাপের কোনও ঠিক-ঠিকানা নেই, সকালে-দুপুরে-রাত্তিরে এমনকি ঘুমের মধ্যেও মন খারাপ হয়, কিন্তু কবিতায় যখন প্রতিচ্ছবিত দেখি কোনও-একটি আসন্ন সন্ধ্যায় একজন বিষণ্ণ কবির সুন্দর মুখ, তখন পৃথিবীর যাবতীয় দুঃখ বুকে টের পাই, এক ঝলক দেখতে পাই জানলা দিয়ে চেয়ে থাকা সন্ধেবেলা কীটসের করুণ চোখ, সেই এক-গোধূলি বহু-গোধূলির মন খারাপ টেনে আনে, তখন সেই মুহূর্তের সত্যই একমাত্র হয়ে ওঠে।

অনেক সময় গোধূলি শুধু একটিই গোধূলি এবং সে গোধূলিও তুচ্ছ, শুধু উল্লেখযোগ্য গোধূলির মধ্যে পরিভ্রমণশীল কবি। আমি সেই কবির মন-খারাপ খুব স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিলাম।

কবিরা এখন ভেতরে ফিরে এসেছেন, এখন সমালোচকদেরও চশমা বদল করতে হবে। কবিরা এখন আর কারুকে কিছু শেখাতে চান না, সমালোচকদের কাছ থেকেও আমাদের শেখার কিছুই নেই। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মানুষের শিক্ষার ভার নিয়ে কবিরা এখন ক্লান্ত। এখন শিক্ষিত করতে ডাকার বদলে, কবি চান পাঠককে তাঁর সহমর্মী হতে। উপলক্ষ সন্ধানী হবার বদলে সমালোচককেও এখন হতে হবে সেই মর্ম-সন্ধানী পাঠক, যার ভালো নাম আলটিমেট রীডার। এই তো আমার ধারণা, ভুল নাকি?

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত
কবিতা-পরিচয়, দ্বিতীয় সংকলন, জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৩ থেকে পুনর্মুদ্রিত

কবিতা-পরিচয় প্রশ্নমালা

কবির উত্তর

নীচের প্রশ্ন-ক'টি পাঠিয়ে বাংলা ভাষার বিভিন্ন কবিকে অনুরোধ জানানো হয়েছিল, তাঁরা যেন পৃথক-পৃথকভাবে অথবা একসঙ্গে জড়িয়ে প্রশ্নগুলির উত্তর লেখেন। —**সম্পাদক**

তুষার রায়

১। আমাদের দেশে এখনকার তীক্ষ্ণ রাজনৈতিক সচেতনতা ও তীব্র সামাজিক অস্থিরতা কবিতা লেখার সময় আপনাকে প্রভাবিত করছে বলে আপনার মনে হয়? যদি করে, কীভাবে?

২। অত্যধিক রাজনৈতিক সচেতনতার ফলে সম্প্রতি বাংলাদেশে কবিতা সম্পর্কে উদাসীনতা এসেছে বলে আপনার মনে হয়? অথবা কবিতাই ক্রমে সমাজবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে বলে আপনি মনে করেন? বাংলার সমাজমানসে বাংলা কবিতার প্রভাব কী রকম বলে আপনি মনে করেন?

৩। কবিতায় আপনি যে-ভাষায় কথা বলেন তার সঙ্গে মুখের ভাষার কোনও বিরোধ আপনি কি কখনও অনুভব করেছেন? কবিতার ভাষাকে আপনি কি মুখের ভাষার কাছাকাছি রাখবার পক্ষপাতী? অথবা কবিতার এক নিজস্ব ভাষা-নির্মাণই আপনার লক্ষ্য? কবিতার ভাষা জনসাধারণের ভাষা নয় বলে সাধারণ মানুষের যে-অভিযোগ তাকে আপনি কীভাবে দেখেন?

৪। জনসাধারণের জীবনযাপনের সমস্যা বা সমসাময়িক প্রসঙ্গ কবিতায় সঞ্চারিত হলে, বা তা নিয়েই লিখলে, কবিতা কি আরও বেশি লোককে আরও গভীরভাবে আকৃষ্ট করবে বলে আপনি মনে করেন?

৫। এখনকার এই সময় কবিতা লেখার পক্ষে অনুকূল বা প্রতিকূল মনে হয় আপনার?

১। কিছুটা করে অবশ্যই, আমি যেমন সাম্প্রতিকের রাজনীতি অভিধায় অসামাজিক কার্যকলাপগুলিকে তীব্র শ্লেষ ও প্রতিবাদ করেছি। কবিতার মধ্য দিয়ে।

২। প্রকৃত রাজনৈতিক সচেতনতায় শিল্পের প্রতি উদাসীনতা আসতে পারে বলে মনে করি না আমি, বলিভিয়ার জঙ্গলে আত্মগোপনকারী চে গেভারা যেমন গ্যেটে পড়তেন। শিল্প বরং প্রেরণা দেবে আরও।

৩। যেমন কনটেন্ট অনুযায়ী বিভিন্ন ফর্ম ধার্য হয়, সে-রকমই কবিতা অনুযায়ী তৈরি হবে ভাষা, অর্থাৎ বিষয়ের প্রয়োজনে যখন যে-ভাষার দরকার তা-ই ব্যবহার করতে হবে, তা শুদ্ধ প্রাকৃত বা কথ্য— যা-ই হোক না কেন। কবিতাপাঠককে এটা বুঝতে হবে।

৪। কবিও তো সাধারণ মানুষই একজন, তাঁর লেখার পর্যায়ে যে-মানসতা পাঠককে তা বুঝতে হবে; তা না-হলে জনসাধারণকে আকৃষ্ট করার কথা যিনি ভাববেন, তাঁর কবিতা লেখার প্রয়োজন নেই।

৫। সমস্ত সময়ই অনুকূল আবার প্রতিকূল— কবিতার আছে ভেসে যাওয়া শুধু, কূল থাক বা না-ই থাক।

কবিতা-পরিচয়, দ্বাদশ সংকলন, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৭৭ থেকে পুনর্মুদ্রিত

প্রেশাপ্রবেশ থেকে সংকলিত

মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক ও বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অপরিহার্য

শিশিরকুমার আচার্য প্রণীত

বাংলা সমাস
দ্বিতীয় সংস্করণ। ₹৬০

অনলাইনে পেতে www.swarnakshar.in লগ অন করুন

বাংলা প্রত্যয়
প্রকরণ ও পদ্ধতি
সদ্য বেরিয়েছে। ₹৯০

স্বর্ণাক্ষর

SWARNAKSHAR PRAKASANI PRIVATE LIMITED
29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-700 019
Ph: 2283-2320 Fax: 2287-6448
E-mail: books@swarnakshar.in

দে বুক স্টোর, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, বলাকা বুক স্টল (কলেজ স্ট্রিট), স্টার মার্ক-এর সব দোকান ও অন্যান্য বইয়ের দোকানে পাবেন।

আমি কী চোখে দেখি শালাকে

কবিরা খুব ন্যাকা হয়। চান্স পেলেই বলে দেয়, আমি কবিতায় সত্যি কথা লিখি, সত্যি বই মিথ্যা লিখি না। কেসটা অনেকটা ওইরকম: ঠাকুরঘরে কে রে? স্যার আমার ঠাকুরঘরে কোনও কলা নেই, শুধু শিল্পকলা।

আমি কবিতায় মিথ্যে বলি। মিথ্যে ছাড়া আমি বাঁচতে পারি না, তাহলে কী করে আমার কবিতা বাঁচবে? সংসার বাঁচে না, সংসারে মিথ্যে আর সত্যি দুই যমজ সহোদরা সারাক্ষণ এ ওর মুন্ডু এক্সচেঞ্জ করে বেঁচে আছে। আমি কোন লাটের বাট কলার তুলে বলি আমি যা লিখি তা গব্য ঘৃত, কোনও ভেজাল পাবেন না। লোকটা অত বছর আগে ঠিক লিখেছিল— অল অটোবায়োগ্রাফিজ আর লাইজ।

তার মানে কি সত্যি সত্যি তাই, সব মিথ্যে? না, না, না। সত্যি অনেকটা ডাবের জলের মতো। মানুষ কী করে আবিষ্কার করেছিল ডাব কেটে জল খেতে হয়, ভাবলে আমার গায়ে শিহরণ লাগে। কবিতাকে আমি সবসময় ডাবের জল হিসেবে দেখি না, ডাবের খোলাটাও কবিতার পক্ষে ভীষণ জরুরি। যারা শুধুই সত্যি কথা লেখে তাদের কবিতা বড় পানসে, একটু আধটু গুল না থাকলে কবিতা বিষ্ণু দে হয়ে যায়।

কবিতাকে আমি কী চোখে দেখি?

আমার মুখ দিয়ে একটাই শব্দ বেরুবে, শালা।

৩৫ বছরেও এ শালা আমার পিছন ছাড়ল না। সেই কবে হায়ার সেকেন্ডারির সময় আমার ছেঁড়া পকেট দিয়ে ঢুকে পড়েছিল, আজও দাঁত বের করে হাসছে। বাবা ছেড়ে গেল, মা ছেড়ে গেল, বউ ছেড়ে গেল, কিন্তু শালা কবিতা ছেড়ে গেল না। জ্বালিয়ে দিল জীবনটা। রোজ সকালে ৩ ঘণ্টা করে বসলাম, যদি কিছু ঘটে, আজ পর্যন্ত কিছু ঘটল না। কবিতা আমার হাড় মজ্জা নিংড়ে নিল, কিন্তু ফিরিয়ে দিল না কিছুই। দিতেও হবে না। দিস না। আমি একা আছি, একা থাকব। একা খাব, একা তালা খুলে একা শোবার ঘরে ঢুকে জুতো, মোজা না খুলেই শুয়ে পড়ব। আমাকে কিছু দিতে হবে না। অন্যদের দে, হাত ভরে দে। দু-হাত ভরে দে।

একটা মিথ্যে কথা বলে শেষ করি: কবিতার কাছে আমি কিছু চাইনি।

ঠিক সেই রকম, অভিমানী একটি হরিণ আমাকে ২০ বছর ধরে বলে আসছে তোমার কাছে আমি কিছু চাইনি।

—সুবোধ সরকার

কবিতা-অকবিতার সীমা চুরমার

সুবোধ সরকারের স্বনির্বাচিত সাতটি কবিতা

মা য়া মৃ গ

আমি সারাদিন একটি হরিণের পেছনে পেছনে ঘুরে বেড়ালাম
সেক্টর ফাইভ থেকে বেরিয়ে পাটুলি হয়ে বাগবাজার গেলাম
সে বলল, আমি তোমার চোদ্দো তলার ফ্ল্যাটে যাব, সে বলল
মিডনাইট ইন প্যারিস দেখব, উডি অ্যালেন আমার হট ফেভারিট,
সে বলল, আমার জন্য মেঘ আর টম্যাটো দিয়ে একটা ব্লাডি মেরি বানাও
সে একটা হরিণ আমি একটা মানুষ তারপর আমাদের দেশে সন্ধ্যা হল।

বাড়ি ফিরতেই ছেলে বলল, সারাদিন কোথায় ছিলে তুমি?
কতবার ফোন করলাম, ফোন বন্ধ, তুমি কার সঙ্গে সারাদিন ছিলে?
আমি তার এক মাথা চুল নেড়ে দিয়ে বললাম, একটা মায়ামৃগর সঙ্গে
'মায়ামৃগ মানে?' ওফ বাংলাটা শিখলি না তোরা! হরিণ হরিণ।

পরের দিন আমি ছেলেকে খুঁজে পেলাম না, তার মোবাইল অফ
তার বন্ধুদের ফোন করলাম, তারা বলল, আজ দেখা হয়নি
বিন্দু মাসির কাছে যেতে পারে, খোঁজ নিলাম, না সেখানেও যায়নি
সন্ধে হয়ে এল, রাত আটটা, পুলিশে যাব কিনা ভাবছি, বেল বাজল
আমি বললাম, কিরে ফোন বন্ধ, কী ভেবেছিস কি, কোথায় ছিলিস?
'একটা মায়ামৃগের সঙ্গে, আমি হা, সে বলল বুঝলে না? হরিণ হরিণ।

তারপর জুতো খুলে ছয় এক উঠে দাঁড়াল সোজা চাবুকের মতো
হাতে মিশেল ফুকো যাকে দেখলেই আমি চটে যাই, ছেলে বলল
বাবা, তোমার একটা মায়ামৃগ থাকতে পারে,
আমার একটা হরিণ থাকতে পারে না?

কী হয়েছে আমার?

একটা বিরাট বিমানবন্দর, ২৪ পরগনার মতো বিরাট
চার চারটে টার্মিনাল, কিন্তু কোনও বিমান নামে না
কোনও পুলিশ নেই, চেক ইন নেই, চেক আউট নেই
পাশপোর্ট নেই ভিসা নেই, দেশ নেই বিদেশ নেই
কোনও লোক নেই হুইল চেয়ার নেই ট্রলি নেই
টাকা পড়তে পড়তে এখন এক ডলার মানে কত টাকা যেন?
কম্পিউটার আছে এক হাজার একটা, কিন্তু চালাবে কে?
রাশি রাশি কনভেয়ার বেল্ট ঘুরে চলেছে, কোনও লাগেজ নেই
ডিকটেটরশিপ এবং ডেমোক্র্যাসির মাঝখানে
একটা বিরাট হাই তুলে বিমানবন্দরটি দাঁড়িয়ে আছে।

কলকাতায় আমি কাঁদতে পারিনি, আমার ছেলে দেখত
একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে আমি চিৎকার করে কাঁদলাম।

কী আশ্চর্য কী সুন্দর কী অপূর্ব— কেউ নেই, একটা বিড়ালও নেই
এসে জিজ্ঞাসা করবে, আপনি কে? কী হয়েছে আপনার?

পৃথিবীতে এখন আর কেউ কাঁদে না, এখন হাসে
আপনার চোখে জল, আপনি কে? কী হয়েছে আপনার?

গেটপাস

বুদ্ধিজীবী হিসেবে আমি বসে যাবার পর
গাঙচিলের নেমে আসা এবং পিয়ানোর মাঝখানে
ফুকো দেরিদার উত্থিত দুটি শলাকার
ডিসকোর্স শুনেছিলাম রাত জেগে।

ফুকো বড় দার্শনিক, কিন্তু আপনারা জানেন ওঁর এইডস হয়েছিল।
সে তো যিশু খ্রিস্টেরও হতে পারত
হয়নি, দাড়ি রাখতেন ভাগ্যিস।
বহু মেয়ের সঙ্গে শুলে এইডস হয়, ভুল ধারণা
কোন মহাপুরুষ বহুগামী ছিলেন না?

বুদ্ধিজীবী হিসেবে আমি বসে যাবার পর
আমার দুটি পদোন্নতি হয়
আমি মাছি সহ্য করতে পারতাম না এক্কেবারে
কিন্তু মশা এবং মাছি দুটোকেই মেনে নিলাম
মানবজীবনের দুটি অপরিহার্য সেমিকোলন হিসেবে।
দু নম্বর হল আমি মদ এবং মাংস দুটোই ছেড়ে দিলাম।

খবরটা পেয়ে জিনস পরা একটি ২৫ বছরের মেয়ে
আমার সামনে এসে টেবিলে পা তুলে একটা বোতল রাখল
বলল, একটা গ্লাস দাও, আমি জীবনে প্রথম কোনও
বিধবার সামনে বসে হুইস্কি খাব।
ছ্যাকাটা নিলাম না, বদলে তার পাল তোলা উদ্ধত নৈঋত
এবং ফাটল ধরা ঋষিকেশ দেখতে লাগলাম
দুটো পেগ নিট মেরে দিয়ে ঠোঁট মুছে সে আমার দু হাঁটু ধরে
ঝুঁকে দাঁড়াল খন্ডৎ ত এর মতো
ঠিক ততটা ঝুঁকে যতটা ঝুঁকলে মৃত্যুকে চাঁদের আলো
এবং ফিক্সড ডিপোজিট দুটোই মনে হয়।
কিন্তু বিশ্বাস করুন বন্ধুরা, বুদ্ধিজীবী হিসেবে আমি বসে যাবার পর
আমি ভেবেছিলাম এবার একটু মানুষ হব
বস্তিতে কমলালেবু পাঠাব

কিন্তু দেখলাম, অবাক হয়ে দেখলাম আমার না আছে চাঁদের আলো
না আছে ফিক্সড ডিপোজিট। কালীদা মানে লোকাল কাউন্সিলর
বললেন:
নেক্সট বাস বিকেল পাঁচটা দশে, ও দুটো ছাড়া আপনাকে টিকিট
দেওয়া যাবে না।
আমি বললাম কিসের টিকিট? কালীদা বললেন: গেটপাস
আপনি একটা নরকের থেকে বেরিয়ে আর একটা নরকে
যেতে চাইছেন, তার গেটপাস।

অটোক্র্যাট ও একটি পিঁপড়ে

দু'হাজার বছর আগে একজন রোমান অটোক্র্যাট
একটি পিঁপড়েকে নিয়ে বড় ঝামেলায় পড়েছিলেন
রোম থেকে আলেকজান্দ্রিয়া
সবাই তার নাম শুনে কাঁপত
কোনও মাথা উঁচু করে দাঁড়ানো লোককে
তিনি সহ্য করতে পারতেন না
ক্ষমতাবান হয়ে উঠতে পারে এরকম কোনও ভাইকে
সিংহাসনের পেছনে দাঁড়াতে দিতেন না
কিন্তু রোজ সন্ধেবেলায় একটা পিঁপড়ে এসে
তার পা বেয়ে, পা বেয়ে লোম ধরে উদ্ধত রডোডেনড্রনে উঠত
কিছুটা উঠে আবার নিজেই নেমে চলে যেত।

তার সমস্ত সেনেটর ছিলেন ক্রীতদাস
তাদের একটা করে কান চুনমাখানো ছিল।

মরোক্কোর বিদ্রোহীকে যখন
গাছের গুঁড়ির সঙ্গে বেঁধে আনা হল ওর সামনে
রোমান অটোক্র্যাট ওর মুঠোয় একটা জ্বলন্ত কাঠকয়লা
ধরিয়ে দিয়ে বললেন, কি চাও তুমি কাফ্রি?
তোমার কানে চুন নেই কেন?
সে বলল, আমি মাথা উঁচু করে বাঁচতে চাই
কয়েক মুহূর্ত বাদে একটা সিলভার প্লেটে
তার মাথা কেটে আনা হল, তখনও তার ঠোঁট নড়ছে
লাল ভেলভেট সরিয়ে অটোক্র্যাটকে দেখাতে এল একজন সেনেটর
অটোক্র্যাট বললেন, আঃ হিংসা দেখাতে নেই,
ভায়োলেন্স বন্ধ করুন আপনারা।
ওটা রোম সাম্রাজ্যের বাইরে গিয়ে ফেলে আসুন।

তৎক্ষণাৎ সেই পিঁপড়েটা তার পা বেয়ে ওপরে
উঠতে লাগল, আরো আরো ওপরে
লোম বেয়ে বেয়ে আরো লোমে
একবারে পুরুষ গোলাপের মাথায়।
তিনি তার প্রাইভেট সেক্রেটারিকে ডাকলেন
বললেন, পিঁপড়েটাকে মারো।
ওটা আমার ওখানে বসে কামড়াচ্ছে, কী আস্পর্ধা।

তাহলে কি পিঁপড়েটা হোমোসেক্সুয়াল ছিল?
প্রাইভেট সেক্রেটারি কোনও পিঁপড়ে খুঁজে পেলেন না।
গ্রীষ্ম গেল বর্ষা গেল
উনি যতদিন শাসন করেছিলেন
ততদিন কোনও তীরন্দাজ খুঁজে পাওয়া যায়নি
কোনও বিজ্ঞানী খুঁজে পাওয়া যায়নি
কোনও ভাল কবি জন্মায়নি
এবং কী আশ্চর্য
সেই ছোট্ট পিঁপড়েটাকেও খুঁজে পাওয়া যায়নি কোনওদিন
যা তাকে রোজ সন্ধেবেলায় এসে
ঠিক ওইখানে কামড়াত।

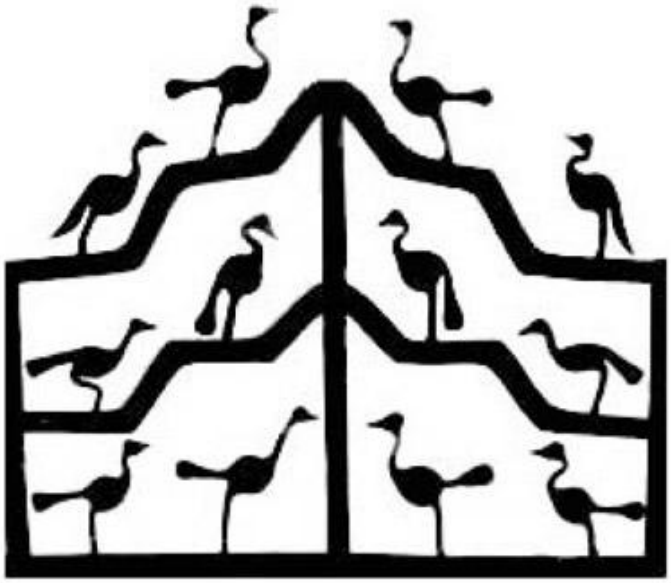

এটাই হল আমার আসল অটোবায়োগ্রাফি

মায়াকভস্কি
পাবলো নেরুদা
জীবনানন্দ দাশ
রবার্টো বোলানো
মুক্তিবোধ
তাদেউশ রুজেভিজ
কুমারন আসান
বেলা আখমাদুলিনা
আমিরি বরাকা
নিকোলাস গিয়েন
নিকানোর পাররা

ওপরের ১১ জনের টেবিলে,
গ্লাসে গ্লাসে আমি
খালাসিটোলায় বাংলা ঢেলে দিতাম
ওরা একদিন বললেন:
তোকে মদ দিতে হবে না
তুই একটা সেমিকোলোন কুড়িয়ে নিয়ে আয়
আমি গত ৩৫ বছর ধরে
কবিতা লেখার নামে
আসলে একটা সেমিকোলোন
ঘাড়ে নিয়ে ছুটে চলেছি
দিগন্তবিহীন এক
খালাসিটোলার দিকে।

বাংলাদেশের নতুন প্রজন্মের কবি

পিয়াস মজিদের

ছ'টি কবিতা

কোমলগান্ধার

রাত্রি।
মরুভূমি ছেড়ে যাই
ওই দূর
মালিনীর
অববাহিকায়।
তার জলে
হাঁস হয়ে ঘুরে বেড়ায়
আমার দগ্ধ চৈতন্য।

ভোর।
এখন মালিনীই
মূলত মরুভূমি।

স্বপ্নগ্রন্থি

বেছে বেছে তোমার
প্রতিটি পতনের পথেই
জ্বালাব পাথুরে প্রদীপ।

জল ছেড়ে যাব টিলায়;
শুষে নেব
পাহাড়ি ফুলের দুঃখঘ্রাণ।

এভাবে রাত্রির যাবতীয়
নিদ্রিত ঝরোকায়
জেগে উঠি আমি;
প্রত্যহ।

রাগিণী

আমার কবর
আনন্দভৈরবী।

যখন
মাতৃজঠরে পড়ে
ঘন
গরাদের
ছায়া।

বিধুর

আষাঢ়, আষাঢ়
সব কলস ভরা।
আর তুমি
জলনূপুরে,
উজ্জয়িনীর দিকে।

তোমার
পায়ের পথে
একজন;
রোদে পুড়ে
খাক হওয়া
করুণ মল্লার।

আদিগন্ত

সামনে
ধু-ধু
নিষ্পত্র
মাঠ।
একটি
তারাবীথি
ধরে
ঝু
ল
ছি;
অন্ধকার।

একালের গম্ভীরা

আর তুমি
পেনড্রাইভে
ভরে ফেলছ
এমনকি
সন্ধ্যার
সমস্ত
মাধুরী।

প্রবীণ স্নায়ুবিজ্ঞানী সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের

নবীন কবিতা

১

সবাই জানে আমার বাড়ির বাসিন্দা ক'জন।
হিসেব করে বলতে পারো চোদ্দ-প্রদীপ হাতে
এই শহরের পথের পাশে এখনও একজন
ঘোর আঁধারে বসে আছে আমার প্রতীক্ষাতে?

২

বাতাসে তাপ, আকাশে তাপ, আলো
নিবিড় দুপুর লিপ্ত আছে ভালো,
গড়িয়ে চলে বুকের জলে নদী
মুছিয়ে দেব, চিনতে পারো যদি।

সহজ স্বরে কথা বলার ক্লেশে
ব্যস্ত হলে তুমিও অবশেষে
সামনে হাত, দুপাশে হাত, কত
সারিয়ে নিতে পারবে এই ক্ষত?
মোড়ের মুখে একটু ছায়া রাখি,
সময় পেলে উড়িয়ে দিও পাখি।

আমায় আরো সবুর সইতে হয়
একলা আমায় করলে অসময়।

৩

কথা যদি পাপ হয়
চুপ করে বসে থাকি, তাও পাপ।
সব পাপ মুছে নিঃস্ব আমি
হতে চাই।

৪

আমার বিশ্বাস আছে আমাকে বিশ্বাস করো তুমি।
যতদূর যাই দেখি তোমার মুখর মুদ্রাগুলি—
ঘরের শিয়রে, পথে, জাদুঘরে, জলের প্রবাহে।
তোমার হৃদয় কোনো অথর্বতা জেনেছে কি আজ!

তোমার বিশ্বাস নেই তোমাকে বিশ্বাস করি আমি।
এই ঘূর্ণিচরাচরে আমার সমস্ত রাত্রি ঘিরে
ঢেউ খেয়ে মুছে গেছে হৃদয়ের কালাকাল সীমা
তোমাকেই খুঁজি তবু শরীরেরও ভিতর শরীরে।

৫

যতই তোমাকে পাই আরো বেশি তোমাকেই খুঁজি
তোমাকে তোমার মতো কবিতায় বুঝি।

তোমার কথায় ঝরে ঘৃণা অভিমান
ঝরে শব্দ ঝরে ছন্দ কবিতা ও গান।

তোমার দুহাত ভেঙে বয়ে যায় জল
খসে পড়ে পুরোনো বল্কল

শূন্যতাই পূর্ণতার উৎস হয় বুঝি
তোমাকে তোমার মতো কবিতায় খুঁজি।

৬

শব্দ ছিঁড়ে ছন্দ ভেঙে খেলা
বন্ধ ছিল তোমার অসুখ বলে।
মাঠের পরে মাঠে মাঠে যাওয়া
বন্ধ ছিল তোমার অসুখ বলে।
বৃষ্টি মাথায় ভিক্ষের গান গাওয়া
বন্ধ ছিল তোমার অসুখ বলে।
এখন আবার ভর রেখেছি ঘাসে
একটু বসো একলা আমার পাশে।

৭

দিনবদল, পালাবদল, ভোলবদল
বাজে মাদল বাজে মাদল বাজে মাদল
একটু আধটু পাল্টে নিয়ে মুখের আদল
একই দল, একই ছল, সেই ছোবল, সেই কোতল।
বাজে মাদল বাজে মাদল বাজে মাদল
ফিরে আসুক ফিরে আসুক ঝড়বাদল।

হেনরি মাতিস কৃত পেন্সিলস্কেচের আলোকচিত্র

কালের বাংলা

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

। পর্ব ৭।

রদ বদল

দুনিয়ায় সবকিছুই বদলায়।
আর সবকিছুর মতোই ভাষারও বদল হয়। জীবনের ধরণ বদলাবার সঙ্গে সঙ্গে ভাষারও ধরণ বদলায়।
আগে বদলায় মুখের কথা। আস্তে আস্তে লেখার ভাষাতেও তার ছাপ পড়ে। যৌথ পরিবারে শোনা যেত মেজদা, সেজদা, নদা, রাঙাদা, ফুলদা। কত্তাবাবা, ঠানদি। ভাসুর, বড়ঠাকুর, ভাদ্দরবৌ, বউমা। মাউইমা, তালুইমশাই। ছোট পরিবারে আজ আর এসবের চল নেই। তালপাতা, খাগের কলম। কাচপোকার টিপ, কাঠের খড়ম। পাদোদক, থুতকুড়ি। বারবেলা, অশ্লেষা, মঘা। হাঁচি, টিকটিকি, দিকশূল। উঠে যেতে বসেছে আট কলাই, যেটেরা, হাতেখড়ি, মুখেভাত। গ্রামেগঞ্জে থাবা বসায় শহুরে লবজ।
ভাষার ভালোমন্দ, নির্ভর করে তাকে কাজে লাগানোর ওপর। শুধু আদিখ্যেতা আর আহামরি করে কোনও ভাষাকে বাঁচানো যায় না। সে ভাষা রবীন্দ্রনাথেরই হোক আর কালিদাসেরই হোক।

মানুষের হাতধরা

মানুষের হাত ধরে চলে তার মুখের ভাষা। হাত ছেড়ে দিলে ভাষা পথ হারায়। এইভাবে কত ভাষা যে হারিয়ে গিয়েছে, তার ঠিক নেই।
যে ভাষা বহাল আছে, তার মধ্যেও চলেছে সমানে ভাঙাগড়া।
একসময় গরু আর ধান— এই ছিল গুণ আর ধনাঢ্যতার মাপকাঠি। গো শব্দ থেকে গোষ্ঠ, গোষ্ঠী, গুণ, গৌরব— তৈরি হয়েছে এমনই বিস্তর শব্দ। যার ধান আছে সে ধনবান।
যে-কোনও দেশের উন্নতির মাপকাঠি আজ আর পশুপালন বা চাষবাস নয়। সভ্যতার মূলমন্ত্র এখন যন্ত্র। হালবলদ নয়— ট্র্যাক্টর। শুভংকরী নয়— কম্পিউটার।

কাজ ফুরোলে

পুরনো শব্দ অকেজো হয়ে গিয়ে তার জায়গা নিচ্ছে নতুন নতুন শব্দ।
কিংবা নতুন কাজে লাগানো হচ্ছে পুরনো কথাগুলোকে।
'কচ্ছে না পাওয়া'— অর্থাৎ পাত্তা না পাওয়া।
শহরে তো বটেই, গ্রামেও এখন কচ্ছের দেখা পাওয়া দুর্ঘট।
হুঁকো আর আলবোলার জায়গা নিয়েছে এখন ঝাড়া-হাতপা-হওয়া বিড়ি সিগারেট চুরুট পাইপ।
তবু খোলনলচে সমেত আমাদের ভাষায় এখনও টিকে রয়েছে এমনকি অদৃশ্য হওয়া 'হুঁকোবরদার' শব্দটিও।
কালের ঝোড়ো-হাওয়ায় ধুতি প্রায় উধাও হয়েছে। সেইসঙ্গে বিদায় নিয়েছে 'নরুন পাড়' 'কোরা' 'কাছা' 'কোঁচা' 'মালকোঁচা' 'ফরাসডাঙা' 'গিলে'। 'আনকোরা' টিকে গিয়েছে 'নতুনে'র হাত ধরে। শালোয়ার-কামিজের সঙ্গে লড়াই করে শাড়ি আর কতদিন টিকবে কে জানে! 'শান্তিপুরি' 'টাঙাইল' 'জামদানি' 'ঢাকাই' 'ধনেখালি' 'পাছাপেড়ে' 'কস্তাপেড়ে' 'নয়ন সুখ' 'মাটাপালাম'— কী ভবিষ্যৎ এদের? মাথার চুলও তো ছোট হয়ে আসছে। 'এলোকেশ' 'শিথিল কবরী' 'ধম্মিল্ল' 'ধুদ্ধুড়ি' 'চুড়ো' 'কানড়া' 'ঝুঁটি' 'বিনুনি' বেড়াবেণি' 'পাটি খোঁপা'— এদেরও দিন ঘনিয়ে আসবে। কপালের টিপ আর সিঁথির সিঁদুর? কাজললতা? তরল আলতা?
বাঁচতে গেলে যখন যা লাগে ভাষাতেও শুধু কি তাই থাকে? এটা হওয়া স্বাভাবিক হলেও বাস্তবে পুরোপুরি তা ঘটে না। যা নেই তা দিয়ে আমরা মনের সাধ মেটাই। ইচ্ছেগুলো পূরণ করি। আকাশকুসুম আর লালকমল নীলকমল ছাড়া আমাদের চলে না। চাই পক্ষীরাজ ঘোড়া আর মন পবনের নাও। শুধু এরোপ্লেন হেলিকপ্টার ইস্টিমার সাবমেরিনে শানায় না।

হাল ফেরানো

কথার পিছনে ফিঙে হয়ে লেগে থাকলেও এও দেখা যায় যে, ফেলে-দেওয়া কথাগুলোকে ফের তুলে বেছে নতুন কোনও কাজে লাগানো হচ্ছে। 'দিগরে' 'পানে' 'পরে' 'বাগে' 'বিনে' 'সাথে'— এসবই যাওয়ার মুখে। বিশেষ করে লেখার বৃত্তে। 'করিবেক' 'তত্রাচ' 'দ্বারা' 'কুত্রাপি' 'কদাপি' গেলেও কোনওরকমে টিকে আছে 'কস্মিন' 'কদাচিৎ' কিঞ্চিৎ'।
শূন্যস্থান পূর্ণ করছে নতুন নতুন শব্দ। সেইসঙ্গে ভোল বদলে থেকে যাচ্ছে সাবেক কিছু শব্দ।
মনের ভাব ঠিকমতো ফোটাতে গেলে চাই বাছাই-করা লাগসই শব্দ। যথাস্থানে সার্থক শব্দ জুড়ে তৈরি হয় সার্থক বাক্য। ধানাইপানাই না করে বলতে হবে সংক্ষেপে সোজাসুজি। কথা জড়িয়ে না যায়। বুঝতে ভুল না হয়।

ঝাড়াইবাছাই

গান গেয়ে বলব 'গগনে গরজে মেঘ'। কিন্তু গদ্যে লিখব, 'আকাশে মেঘ ডাকছে'। আকাশের সমার্থক শব্দ অনেক। কিন্তু তার মধ্যে কটাই বা এখন আমরা ব্যবহার করি। বড়জোর 'গগনচুম্বী' 'বিমানঘাঁটি' 'নভশ্চর' 'ব্যোমযান' 'অভ্রভেদী'।
আমরা কেউ বলি 'জল'। কেউ 'পানি'। দরকার পড়লে বলি 'পাদোদক' 'কারণবারি' 'সলিলসমাধি' 'লবণাম্বু'। মেঘের ডাকনামেই কাজ চলে যায়। 'নীরদ' 'জলদ' 'বলাহক' 'জলধর'— এসব পোশাকি নামের বড় একটা দরকার হয় না।
পৃথিবীর কত নাম। 'জগৎ' 'বিশ্ব' 'সংসার' 'ধরা' 'চরাচর' 'ধরিত্রী' 'ধরণী' 'দুনিয়া' 'মেদিনী' 'বসুমতী' 'বসুন্ধরা' 'ইহলোক' 'ভুবন'। আরও কত কী। বলে থাকি 'ভূখণ্ড' 'ভূভারত' 'ভূমণ্ডল' 'ভূতল' 'ভুবন' 'ক্ষিতি' 'পৃথ্বী'। জেনে রাখি 'মহী' 'ইরা' 'ইলা' 'নিখিল' 'অখিল' 'বসুধা'। কিন্তু না জানলেও চলে 'ক্ষণা' 'পিষ্টপ' 'ক্রোড়কান্তা' 'বীজসূ' 'গো' 'দ্বিরা' 'পারা' 'ক্ষৌণি' 'ইরা' 'আদ্যা' 'গন্ধবতী'।
সূর্যের সমার্থক 'রবি' 'ভাস্কর' 'ভানু' 'তপন' 'আদিত্য' 'অর্ক' 'অরুণ' 'মার্তণ্ড' 'দিবাকর' 'মিত্র' 'সবিতা' 'অর্যমা' 'ইতু' 'আফতাব' 'পূষণ'। না জানলেও চলে 'অজিষ্ণু' 'অজিষ্ঠ' 'গভস্তিহস্ত' 'ত্বিষামীশ' 'ব্রধ্ন' 'বিকর্তন' 'খমণি'।
আরবিভাষায় উটের আছে শত নাম।
এক সময়ে প্রকৃতিকে খুঁটিয়ে জানার জন্য এসব শব্দ গড়বার দরকার হয়েছিল।
যেমন কাজের সময় কাজি, কাজ ফুরোলে পাজি। দরকার মিটে গেলে শব্দেরও হয় সেই হাল।

বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাশিক্ষা

বঙ্কিমচন্দ্র শুধু যে বড় লেখক ছিলেন, তাই নয়; কারা লিখবে এবং কেমন করে লিখবে, সে বিষয়েও তিনি স্পষ্ট করে তাঁর মত ব্যক্ত করেছেন।

তাঁর লেখা 'বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন' 'লিখিবার ভাষা' আর 'সহজ রচনাশিক্ষা'— এই কয়েকটি প্রবন্ধ থেকে কিছু উদ্ধৃতির সঙ্গে সংক্ষেপে তাঁর বক্তব্য তুলে ধরতে চাই।

লেখার উদ্দেশ্য হবে মানুষের ভালো করা আর সৌন্দর্য ফুটিয়ে তোলা। নাম করা বা টাকা করা নয়। ভালো লিখলে, না চাইলেও নাম হবে। উন্নততর সমাজে টাকা পেয়েও ভালো লেখা যায়।

ধীরে সুস্থে সময় নিয়ে মেজেঘষে তবেই লেখা ছাপতে দেওয়া উচিত।

লেখা হতে হবে অকপট সরল স্বচ্ছন্দ। আর কারও মতো না হয়। অহেতুক রসালঙ্কার যেন সৌন্দর্য আর আস্বাদনে বিঘ্ন না ঘটায়। বিনা প্রমাণে কিছু বলা না হয়।

'সহজ রচনা শিক্ষা'র গোড়ায় বলা হয়েছে: 'রচনা অতি সহজ। মুখে মুখে কহিবার সময়েও আমরা সাজাইয়া কথা কই, তাহা না করিলে কেহ আমাদের কথা বুঝিতে পারিত না। অতএব যে মুখে মুখে কথোপকথন করিতে পারে, লিখিতে জানিলে সেও অবশ্য লিখিত রচনা করিতে পারে। তবে যেমন সব কাজেই তেমনি লেখার জন্যেও চাই কিছু গুণপনা, যা রপ্ত করতে হয়।

রচনার গুণাগুণ

বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন:'রচনার চারিটি গুণ বিশেষ করিয়া শিখিতে হইবে। এই চারিটির নাম: (ক) বিশুদ্ধি, (খ) অর্থব্যক্তি, (গ) প্রাঞ্জলতা, (ঘ) অলঙ্কার।'

(ক) বিশুদ্ধির ক্ষেত্রে তিনি জোর দিয়েছেন বানান, ব্যাকরণ আর শিষ্ট বচনের ওপর। বানানে আর ব্যাকরণে পুরনো অনেক নিয়ম এখন আর খাটে না। মুখের অজাত-কুজাত অনেক শব্দ কালক্রমে কলমের আঁচড়ে জাতে উঠেছে। চলমান ভাষার এটাই ধর্ম। এ নিয়ে পরে আরও বলা যাবে।

(খ) অর্থব্যক্তি। সঠিক শব্দে মনের ভাব প্রকাশ করা। তেমন শব্দ নিজেদের না থাকলে পরের কাছ থেকে নিতে হবে কিংবা একই গোত্রের কোনও সমার্থক বাংলা শব্দকে বিশেষ অর্থে কাজে লাগাতে হবে।

(গ) প্রাঞ্জলতা। বঙ্কিমচন্দ্র বলছেন: 'প্রাঞ্জলতা রচনার বড় গুণ। তুমি যাহা লিখিবে, লোকে পড়িবামাত্র যেন তাহা বুঝিতে পারে।'

১। একটি বস্তুর হয়তো অনেক নাম। যেমন আগুনের নাম অগ্নি, অনল, হুতাশন, হুতভুক, বৈশ্বানর, বায়ুসখা। আরও কত কী। কিন্তু আগুন বা অগ্নি বললে এক ডাকে সবাই চিনবে।

২। 'অনর্থক কতকগুলো সংস্কৃত শব্দ লইয়া সন্ধি-সমাসের আড়ম্বর করিও না— অনেকে বুঝিতে পারে না।'

৩। 'অনর্থক কথা বাড়াইও না। অল্প কথায় কাজ হইলে, বেশি কথার প্রয়োজন কি?'

৪। 'জটিল বাক্য রচনা করিও না। অনেকগুলি বাক্য একত্র করা হইলে বাক্য জটিল হয়।... জটিল বাক্যটি ভাঙিয়া ছোট ছোট সরল বাক্যে সাজাইবে।'

৫। 'যেখানে স্থূল বাক্যটি বুঝিতে কঠিন, সেখানে উদাহরণ প্রয়োগে বড় পরিষ্কার হয়।'

৬। 'স্থূল বাক্যটি বড় সংক্ষিপ্ত হইলে অনেক সময় বুঝিবার কষ্ট হয়। এমন স্থলে সম্প্রসারণ করিবে।'

(ঘ) অলঙ্কার। 'অলঙ্কার ধারণ করিলে যেমন মানুষের শোভা বৃদ্ধি পায়, অলঙ্কার ধারণ করিলে রচনারও সেইরূপ শোভা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু অলঙ্কার প্রয়োগ বড় কঠিন।'

এ নিয়ে পরে কথা বলা যাবে। এখন দেখা যাক লেখার প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র আর কী বলেছেন।

সাধুভাষা

'...কিছুকাল পূর্বে দুইটি পৃথক ভাষা বাঙ্গালায় প্রচলিত ছিল। একটির নাম সাধুভাষা; অপরটির নাম অপর ভাষা। একটি লিখিবার ভাষা, দ্বিতীয়টি কহিবার ভাষা।... গদ্য-গ্রন্থাদিতে সাধুভাষা ভিন্ন অন্য কিছু ব্যবহার হইত না। যাঁহারা ইংরেজিতে পণ্ডিত, তাঁহারা বাঙ্গালা লিখিতে পড়িতে না জানা গৌরবের মধ্যে গণ্য করিতেন। সুতরাং বাঙ্গালায় রচনা ফোঁটা-কাটা অনুস্বারবাদীদিগের একচেটিয়া মহল ছিল।...

'... টেকচাঁদ ঠাকুর প্রথমে এই বিষবৃক্ষের মূলে কুঠারাঘাত করিলেন।... তিনি ভাবিলেন, বাঙ্গালার প্রচলিত ভাষাতেই বা কেন গদ্যগ্রন্থ রচিত হইবে না?... সেইদিন হইতে বাঙ্গালা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি।'

'...স্থূল কথা, সাহিত্য কি জন্যে? গ্রন্থ কি জন্যে? যে পড়িবে, তাহার বুঝিবার জন্যে। না বুঝিয়া, বহি বন্ধ করিয়া পাঠক ত্রাহি ত্রাহি করিয়া ডাকিবে, বোধহয় এ উদ্দেশ্যে কেহ গ্রন্থ লিখে না।...'

'... বিষয় অনুসারেই রচনার ভাষার উচ্চতা বা সামান্যতা নির্ধারিত হওয়া উচিত। রচনার প্রধান গুণ এবং প্রথম প্রয়োজন সরলতা এবং স্পষ্টতা।' বঙ্কিমচন্দ্রের মতে, সরল স্পষ্ট কথা যদি সুন্দর করে বলা যায়, তাহলে হবে সোনায় সোহাগা। কিন্তু সৌন্দর্যের খাতিরে সোজা কথা পেঁচিয়ে বলা ঠিক নয়। নেহাৎ অখাদ্য কুখাদ্য ছাড়া, কোনও শব্দই পাঠকের পাতে দেওয়ার অযোগ্য নয়।

লেখককে হতে হবে সৎ।
নইলে পাঠক খোলা মনে
তাঁকে নেবে না।
লিখতে হবে মন খোলসা
করে। আমতা আমতা না
করে, চিবিয়ে চিবিয়ে না
বলে সাদা কথা
সিধেভাবে বলতে হবে।
ইনিয়ে বিনিয়ে বলতে গিয়ে
ধানাইপানাই করলে
কথার দাম থাকে না।

পিছুটান

কয়েকটা কথা এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার। মনে মনে চাইলেও বঙ্কিমচন্দ্র কিন্তু সাধুভাষার গণ্ডি ছেড়ে খুব বেশি এগোতে পারেননি।

তাঁর মতে, 'করছি-করেছি' লেখা চলবে না। লিখতে হবে 'করিতেছি-করিয়াছি।' 'মূর্খামি' 'আহাম্মুখি' অশুদ্ধ। শুদ্ধ ভাষায় হবে 'মূর্খতা' 'অহম্মুখতা'।

মুখের লাগাম বজায় রেখে তিনি চেয়েছিলেন বাংলা ভাষায় সংস্কৃতের রাশটাকে আলগা করতে।

বাবু শ্যামাচরণ

বঙ্কিমের লেখা থেকে আমরা এও জানতে পারি যে, সে সময়েও কেউ কেউ চেয়েছিলেন আরও কয়েক পা এগোতে।

যেমন, বাবু শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায়। বঙ্কিমচন্দ্র স্বীকার করেছেন: 'তাঁহার মতগুলি অনেক স্থলে সুসঙ্গত এবং আদরণীয়। অনেক স্থলে তিনি কিছু বেশি গিয়াছেন। বহুবচন জ্ঞাপনে গণ শব্দ ব্যবহার করার প্রতি তাঁহার কোপদৃষ্টি। বাঙ্গালায় লিঙ্গভেদ তিনি মানেন না। পৃথিবী যে বাঙ্গালায় স্ত্রীলিঙ্গবাচক শব্দ, ইহা তাঁহার অসহ্য। বাঙ্গালায় সন্ধি তাঁহার চক্ষুঃশূল।...এইরূপ তিনি বাঙ্গালা ভাষার ওপর অনেক দৌরাত্ম্য করিয়াছেন।' তাঁর কিছু কিছু মত যে সমর্থনযোগ্য বঙ্কিমচন্দ্র সে কথাও জানাতে ভোলেননি। সাধুভাষাকে ধাপে ধাপে সরিয়ে প্রায় সর্বত্রই এখন চলিত ভাষার চলন হয়েছে। বিশেষ ক্রিয়াকাণ্ডে ছাড়া সাধুক্রিয়ার খুব একটা দর্শন মেলে না। সর্বনাম, অব্যয়, ক্রিয়া আর যাবতীয় শব্দের কথ্যরূপ— এই নিয়েই চলিত ভাষার ঘরসংসার।

সব সত্ত্বেও বলা আর লেখা কখনই এক হয় না। মুখে বলা আর লিখে বলার মধ্যে পার্থক্য একটা থেকেই যায়।

লাগসই শব্দ

লিখতে গিয়ে প্রায়ই আমাদের বাঁশবনে ডোম কানার দশা হয়। কোন শব্দটা বসাব?

একই বস্তু বা একই ভাব বোঝাতে রকমারি শব্দ আছে। যাকে আমরা বলি প্রতিশব্দ বা সমার্থক শব্দ।

একটু খুঁটিয়ে দেখলে বোঝা যায়, দুটি প্রতিশব্দে মিল থাকলেও তারা হুবহু এক নয়।

যেমন গাছের নানা প্রতিশব্দ: উদ্ভিদ, বৃক্ষ, তরু, পাদপ, দ্রুম। সেইসঙ্গে বর্তমানে অচলিত আরও কিছু প্রতিশব্দ যেমন: পত্রী, স্কন্ধী, শাখী, পল্লবী, অগচ্ছ।

বড় গাছ বলতে এখনও ব্যবহার হয়— মহীরুহ, বনস্পতি।

মাঝেমধ্যে 'বৃক্ষ' 'তরুলতা' 'কল্পদ্রুম' ব্যবহার করলেও, 'গাছ' আর 'উদ্ভিদ' দিয়েই আমাদের রোজকার কাজ চলে যায়।

আকাশকে 'অম্বর' 'অভ্র' 'ব্যোম' 'নভস' 'উড়ুপথ' 'দ্যৌ' 'রোদসী' না বলে আকাশ বলতেই আমরা বেশি পছন্দ করি। সময়ে সময়ে কাজে লাগে 'অন্তরীক্ষ' বা 'শূন্য'। মুখ বদলাতে মাঝে মাঝে 'অভ্রভেদী' 'নভশ্চর' 'দ্যুলোক'। ব্যোম কিংবা বিমান।

আমরা যখন যেভাবে বাঁচি, তখন সেইমতো গড়ে ওঠে আমাদের ভাষার শব্দভাণ্ডার। অদরকারি শব্দগুলোকে ফেলে দিয়ে যেখান থেকে হোক জুটিয়ে নিই কাজে-লাগা নতুন শব্দ।

টিভি, ফ্রিজ, কম্পিউটার, ইন্টারনেট, ফ্যাক্স, ই-মেল, টেপরেকর্ডার, ভিডিও, এস টি ডি— গ্রামগঞ্জেরও হালচাল বদলে দিচ্ছে।

টেলিভিশন হয়েছে টিভি। শুধু 'দূরদর্শনে' শানাচ্ছে না। বাংলায় 'ছোট পর্দা' কথাটাও চলছে। লোকমুখে কালক্রমে কোন কথা কী আকার নেবে কেউ বলতে পারে না। সিনেমাকে এখন আর কেউ বায়োস্কোপ বলে না। 'চলচ্চিত্র' হয়ে গিয়েছে শুধু 'ছবি'। এখন আর শোনাই যায় না 'টকি' কিংবা 'সবাকচিত্র'। শব্দের এই উদয়াস্তের ভেতর দিয়ে ভাষার দিনবদল হয়।

শব্দ এক থাকলেও ক্রমে তার অর্থ বদলে যেতে পারে।

মহাজন এখন আর মহৎ জন বা ধার্মিক পুরুষ নন। এখন সে ব্যক্তি হয় সুদের কারবারি, নয় আড়তদার। ইতর ছিল 'অপর', এখন 'নীচ' বা 'অধম'। 'জলপান' বা 'জলযোগ' বলতে হাল্কা খাবার। বড়সড় গ্রাম ছিল 'গণ্ডগ্রাম', এখন হয়েছে অজ পাড়াগাঁ। যাকে 'পয়সাওয়ালা' বলি, তার অনেক টাকা আছে।

মনে-মুখে এক হওয়া

মনে-মুখে কাজে-কথায় এক না হওয়ায় শব্দের ওপর লোকের ভক্তি চটে যাচ্ছে। 'খাঁটি নির্জলা দুধে' কতটা জল, 'নির্ভেজাল তেলে' কীসের মেশাল আছে আমরা জানতে চাই। 'আদি ও অকৃত্রিম' 'একমাত্র বিশ্বস্ত' 'হস্ত দ্বারা স্পৃষ্ট নয়' 'জলের দাম' 'বিফলে মূল্য ফেরত'— এসব কথায় কেউই আর কান দেয় না।

লেখককে হতে হবে সৎ। নইলে পাঠক খোলা মনে তাঁকে নেবে না। শাক দিয়ে মাছ ঢাকলে কিংবা আণ্ডায় গুণ্ডা গুনলে পাঠকের চোখে তা ধরা পড়ে যাবে।

লিখতে হবে মন খোলসা করে। আমতা আমতা না করে, চিবিয়ে চিবিয়ে না বলে সাদা কথা সিধেভাবে বলতে হবে। ইনিয়ে বিনিয়ে বলতে গিয়ে ধানাইপানাই করলে কথার দাম থাকে না। লিখতে হবে পুরোপুরি নিজের মতো করে। তাতে চটকদারি লোকদেখানো ভাব না থাকে। লেখাটা যেন হয় মুখে কথা বলার মতো। লেখায় পরের মুখে ঝাল খাওয়া কিংবা পরের বুলি আওড়ানো একেবারেই ঠিক নয়।

যতটুকু দরকার

যতটুকু দরকার, শুধু ততটুকুই বলতে হবে। তার বেশিও নয়, কমও নয়।

(১) কোনও বাক্যে অযথা শব্দের বোঝা চাপানো ঠিক নয়।

— সব দিক দিয়ে বিষয়টি আমরা সার্বিকভাবে বিবেচনা করে দেখছি। (হয় 'সব দিক দিয়ে', নয় 'সার্বিকভাবে'— দুইয়ের একটি লেখাই যথেষ্ট।)

— এ বিষয়ে সংশয় নেই যে, কোনও কোনও রাজনৈতিক নেতা দাগি অপরাধীদের সঙ্গে সন্দেহাতীতভাবে যুক্ত। অনায়াসে 'এ বিষয়ে সংশয় নেই যে' কিংবা 'সন্দেহাতীতভাবে' বাদ দেওয়া যায়।

— স্থায়ী বাসিন্দা হিসেবে অধুনা এই শহরেই ওঁরা পাকাপাকিভাবে বসবাস করেন। 'স্থায়ী বাসিন্দা হিসেবে' কিংবা 'পাকাপাকিভাবে' স্বচ্ছন্দে বাদ দেওয়া যায়।

ঠিকঠাক

(২) ভাসা-ভাসাভাবে না বলে স্পষ্ট এবং নির্দিষ্ট করে বলতে হবে।

— এ বিষয়ে আপনারা নিঃসন্দেহ থাকুন যে, আপনাদের যা যা দাবি আমরা তা পূরণ করার বিষয়টি বিবেচনা করে দেখব। (আপনাদের যাবতীয় দাবি অবশ্যই আমরা বিবেচনা করব।)

— আশা করি, প্রত্যেক বিবেকবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ এই মহৎ কাজে তাঁদের সাহায্যের হাত প্রসারিত করবেন। (আশা করি, সমস্ত বিবেকবান মানুষই এ কাজে সহযোগী হবেন।)

জানাচেনা

(৩) খটমট শব্দের বদলে সবার জানা আটপৌরে শব্দ ব্যবহার করা ভালো।

— ছেলেটির প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে বহু লোকের প্রাণরক্ষা হয়। (ছেলেটির উপস্থিতবুদ্ধিতে বহু লোকের প্রাণ বাঁচে।)

— অন্তঃপুরবাসিনীরা সে যুগে ছিলেন অসূর্যম্পশ্যা। (ঘরের মেয়েরা সে যুগে ছিলেন পর্দানশিন।)

বেশি ব্যবহারের ফলে কোনও কোনও শব্দের দশা হয় ঘষা পয়সার মতো। ছেঁদো কথায় লোকে কান দিতে চায় না।

একেক সময়ে একেকটা শব্দ লেখকদের যেন পেয়ে বসে। দৈনিকপত্রের পাতায় একটু চোখ বোলালেই হাল আমলের এইসব মার্কামারা শব্দ নজরে পড়বে। যেমন: খবরে প্রকাশ (জানা যায়); ফলশ্রুতি (ফল, পরিণাম); জেরে (ফলে); পরিপ্রেক্ষিতে (পটভূমি, পশ্চাৎপট, পরিমণ্ডল, পরিপার্শ্ব); সাক্ষাৎকার (প্রশ্নোত্তর, মোকাবিলা, দেখা হওয়া); ওয়াকিবহাল (অভিজ্ঞ, সুবিদিত); প্রতিক্রিয়া (মনোভাব)।

একঘেয়ে কথা না লিখে মাঝে মাঝে একটু মুখবদল করা ভালো।

ক্রমশ

আমলাহি

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়

ছোটলোক-বড়লোক

না, পাঠক চোখ কচলাইবেন না, এককালে দেশ চালাইতেন রাজারা, নবাব-বাদশাহরা। কালে কালে কত রাজা কত বাদশাহ এসেছেন এ-দেশে, তাঁরা নিজের নিজের স্টাইলে দেশ চালাতেন, তাঁদের চালচলন, আদব-কায়দা, মর্জিমেজাজ সবই ইতিহাসে লেখা আছে, তাঁদের সেই ট্র্যাডিশন কিছুটা হলেও বর্তেছে পরবর্তীকালের প্রশাসকদের ওপর।

বাদশাহদের সেই জীবনচর্যা ইতিহাসবিদের কলমে পেয়েছে একটি অভিধা— 'বাদশাহি'। নবাবদের চালচলন পেয়েছে 'নবাবি' অভিধা।

'বাদশাহি মেজাজ', 'নবাবি চাল' শব্দগুলি তো বহু সাহিত্যিকের কলমে ব্যবহৃত হয়েছে ফ্রেজ-ইডিয়ামের মতো।

এখন দেশে রাজা-বাদশাহরা নেই, দেশ চালান মন্ত্রীরা। কিন্তু মন্ত্রীরা ভোটে জিতে দেশ চালাতে আসেন বলে তাঁদের নবাবি বা বাদশাহি চালচলন দেখানোর জো নেই। তাঁদের বাদশাহি বেশি নজরে পড়লে কলম উঁচিয়ে বসে থাকেন অডিটর ইন জেনারেল। অডিটরের কলমের খোঁচায় তাঁদের ত্রাহি মধুসূদন। পরের নির্বাচনে তাদের ফুটিয়ে দেবেন নির্বাচকরা।

কিন্তু মন্ত্রীদের অন্তরালে যাঁরা দেশ চালান তাঁরা হলেন আমলা। আমলানির্ভর এই দেশ, আমলাদের নেই ভোটের ভয়। তারা বড়জোর বদলি হতে পারেন এক দপ্তর থেকে আরেক দপ্তরে। তাই সরকারি খরচে সাজানো একটি বৃহৎ চেম্বার, মোটামুটি চলনসই বেতন ও একটি সরকারি গাড়ির সৌজন্যে যা কিছু বাদশাহি দেখান তা এই আমলারা। কিন্তু তাঁরা তো বাদশাহ নন যে বাদশাহি দেখাবেন! বরং তাঁরা যা দেখান তাকে বলতে পারি 'আমলাহি'।

তা এই আমলাহি নিয়েই এই সিরিজ। আমলাহি কত রকমের হতে পারে তা নিয়ে একের পর এক কিস্তিতে পেশ করা যাক পাঠকের সামনে। প্রথমে এক নভিস আমলাকে নিয়ে শুরু করি এই লেখা। জনান্তিকে বলি, জেলায়-জেলায়, মহকুমা শহরে, খাস কলকাতার মহাকরণে এইসব ব্যুরোক্র্যাটদের নিয়ে নানা রঙ্গরসিকতা চালু আছে, সবই গোপনে ও একান্তে আলোচিত হয় দপ্তরের টেবিলে-টেবিলে, ক্যান্টিনে রুটি-আলুরদম খেতে খেতে, লম্বা বারান্দায় রকমারি গসিপের মুহূর্তে।

ফলে কোনও কোনও গল্প পাঠকের কাছে চেনা হলেও হতে পারে, পাঠক তা পুনর্বার জেনে ও মনে পড়ায় আনন্দ পাবেন। কারও কাছে হলেও হতে পারে নিরানন্দ।

সদ্য চাকরি পাওয়া এক অবাঙালি এস ডি ও-র মহকুমায় ভিজিটে এসেছেন ডিভিশনাল কমিশনার।

ডিভিশনাল কমিশনার মানে চার-পাঁচটা জেলার দায়িত্বে, জেলাশাসকদেরও ওপরে, কিন্তু আসলে তিনি নখদন্তহীন বাঘ, দূর থেকে হালুম-হুলুম পর্যন্ত করতে পারেন জেলাশাসক বা মহকুমাশাসকদের উদ্দেশে, কিন্তু তাঁকে খুব একটা রেয়াত করেন না ডি এম বা এস ডি ও-রা।

কিন্তু এই নতুন এস ডি ও কাঁথি মহকুমার দায়িত্বে এসে এখনও সড়গড় হননি এলাকা সম্পর্কে, বাংলা ভাষাটাও তেমন বুঝে উঠতে পারেননি এখনও, কিন্তু দায়ে পড়ে বাংলা বলতেই হয় তাঁকে।

ডিভিশনাল কমিশনারকে আপ্যায়ন করতে গিয়ে বললেন, আপনি কেমন আছে, স্যার?

আছে ও আছেন-এর পার্থক্য প্রায়ই গুলিয়ে ফেলেন, আর্দালিকেও বলে বসেন, তুমি কখন এলেন, সুরেন?

তরুণ এস ডি ও বেশ লম্বা-চওড়া মানুষ, তাঁর পাশে মাঝবয়সি ডিভিশনাল কমিশনার খর্বকায়।

বেঁটেখাটো চেহারা হলেও ডিভিশনাল কমিশনার মানুষটি বেশ রসিক, উপভোগ

করছেন তরুণ এস ডি ও-র আনাড়িপনা। সে এখনও টিকটিকি মাকড়সা শব্দগুলির সঙ্গেও পরিচিত হতে পারেনি। তিনি তাঁর পুরনো আমলের বাংলোয় প্রচুর ছিপকলি হয়েছে বলতে অফিসের কেউই বুঝে উঠতে পারেনি ছিপকলি বস্তুটি আসলে কী! অবশেষে তাঁর অফিস চেম্বারে একটি টিকটিকি আবিষ্কার করে বললেন, এই তো ছিপকলি!

সেই এস ডি ও বেরিয়েছেন ডিভিশনাল কমিশনারকে নিয়ে এলাকায়। কমিশনার সাহেবের খুব ইচ্ছে সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র কোন পটভূমিকা নিয়ে কপালকুণ্ডলা লিখেছিলেন তা একবার ভিজিট করে আসা। এস ডি ও তো বঙ্কিমচন্দ্রের নামই শোনেননি, কিন্তু কমিশনারের কাছে বঙ্কিমচন্দ্রের নাম ও সাহিত্যিক-খ্যাতি শুনে ভক্তি গদগদ চিত্তে বেরলেন কমিশনারকে নিয়ে।

সঙ্গে অবশ্য কাউকে নেননি, কেননা তাঁর ড্রাইভার জায়গাটা ভালোমতো জানেন, ইতিপূর্বে আরও বহু সাহেবকে নিয়ে পাড়ি দিয়েছেন কপালকুণ্ডলার উৎস সন্ধানে।

যেতে-যেতে গাড়ির মধ্যে কথোপকথন হচ্ছে দুজনের। ডিভিশনাল কমিশনার জিজ্ঞাসা করলেন, কেমন লাগছে তোমার এরিয়া। তুমি জানো ইয়োর সাব-ডিভিশন ইজ ওয়ান অব দি বিগেস্ট সাব-ডিভিশনস ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল?

—ইয়েস স্যার, থার্টিন ব্লকস। সাম অব দেম আর রিভারাইন।

তেরোটি বি ডি ও অফিস, থানাও গোটা নয়-দশ, প্রচুর নদীনালা। সত্যিই বেশ বড় এলাকা।

—দিঘায় ঘুরে এসেছ?

এস ডি ও বললেন, ইয়েস স্যার, দিস ইজ দি ফার্স্ট টাইম ইন মাই লাইফ আই স এ সি—

এস ডি ও উত্তর ভারতের বাসিন্দা, সমুদ্র না-ও দেখতে পারেন, তাই ডিভিশনাল কমিশনার তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, জীবনে প্রথম সমুদ্র দেখে কী ইমপ্রেশন হল তোমার?

এস ডি ও-র সরল সাদাসিধে জবাব, স্যার, খুব ভয় পেয়ে গেলাম এত্না জল দেখে। আই ডোন্ট নো হাউ টু সুইম, স্যার।

ডিভিশনাল কমিশনার হাসলেন, বললেন, এই মহকুমায় বহু এস ডি ও এসেছেন চাকরি করতে, তাঁদের অনেকেই সাঁতার শেখেননি ছোটবেলায়, তাতে কী হয়েছে!

—স্যার, শুনছি কন্টাইতে বছর-বছর বন্যা হয়, বহু ঘরবাড়ি বন্যায় ভেসে যায়, বহু মানুষও ভেসে যায়, গরু-ছাগল তো ভেসে যায়ই শয়ে শয়ে। প্রায় বছরই নাকি ক্যাজুয়ালটি হয়! একবার নাকি একটা জিপও ভেসে গিয়েছিল জলের স্রোতে!

ডিভিশনাল কমিশনার আবার হেসে বললেন, কিন্তু কখনও কোনও এস ডি ও ভেসে গিয়েছেন বলে শুনিনি!

—কিন্তু স্যার, ফ্লাড হলে এস ডি ও-কেও তো ভিজিট করতে বেরতে হয় এলাকা! একজন স্টাফ আমাকে বলছিল, স্যার, সাঁতারটা শিখে নিলে ভালো করতেন! কী করি বলুন তো, স্যার?

ডিভিশনাল কমিশনার তার পিঠ চাপড়ে বললেন, বেটার ইউ লার্ন হাউ টু সুইম। তোমার কোনও আর্দালিকে বলো তোমাকে কোনও পুকুরে নিয়ে গিয়ে চুবিয়ে আনতে।

'চুবিয়ে-আনা' শব্দটা এস ডি ও-র ঠিক চেনা মনে হল না!

যাই হোক, ডিভিশনাল কমিশনারের ইচ্ছানুযায়ী বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতিবিজড়িত জায়গাগুলো দেখা হল, যথোচিত উচ্ছ্বাস প্রকাশের পর ডিভিশনাল কমিশনার প্রকাশ করলেন তাঁর পরবর্তী ইচ্ছে, বুঝলে, তোমার এখানে একটা পুরনো ডাকবাংলো আছে, সেখানে আজকের রাতটা কাটিয়ে যাই।

ডিভিশনাল কমিশনারের ইচ্ছা আসলে হুকুম। সেখানে কোনও 'কিন্তু' বা 'কেন' প্রকাশের সুযোগই নেই। অতএব ড্রাইভার খুঁজে বার করল সেই পুরনো ডাকবাংলো, কিন্তু যথোচিত পরিষ্কার নয়। চৌকিদার একজন আছে বটে, কিন্তু বহুকাল কেউ এখানে এসে রাত্রিবাস করেন না বলে বাংলোর মতো তার শরীর ও হাতেও মরচে ধরে গিয়েছে। সাহেবরা এখানে রাত্রিবাস করবেন শুনে সেই বৃদ্ধবয়সি চৌকিদার প্রায় অজ্ঞান।

কিন্তু ডিভিশনাল কমিশনার এসেছেন এলাকা পরিদর্শনে, তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ করতে না পারলে এস ডি ও-র অ্যানুয়াল কনফিডেন্সিয়াল রোলে পড়তে পারে লাল দাগ, অতএব যে-করেই হোক, এখানেই ব্যবস্থা করতে হবে থাকা-খাওয়ার।

তরুণ এস ডি ও যার-পর-নাই বিপন্ন। এখানে কোনও নাজিরবাবু নেই যে, ম্যাজিক দেখিয়ে প্রয়োজনে একটা অস্থায়ী তাঁবু খাটিয়ে দেবেন মুহূর্তের মধ্যে।

তাঁর ড্রাইভার অবশ্য ভারী চালাক-চতুর, তক্ষুনি বাংলোর ভেতর থেকে দুটো চেয়ার মুছেটুছে পরিষ্কার করে বারান্দায় পেতে দিয়ে বললেন, স্যার, আপনারা এখানে বসুন, আমি চায়ের ব্যবস্থা করছি।

এস ডি ও-কে একান্তে ডেকে বললেন, স্যার, আপনি ভাববেন না, আমি এখনই চৌকিদারকে দিয়ে ঝাড়পোঁছ করে পরিষ্কার করে ফেলছি বাংলো। তারপর তাকে দিয়ে বাজার করিয়ে রান্নার ব্যবস্থাও করছি, তাতেও যদি অসুবিধে হয়, গাড়ি নিয়ে গিয়ে কোনও হোটেল থেকে খাবার নিয়ে আসছি।

ড্রাইভার দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞ, রাত নটার মধ্যে সব ব্যবস্থা করে ছোট্ট ডাইনিংয়ে দিব্যি দুটো থালা সাজিয়ে দিলেন গরম ভাত, ডাল, মাছভাজা আর ডিমের ঝোলে।

ডিভিশনাল কমিশনার ভারি খুশি ছোকরা এস ডি ও-র কর্মতৎপরতায়।

কিন্তু সমস্যা হল রাতে শোওয়ার সময়, বাংলোর বেডরুমে মাত্র একটাই খাট, সেটি ডাবল-বেডেড হলেও ডিভিশনাল কমিশনারের সঙ্গে তো আর এক খাটে শুতে পারে না এস ডি ও, অতএব আবার ড্রাইভারের শরণাপন্ন হলেন, শিগগির দেখুন, কোথাও থেকে আরেকটা খাট জোগাড় করা যায় কিনা। না হলে আমাকে এই শিরদাঁড়া বার-করা সোফায় শুতে হবে রাতে।

— স্যার, সেই ব্যবস্থাও করছি।

আধঘণ্টার মধ্যে একটা খাটও বিছানা সহ জোগাড় করে ফেললেন ড্রাইভার। পাশাপাশি ঘরে দুটি বিছানা। কিন্তু নতুন যে খাটটি আনা হল, সেটি তেমন সুবিধের নয়, দৈর্ঘ্যেও যথেষ্ট ছোট, তাতে লম্বা গড়নের এস ডি ও-র পা ধরবে না। একটু ভেবে তার উপায় বার করলেন এস ডি ও, কমিশনারের কাছে গিয়ে বললেন, স্যার, আমি বড় লোক, আমি বড় খাটটায় শুই, আর আপনি ছোট লোক, আপনি ছোট খাটটায় শোবেন।

গল্পটার এখানেই সমাপ্তি ঘটুক, না হলে রসভঙ্গ হয়।

ব্যুরোক্র্যাটদের নিয়ে এমন নানা অভিজ্ঞতা লোকমুখে ছড়াতে ছড়াতে মিথ হয়ে যায় একসময়।

কিন্তু কেউ জন্মেই তো আর ব্যুরোক্র্যাট হয় না!

সাধারণ ঘরের এক যুবকও হঠাৎ পরীক্ষাটরীক্ষা দিয়ে একদিন নিজেকে আবিষ্কার করে ব্যুরোক্র্যাট হিসেবে। তখনও সে বুঝতে পারে না আসলে কী হয়েছে! তার বাড়ির লোকও উপলব্ধি করতে পারে না ঠিক কী ধরণের অফিসার হয়েছে তাদের বাড়ির ছেলে!

এরকম একটি গল্প প্রচলিত যে, এক সাব-রেজিস্ট্রার হঠাৎ আই এ এস পরীক্ষা দিয়ে পাশ করার পর যখন লাফালাফি করছে আনন্দে, তার স্ত্রী (সাব-রেজিস্ট্রার থাকাকালীনই বিয়ে করেছিল) খুশি-খুশি মুখে জিজ্ঞাসা করেছিল, কী হলে এবার তুমি? থানার দারোগা?

গ্রামের মেয়ে, তার জীবনে দারোগাই পৃথিবীর সর্বশক্তিমান ব্যক্তি।

তো ব্যুরোক্র্যাট হওয়ার পর একজন সাধারণ যুবকও তখন বদলে যায় রাতারাতি। তার খোলনলচে বদলে গিয়ে ব্যুরোক্রেসির ঘেরাটোপের মধ্যে ঘাড় শক্ত করে সে উপবিষ্ট। কাল যে বন্ধু ছিল তার সঙ্গেও কথা বলে ঘাড় স্টিফ করে। সেই স্টিফস্কন্ধ ব্যুরোক্র্যাটটিকে দেখলে বন্ধুরাও তখন শতহস্ত দূরে। নেহাৎ কেউ ঠেকে গেলে যদি তার সাহায্য নিতে যায়, তার অভিজ্ঞতা কী হতে পারে তা দেবাঃ ন জানন্তি।

ব্যুরোক্র্যাটদের জীবনপঞ্জি ঘাঁটলে তাদের মূলত কয়েকটি ক্যাটেগরিতে ভাগ করা যায়, যেমন— কেউ বাবু-টাইপের, কেউ বাদশা-টাইপের, কেউ—

বাকিটা শোনাব বারান্তরে।

শিরোচিত্র: অর্ক পৈতন্ডী

ছবি: প্রণব হোড়

আজকের বাঙালির বাঙালিয়ানা

অমিত কুশারী

টিভির বাংলা চ্যানেলগুলোর নিয়মিত দর্শক আমি। টিভি দেখে উপলব্ধি করি যে বাঙালিরা বোধ হয় প্রকৃত বাঙালিয়ানা থেকে অনেকটাই দূরে সরে গেছেন আজকাল। টিভির পর্দায় দেখি প্রতিযোগী বাঙালি কিশোর-কিশোরীরা এবং যুবক-যুবতীরাও হিন্দি সিনেমার গান দক্ষতার সঙ্গে গাইছে এবং তার সঙ্গে পা দুলিয়ে, কোমর দুলিয়ে সিনেমার চিত্রতারকাদের মতো নাচতেও পারছে। তাদের চোখে-মুখে এক অদ্ভুত আশা লক্ষ করি। সকলেই ধরে নেয় একদিন তাঁরা মুম্বই বা দিল্লির চিত্রজগতে ভালো গাইয়ে বা নৃত্যশিল্পী বলে স্বীকৃতি পাবে। একথাও সত্য যে, অনেক বাঙালি শিল্পী মুম্বইয়ের চলচ্চিত্র ও সঙ্গীতজগতে যথেষ্ট খ্যাতিও অর্জন করেছেন। তাই দেখেও বাঙালি কিশোররা অনুপ্রাণিত হন। অশোক কুমার, কিশোর কুমার, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, বাপী লাহিড়ী, মান্না দে, রাখি, শর্মিলা ঠাকুর, এঁরা সবাই তো বাঙালি ছিলেন। আজকের যুগেও দেখুন, শ্রেয়া ঘোষাল, কুমার শানু, রানি মুখার্জীও বাঙালি। তাই স্বাভাবিক ভাবেই বাঙালি তরুণরা অনুপ্রেরণা পেয়ে যান। শতকরা কুড়ি-পঁচিশজনের বেশি প্রতিযোগী বাংলা গান করেন না— কারণ অনেকেই মনে করেন যে, বাংলা গান গাইলে তাঁরা যথার্থ স্বীকৃতি পাবেন না, বাংলা ভাষার পরিধি খুব সীমিত বলে। মাঝে মাঝে দু-চারজন বাংলাদেশী শিল্পী আসেন— তাঁরা বাংলায় গান করেন— বোধ হয় তার কারণ তাঁদের দেশে তো দিল্লি-মুম্বই নেই— তাদের দেশে তো হিন্দিভাষার প্রবল সর্বব্যাপী দাপট নেই।

উনিশ শতকের 'বাবু-বাঙালিয়ানা', কালীঘাট পট

আসলে ১৯৪৭-এ যখন দেশ ভাগ হয়ে গেল, দুই-তৃতীয়াংশ বাঙালি ভারতের বাইরে চলে গেল— বাঙালি জাতির ভরকেন্দ্র যেন চলে গেল ভারতের বাইরে। বাংলা স্বাধীন বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষা— বিশ্বের দরবারে এটাই আজ বাংলাভাষার প্রথম পরিচয়। স্বাধীন ভারতের ৮-৯ শতাংশ মানুষও যে বাঙালি, তা যেন প্রায় মনেই পড়ে না কারও। এর আরেকটি কারণ হল বাংলাদেশীরা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছেন নানা ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ে, তাই দুনিয়ার সর্বত্র চোখে পড়েন বাংলাদেশীরা। তারা চালাচ্ছেন বড় বড় হোটেল, রেস্তোরাঁ, ছোট ছোট কোম্পানি— আর ভারতের বাঙালিদের অস্তিত্ব অতটা প্রকট না। তাঁরা হয়তো আছেন নানান কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়ে, বড় বড় বৈজ্ঞানিক সংস্থায়— বড় বড় বিদেশি কোম্পানির ইঞ্জিনিয়ার বা বড় চাকুরে হয়ে। তাঁরা দুর্গাপূজায় একত্রিত হন, সাহিত্যসভা করেন কিন্তু বাংলাদেশী মিত্রসাহেব বা ভাবীজানদের মতো দোকানপাট, ডিপার্টমেন্টাল স্টোর খোলেন না। বিদেশে গিয়ে যদি হঠাৎ আপনার বাঙালির মাছ, ভাত বা বাংলার তরিতরকারি খাবার ইচ্ছে হয়, যদি মন চায় কচুরি, সিঙাড়া, রসগোল্লা, পান্তুয়া খেতে— আপনাকে অবশ্যই বাংলাদেশী মিত্রসাহেবদের কাছে অথবা ভাবীজানদের দোকানে যেতে হবে।

ভারতের বাঙালিরা আসলে সংখ্যালঘু হওয়ায় খানিকটা দুর্বল হয়ে পড়েছেন। তাদের সাহিত্য সহজে সর্বভারতীয় স্বীকৃতি পায় না, তাদের গান-বাজনা বেশি কেউ বোঝে না বলে তারও স্বীকৃতি কম, আর সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা থাকায় ভারতে হিন্দি ভাষার বাজার রমরমা। বাঙালি কিশোর-কিশোরীরা বেশ বুঝতে পেরে গিয়েছে যে ভালো ইংরিজি এবং হিন্দি বলতে না পারলে ভালো চাকরি পাওয়া দুঃসাধ্য হবে। অনেকে ভালো বাংলা জানা সত্ত্বেও ইচ্ছে করে ভাঙা ভাঙা আধো আধো বাংলা বলেন, যাতে সবাই মনে করে যে এঁরা হলেন আমেরিকার সাহেব, নিদেনপক্ষে দিল্লি-মুম্বইয়ের ঈষৎকৃষ্ণ সাহেব! মোট কথা হল এই যে, ভারতে বাংলাভাষার স্বীকৃতি এক প্রাদেশিক ভাষা হিসেবে মাত্র, যার প্রসার একটি রাজ্যের বাইরে প্রায় নেই বললেই হয়। বাংলাদেশে বাংলাভাষার প্রতিষ্ঠা এবং গৌরব অনেক উঁচু— কিন্তু তাতে আমাদের তো কোনও লাভ হল না ভারতে! কলকাতায় থেকেও যে সব ছাত্র-ছাত্রী স্কুলে লেখাপড়া করছে, তাদেরও অনেককে বলতে শুনি— "Bengali আমাদের third language, first language ইংরিজি নিলাম, আর second language নিলাম হিন্দি!" বাবা-মা'রা সগর্বে ঘোষণা করেন— আমাদের ছেলেমেয়েরা ভালো বাংলা জানে না। বাড়িতে বাবাকে Pop ও মাকে Mom বলে ডাকার রেওয়াজ আজকাল। তারা কোনওদিন শরৎচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র বা মাইকেল মধুসূদনের বই পড়েনি। রবীন্দ্রনাথের নামটাই হয়তো শুধু শুনেছে। অথচ তারা কিন্তু এই পশ্চিমবাংলার বুকেই বড় হচ্ছে— প্রবাসী নয়!

টেলিভিশনে গানের রিয়ালিটি শো-এর একটি দৃশ্য

ম্যাক্সমুলার বলেছিলেন যে, উত্তর ভারতীয় ভাষাগুলি সবই সংস্কৃতের সন্তান, কিন্তু বাংলা সংস্কৃতের সন্তান নয়— বাংলা ভাষাই আসলে আজকের যুগের আধুনিক সংস্কৃত।

বাংলার প্রসার ও ব্যাপকতা হিন্দির তুলনায় ভারতে অনেক সীমিত হলেও এ কথা কিন্তু অনস্বীকার্য যে হিন্দির তুলনায় বাংলা ব্যাকরণ অনেক বেশি সরল। বাংলায় নেই পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের অহেতুক কচকচি। হিন্দি, পাঞ্জাবি, মারাঠি ইত্যাদি পশ্চিম ও উত্তর ভারতীয় ভাষাগুলির জননী শৌরসেনী প্রাকৃতভাষা এবং বাংলা, ওড়িয়া, অহমিয়া ইত্যাদি পূর্ব-ভারতীয় ভাষাগুলির জননী মাগধী প্রাকৃত। শৌরসেনী ও মাগধী এই দুই ভাষাই সংস্কৃতের সন্তান। শৌরসেনী সংস্কৃত ব্যাকরণের সব জটিলতাই বজায় রেখেছে, যদিও মাগধী সেই জটিলতাগুলি বর্জন করে এগিয়ে যেতে পেরেছে। হিন্দির ব্যাকরণ সংস্কৃতের চেয়ে আরও এক ধাপ জটিল। সংস্কৃত ভাষার ক্রিয়াপদ বিশেষ্যের লিঙ্গ দ্বারা প্রভাবিত হয় না। হিন্দিতে কিন্তু ক্রিয়া লিঙ্গ দ্বারা সম্পূর্ণ প্রভাবিত। ব্যাকরণসম্মত সঠিক হিন্দি বলা তাই অ-হিন্দিভাষীদের পক্ষে দুষ্কর। কিন্তু অশুদ্ধ বাজারি হিন্দি বলা সহজ এবং তাই অশুদ্ধ ভাষাটি বহু লোক বুঝতে পারে। কিন্তু অবাঙালিরা কেন বুঝতে পারেন না বাংলা? কারণ, বাংলাভাষায় তৎসম শব্দের অস্বাভাবিক বাহুল্য— যা চলিত হিন্দিতে নেই। হিন্দি ভাষার নিত্যপ্রয়োজনীয় বেশিরভাগ কথাগুলিই ফারসি অথবা উর্দু ভাষা থেকে ধার নেওয়া। আর ভারতের অল্পশিক্ষিত মানুষরা উর্দু কথাগুলো সহজে বুঝতে পারেন। তাই মুম্বইয়ের হিন্দি সিনেমাগুলি মূলত উর্দু ভাষায় তৈরি। কথাবার্তা যদি উর্দুতে না হয়, তো ভারতের বৃহত্তর জনতা তা বুঝতে পারবেন না এবং হিন্দি ছবির কাটতি হবে না। বাংলা ভাষায় তৎসম শব্দের প্রাচুর্য নিয়ে চর্চা করতে গিয়ে বিখ্যাত ভাষাবিদ ম্যাক্সমুলার বলেছিলেন যে, উত্তর ভারতীয় ভাষাগুলি সবই সংস্কৃতের সন্তান, কিন্তু বাংলা সম্বন্ধে বলতে হয় বাংলা সংস্কৃতের সন্তান নয়— বাংলা ভাষাই আসলে আজকের যুগের আধুনিক সংস্কৃত। ভাষাবিদ সুনীতি চট্টোপাধ্যায় বলেছিলেন, বাংলার ৯৩ শতাংশ শব্দ সংস্কৃত তৎসম শব্দ এবং বাকি ৭ শতাংশ হল দেশজ শব্দ ও উর্দু/ফারসি শব্দ। বাংলা ভাষার আরেকটি অসুবিধা এই যে, আমরা যা লিখি তা মুখে উচ্চারণ করি না— উচ্চারণটি হয় আলাদা ভাবে। উদাহরণস্বরূপ, আমরা লিখি 'অসহ্য' (asahya), কিন্তু উচ্চারণ করি অশোঝঝো (ashojhjho)। লিখি 'সভ্য' (sabhya), কিন্তু উচ্চারণ করি শোভ্‌ভো (shobhbho)। এই কারণে অবাঙালির চোখে বাংলা ভাষা দুর্বোধ্য মনে হয়।

এইসব বিভিন্ন কারণে বাংলা ভাষা আজ একটি ক্ষুদ্র ভৌগোলিক গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে আছে। পশ্চিমবাংলা ও ত্রিপুরার বাইরে এর প্রচলন সীমিত এবং এই কারণেই আজ বাঙালি কিশোর-কিশোরী, যুবক-যুবতীদের মধ্যে এক অদ্ভুত হীনম্মন্যতা দেখতে পাই। তাঁরা বাংলায় কথা বলতে বা গান গাইতে ইতস্তত করেন। হিন্দি ভাষাকে উন্নতির সোপান বলে মনে করেন।

বই-ঠক

আলোচিত বই: দ্য ব্রাদার্স কারামাজভ
লেখক: ফিওদর দস্তয়েভস্কি

সমকালীন দর্শনের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ মুগ্ধ করে

আলোচনা করছেন **মৈত্রেয়ী নাগ**

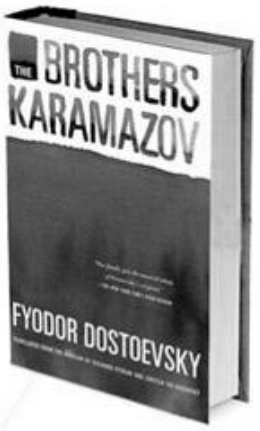

ফিওদর দস্তয়েভস্কির সর্বশেষ উপন্যাস 'দ্য ব্রাদার্স কারামাজভ' দু-বছর ধরে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় দ্য রাশিয়ান মেসেঞ্জার নামক পত্রিকায় এবং শেষ হয় ১৮৮০ সালে। আরও বড় একটি উপন্যাসের প্রথম অংশ হিসেবে লেখা হলেও, এর প্রকাশের অল্পসময় পরেই লেখকের মৃত্যু হয়। চার অধ্যায়ে লেখা এই বিশাল উপন্যাস শুধু সুখপাঠ্যই নয়, এর অন্তর্নিহিত সমকালীন দর্শনের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ফ্রয়েড, হাইডেগার, ম্যাকার্থি, আইনস্টাইনের মতো অনেক মনীষীকেও মুগ্ধ করেছে।

এই উপন্যাসে কাহিনীর মতোই সমান গুরুত্বপূর্ণ এর চরিত্রগুলি। কারামাজভ পরিবারের চারজন পুরুষ— বাবা ও তাঁর তিন

ছেলে— এই গল্পের মুখ্য চরিত্র।

রীতিভাঙা এই কাহিনীর প্রথম চমক পিতৃচরিত্রে বছর পঞ্চান্ন বয়সের অভিজাত অথচ মূর্খ, লোভী, অনাচারী ফিওদর পাভলোভিচ কারামাজভ। দুই বিবাহের ফলে তিন ছেলের জন্মদাতা হয়েও, কারুর প্রতিই কোনওরকম আকর্ষণ অনুভব করেননি এই বাবা। ফলে তিন ছেলে বেড়ে উঠেছে তিন জায়গায় আলাদাভাবে। কানাঘুষোয় জানা যায়, তাঁর খাসভৃত্য পাভেল স্মেরদিয়াকভও আসলে তাঁরই অবৈধ সন্তান।

বড়ছেলে দমিত্রি (মিতিয়া) ফিওদরোভিচ কারামাজভ, তাঁর প্রথমা স্ত্রীর একমাত্র সন্তান। বাপের মতোই ইন্দ্রিয়পরায়ণ বছর আঠাশের মিতিয়ার সময় কাটে মদ-জলসা-হৈ-হল্লা-নারীসঙ্গে। নিজের প্রাপ্য সম্পত্তি থেকে বাবা তাকে বঞ্চিত করছেন, এই সন্দেহে দুজনের মধ্যে প্রায়শই বচসা হয়। আশৈশব উগ্র স্বভাবের হলেও মনের দিক থেকে খাঁটি ভদ্রলোক এই মিতিয়া।

মেজছেলে প্রবল বাস্তববাদী ইভান ফিওদরোভিচ কারামাজভ, ফিওদরের দ্বিতীয়া স্ত্রীর প্রথম সন্তান। চব্বিশ বছর বয়সের গোঁড়া নাস্তিক ইভানের বৈদগ্ধ্য শিক্ষিত মহলের আলোচনার বিষয়। ছোট থেকেই নিঃসঙ্গ, দুঃস্থজনের সহমর্মী, শান্ত স্বভাবের ছেলে হলেও বাবার প্রতি বিরাগ-বিদ্বেষ ইভানের জন্মগত। হয়তো সেই কারণেই বাবার আকস্মিক হত্যার পর নিজেকেই দায়ী করে সে।

এই কাহিনীর আসল নায়ক কিন্তু ইভানের সহোদর সর্বকনিষ্ঠ আলেক্সিস (আলিওশা) ফিওদরোভিচ কারামাজভ। বছর কুড়ির এই সরল, নিষ্পাপ, ধর্মপ্রাণ তরুণটি স্বভাবে এবং কাজেকর্মে তার বাবার সম্পূর্ণ বিপরীত। সকলেই তাকে ভালোবাসে, বাইরের লোক তো বটেই, তার দুই দাদা, এমনকি ওদের বাবাও যেন তার প্রতি বিশেষ সহৃদয়। গল্পের গোড়া থেকেই আলিওশা স্থানীয় মঠের ধর্মীয় শিক্ষানবিশ। বিভিন্ন লোকের সঙ্গে মধ্যস্থতা করার সুবাদে সে এই কাহিনীর একরকম সূত্রধরও বটে।

অন্যান্য মুখ্য চরিত্রের মধ্যে বলতেই হয় পাভেল ফিওদরোভিচ স্মেরদিয়াকভের কথা। রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ানো, নোংরা কাপড় পরা বোবা মেয়ে লিজাভেতার গর্ভজাত এই পাভেল। ফিওদর কারামাজভের খানসামা তথা বাবুর্চি, আবার তাঁর অবৈধ সন্তানও বটে। ছোটবেলা থেকেই চাপা, নিষ্ঠুর প্রকৃতির এবং মৃগীরোগাক্রান্ত। মনে মনে নাস্তিক আর শ্রদ্ধা করে ইভানকে। আশ্রয়দাতাকে খুন করার পরিকল্পনা থেকেই আঁচ করা যায় তার ঘোরালো মনের গতিবিধি।

ফিওদর দস্তয়েভস্কি

একেকটি চরিত্র যেন সমসাময়িক একেকটি মতাদর্শের প্রতীক। এই উপন্যাস লেখার সময় দস্তয়েভস্কির ওপর যে রুশ দার্শনিক নিকোলাই ফিওদরোভিচ ফিওদরোভের চিন্তার প্রভাব ছিল, আজ সে কথা সাধারণভাবে গ্রাহ্য।

এছাড়া, দুই প্রধান নারীচরিত্র গ্রুশেঙ্কা আর কাতরিনা পরস্পরের ঠিক বিপরীত। কাতরিনা গরবিনী, কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনে বিশ্বাসী এবং মিতিয়ার বাগদত্তা, লাস্যময়ী গ্রুশেঙ্কার প্রতি মিতিয়ার আসক্তির কথা জানা সত্ত্বেও। মার্জিত স্বভাবের ইভান তার গুণমুগ্ধ জেনে এবং তার প্রতি নিজে আকৃষ্ট হলেও নিজেকে সংযত রাখার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যায় সে। অপরদিকে, প্রথমে পরিত্যক্তা ও পরে জনৈক বৃদ্ধের রক্ষিতা গ্রুশেঙ্কার নীতিবোধের বালাই নেই। মিতিয়া ও তার বাবার মধ্যে ঈর্ষার উৎস এই রূপবতী গ্রুশেঙ্কাই।

এই কাহিনীর গঠনবিন্যাস মনে করিয়ে দেয় একটি বিস্তীর্ণ নকশিকাঁথার মাঠের কথা। একই সঙ্গে চলতে থাকা ঘটনার ঘনঘটার মধ্যে চরিত্রগুলির স্বতঃস্ফূর্ত কথোপকথনের পাশাপাশি ঠাঁই পেয়েছে তাদের বাচনভঙ্গি, মতাদর্শ, গোপন অভিপ্রায় ও গূঢ় মনস্তত্ত্ব। একেকটি চরিত্র যেন সমসাময়িক একেকটি মতাদর্শের প্রতীক। এই উপন্যাস লেখার সময় দস্তয়েভস্কির ওপর যে রুশ দার্শনিক নিকোলাই ফিওদরোভিচ ফিওদরোভের চিন্তার প্রভাব ছিল, আজ সে কথা সাধারণভাবে গ্রাহ্য। ফিওদরোভ বিশ্বাস করতেন এমন এক খ্রিস্টবাদে, যার ভিত্তি হল এক সর্বজনীন পরিবার, যেখানে পিতার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হতে পারে পুত্রের কর্মের মাধ্যমে। গল্পের আপাত সরল কথন-বুননের মাঝখানে একটি পিতৃহত্যার ঘটনা তাই ভয়ানক চমকপ্রদ। নেতিবাদ, সাম্যবাদ, সমসাময়িক খ্রিস্টবাদের আলো-আঁধারি পটভূমিকায় এইভাবেই ব্যক্ত হয়েছে খুন, রক্ত, চুরি, মোটিভ, তদন্তসমেত আস্ত একটি রহস্যোপন্যাস। দেশের আইনি ব্যবস্থার প্রতি কটাক্ষ কাহিনিতে যোগ করেছে পর্যাপ্ত হাস্যরসও।

ফিওদর পাভলোভিচ কারামাজভের মৃত্যুর পর সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে দোষী সাব্যস্ত করা হয় তাঁর বড়ছেলে মিতিয়াকে, যদিও আসল হত্যাকারী তাঁর অবৈধ সন্তান স্মেরদিয়াকভ। আবার এই স্মেরদিয়াকভ অভিযোগের আঙুল তোলে মেজছেলে ইভানের দিকে— এই মৃত্যুর নৈতিক দায় নাকি তারই, কেননা ঈশ্বরহীন এই পৃথিবীতে যে কোনও কিছুই নিষিদ্ধ নয়, সে কথা স্মেরদিয়াকভকে ইভান ছাড়া আর কে শিখিয়েছে! আশ্চর্যের বিষয় হল, ইভান নিজেও অস্বীকার করতে পারে না এই দায় এবং হারিয়ে ফেলতে থাকে মানসিক ভারসাম্য। আলিওশা বরাবরই বিশ্বাস করে এসেছে যে মিতিয়া নির্দোষ। ইভানের জন্যও বড়ই দুশ্চিন্তায় পড়ে সে। প্রকৃত খুনির স্বীকারোক্তির পর মিতিয়াকে জেল থেকে গোপনে বের করে নিয়ে আসার উদ্যোগ নেয় ইভান ও কাতরিনা।

দার্শনিক তর্কে-বিতর্কে ভরপুর এই উপন্যাসে একটি চরিত্রকেও কিন্তু স্টিরিওটাইপ আখ্যা দেওয়া যায় না। নারী চরিত্রগুলিও অসাধারণ নৈপুণ্যের সঙ্গে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। প্রত্যেকটি চরিত্রের শব্দচয়ন ও বাচনভঙ্গি আলাদা। হয়তো এই সজীবতার জন্যই বিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকেই একাধিকবার চলচ্চিত্রে রূপায়িত হয়েছে এই কাহিনী।

রুশভাষায় লেখা এই অনন্যসাধারণ কথন অনুবাদ করা বেশ কঠিন। ইংরিজিতে কনস্ট্যান্স গারনেটের অনুবাদ সবচেয়ে বেশি পঠিত হলেও, মূল লেখার প্রতি আনুগত্যের প্রশ্নে এগিয়ে রয়েছে জুলিয়াস কাৎজেরের অনুবাদ, যা প্রোগ্রেসিভ পাবলিশার্সের পর মস্কোর রাদুগা প্রকাশনী পুনঃপ্রকাশ করে।

চিনের নোবেল

মো ইয়ান

সুইডিশ অ্যাকাডেমি এ বছর নোবেল সাহিত্য পুরস্কারের জন্য বেছে নিল চিনের কথাসাহিত্যিক মো ইয়ানকে। যদিও তাঁর পিতৃদত্ত আসল নাম গুয়ান মোয়ি। চিনে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময় পিপলস লিবারেশন আর্মিতে যোগ দেওয়া মোয়ি উচ্চপদস্থ সেনাকর্তাদের চোখ এড়িয়ে নির্বিঘ্নে সাহিত্যকর্ম করার অভিপ্রায়ে ছদ্মনাম নিয়েছিলেন। চিনা ভাষায় মো ইয়ান শব্দবন্ধের অর্থ 'কথা কয়ো না'। এমন অদ্ভুত ছদ্মনাম নেওয়ার পিছনে কারণটাও তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন ২০১১-এ বার্কলের ক্যালিফোর্নিয়া ইউনিভার্সিটির আলোচনাসভায়। বলেছিলেন, 'ওই সময় (পঞ্চাশের দশকে) চিনে সাধারণ মানুষ স্বাভাবিক জীবন কাটাতে পারত না, তাই বাবা-মা বলে দিয়েছিলেন বাইরে কথা না বলতে। আমি ওদের কথা মেনে প্রকাশ্যে কথাবার্তা বলা বন্ধ করে দিই।'

এ হেন মো ইয়ান নোবেল পাওয়াতে চিন খুবই উদ্দীপিত। চিন যে নোবেল পুরস্কার পাওয়া থেকে বঞ্চিত হয়েছে এমন নয়। কিন্তু তাদের সমস্যাটা ছিল, পুরস্কারটা কিছুতেই তাদের মনোমতো 'সৎপাত্রে' গিয়ে পড়ছিল না। দু-বছর আগেই চিনের মানবাধিকার কর্মী ও লেখক লিউ জিয়াওবোকে নোবেল শান্তি পুরস্কার দেওয়া নিয়ে অশান্তি চরমে উঠেছিল চিন সরকারের সঙ্গে সুইডিশ অ্যাকাডেমির। সরকারের বিরুদ্ধে গলা চড়িয়ে কারাগারে বন্দি জিয়াওবোকে নোবেল পুরস্কার গ্রহণ করার জন্য নরওয়েতে আসতে দেয়নি চিন সরকার। ওদিকে তাঁর নামে শূন্য চেয়ারে পদক রেখে মনোমালিন্যকে আরও জোরদার করেছিল নোবেল কমিটি। তারও আগে 'সোল মাউন্টেন' উপন্যাসের লেখক গাও ঝিংজিয়ান নোবেল পান। কিন্তু সেবারও সেই প্রাপ্তি খুশি করতে পারেনি চিনের কমিউনিস্ট সরকারকে। কেন না, জীবনের পঞ্চাশ বছর স্বদেশে কাটালেও ঝিংজিয়ান তখন সরকারের সমালোচনার মাশুল গুনে দেশত্যাগী, ১৯৯৭ থেকে ফরাসি নাগরিক। সেসময় চিনা সরকার বিবৃতি দিয়ে বলেছিল, সাহিত্য পুরস্কারকে কীভাবে রাজনৈতিক প্রয়োজনে ব্যবহার করা যায়, তা ফের দেখিয়ে দিল নোবেল কমিটি।

কিন্তু সেই একই সরকার এবার মো ইয়ানের পুরস্কার প্রাপ্তিতে মনোমালিন্য সযত্নে দূরে সরিয়ে রেখে গদগদ স্বরে বলেছে, 'শতাধিক বছরের বেশি সময় ধরে দুনিয়ার সবচেয়ে সম্মানিত সাহিত্য পুরস্কারটি চিনের কেউ পাননি। এবারে সেই ধারাটায় দাঁড়ি পড়ল।'

ঘটনাচক্রে মো ইয়ান নিজে চিনা কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য তো বটেই, সরকার নিয়ন্ত্রিত রাইটার্স অ্যাসোসিয়েশনেরও সভাপতি। দু-বছর আগে জিয়াওবো-র নোবেল শান্তি পুরস্কার প্রাপ্তিতে সরকারের সুরেই ক্ষোভ জানিয়েছিলেন তিনিও। আশির দশকে মো ইয়ানের দুয়েকটি উপন্যাস চিন সরকার নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেও পরবর্তীকালে মো সরকারঘনিষ্ঠ হয়ে পড়েন। বইয়ের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞাও উঠে যায়। তাঁর সম্পর্কে সম্ভবত সেরা পরিচিতিজ্ঞাপক মন্তব্যটি করেছেন 'চায়না ডেলি'র সম্পাদক রেমন্ড ঝাও। তাঁর কথায়, মো বিপ্লবী নন। তিনি প্রতিষ্ঠানকে সঙ্গে নিয়ে চলতে জানেন। তবে লেখালেখিতে স্বাধীন চিন্তার প্রতিফলনও ঘটান।

হয়তো প্রাতিষ্ঠানিক অন্তরঙ্গতার কারণেই তাঁর উপন্যাসকে খুঁজতে হয় অলীকত্বের আড়াল। যাকে সুইডিশ অ্যাকাডেমির স্থায়ী সচিব পিটার ইংলুন্ড বলেছেন 'সমসাময়িক বাস্তবকে আলো-আঁধারি বিভ্রমে উপস্থাপন' করা। এই অলীকত্ব ইয়ানের অধিকাংশ লেখার বৈশিষ্ট্য।

যদিও আরেক নোবেলজয়ী কথাসাহিত্যিক গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজের সূত্রে 'ম্যাজিক রিয়ালিজম' সারা বিশ্বে যতটা পরিচিত মো ইয়ানের এই 'হ্যালিউসিনেটরি রিয়ালিজম'

ততটা নয়। তার কারণ সাংস্কৃতিক বিপ্লবের পরবর্তী অধ্যায়ে এক সরকার-ঘনিষ্ঠ লু শুন ছাড়া আর কারই বা নাম শোনা গেছে! ঘরানার দিক থেকে মো ইয়ানকে বলা হচ্ছে মার্কেজ, ফকনার এবং লু শুনের উত্তরসূরি। লু শুনের লেখার বিপ্লবোত্তর গ্রামীণ জীবনযাত্রা যেমন মো ইয়ানেরও লেখার অন্যতম উপাদান, তেমনই তার সঙ্গেই তিনি মেশান অলীক বাস্তবতা। সেটা করতে গিয়ে কখনও ফিরে যান প্রাচীন চৈনিক লোককথা কিংবা রূপকথায়, কখনও কথা-বলা জন্তু-জানোয়ারদের দিয়ে শান দেওয়া কথায় গড়ে তোলেন ফ্যান্টাসির জগৎ।

তাঁর প্রথম দিককার উপন্যাস 'বিগ ব্রেস্টস অ্যান্ড ওয়াইড হিপ্‌স' সরকারের কোপে পড়ে নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছিল। দেশ রাজতন্ত্রের অধীনে থাকাকালীন এক চৈনিক মেয়ের গর্ভে জন্ম নেওয়া সাতটি সন্তানকে নিয়ে এগিয়েছে এই উপন্যাসের কাহিনী। সাতটি অধ্যায়ে রাজতন্ত্র থেকে আধুনিক চিনের দীর্ঘ রাজনৈতিক পরিক্রমা বিধৃত। নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছিল তাঁর আরও একটি বই, 'গার্লিক ব্যালাডস'। চিনের এক অলীক রাজ্যে কৃষকদের কেবল রসুন চাষ করার নির্দেশ দেয় আমলারা। নিজেদের পকেট ভারী করে পরে তারাই গুদামে আর শস্য রাখা যাবে না বলে কৃষকদের পথে বসায়। এই অলীক রাজ্য ঘুরেফিরে এসেছে মো-র অধুনা সবচেয়ে বিখ্যাত উপন্যাস 'রেড সরগম'-এও। বিখ্যাত, কারণ, এই উপন্যাসের ভিত্তিতে একই নামে একটি চলচ্চিত্র তৈরি করে সম্প্রতি বিস্তর খ্যাতি ও প্রশংসা পেয়েছেন ছবির পরিচালক ঝাং ইমোউ। এই উপন্যাসেও ঘটনাচক্রে হাজির সেই কল্পিত রাজ্য, লিকারল্যান্ড নামে। সেখানে রয়েছে এক মানুষখেকো মন্ত্রীও।

ক্ষীণ হলেও কলকাতার সঙ্গেও একটা সম্পর্ক আছে মো-র। ২০০৯-এ বার্লিন দেওয়ালের পতনের পর কলকাতার এক প্রকাশন সংস্থার হয়ে তাদের 'হোয়াট ইজ কমিউনিজম' সিরিজে 'চেঞ্জ' নামে একটি ছোট উপন্যাস লিখেছিলেন তিনি।

নোবেল পুরস্কার নিয়ে চিনের উদ্‌গ্রীব আকুলতার যথেষ্ট চর্চা হয় আন্তর্জাতিক সাহিত্যের বাজারে। সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ঢেউ সেভাবে রপ্তানি করা গেল না, অথচ অর্থনৈতিক উন্নয়নের বার্তা পৃথিবী ছেয়ে গেল, এই অসম্পূর্ণতার খেদ তাদের অনেকদিনের। সেদেশে এখনও কারাবন্দি নোবেল-প্রাপক জিয়াওবো ১৯৮৬-তে এই নোবেল-আকাঙ্ক্ষা দেখে প্রতিক্রিয়ায় বলেছিলেন, ব্যাপারটা 'ছেলেমানুষি'। পরে এ নিয়ে আস্ত একখানা বই-ই লিখে ফেলেছিলেন জুলিয়া লোভেল।

আপাতত মো-র নোবেলপ্রাপ্তিতে চিনের সে-আশা মিটল। মিটল ঘটনাচক্রে ইতিহাসকে খানিকটা খুঁচিয়ে দিয়েই। ১৯২৩ থেকে ১৯৭৬— এই সময়কালের পটভূমিকায় লেখা মো-র 'রেড সরগম' উপন্যাসের একটা অংশে রয়েছে চিন-জাপান যুদ্ধের সময় কৃষকদের প্রতিরোধের বর্ণনা। নিয়তি এমনই, নোবেল-জয়ের পথে এবার তিনি নিজেই থামিয়ে দিলেন চূড়ান্ত বাছাই আরেক আন্তর্জাতিক খ্যাতি পাওয়া জাপানি কথাকারের জয়রথ— তিনি হারুকি মুরাকামি।

কৌশিক বন্দ্যোপাধ্যায়

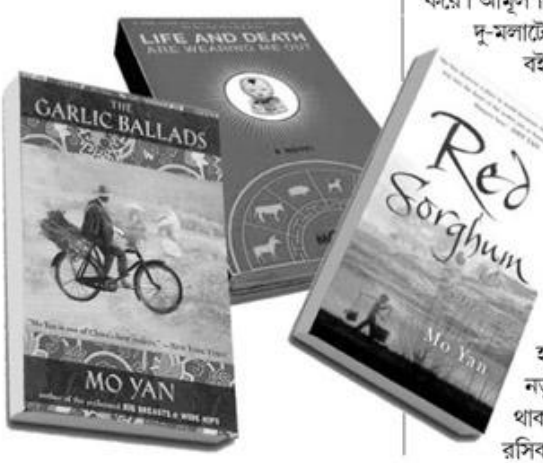

বিজ্ঞাপনে কাল-পরিক্রমা

মুখ ঢেকে দেওয়া বিজ্ঞাপনেও থাকে ইতিহাস। আমূল সংস্থাটি দুধ ও দুগ্ধজাত সামগ্রী তৈরির জন্য সুখ্যাত। আবার, গত প্রায় আধ শতক ধরে ভারতের বিভিন্ন শহরের হোর্ডিংয়ে এই সংস্থারই বিজ্ঞাপন সমকালের সমস্ত উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলির ধারাবিবরণী দিয়ে গেছে কার্টুনের মাধ্যমে। আজও তা পানিং আর সূক্ষ্ম রসবোধের মিলিত ব্যবহারে মুগ্ধ করে। আমূল বিজ্ঞাপনের এই দীর্ঘ যাত্রাপথকে দু-মলাটে ধরে রাখলেন খোদ সংস্থাটিই। বইটির নাম, 'আমূল'স ইন্ডিয়া: বেসড অন ফিফটি ইয়ার্স অফ আমূল অ্যাডভার্টাইজিং'।

১৯৬৬-তে কার্টুনিস্ট এয়ুস্টেস ফার্নান্ডেজ আমূলের বিজ্ঞাপনের এই ধারাটি শুরু করেন। তারপর থেকে গোটা ভারতের প্রায় ৬ হাজার হোর্ডিংয়ে প্রতি সপ্তাহান্তে নতুন বার্তাটির জন্য অপেক্ষা করে থাকতেন এবং আজও থাকেন রসিক দর্শক।

হিলারি ম্যানটেল

ব্রিং আপ দ্য 'বুকার'

পৃথিবীর যে-কোনও ইংরিজি ভাষার লেখকই তাঁর সদ্য প্রকাশিত বইটির কপালে যাতে ম্যান বুকারের শিরোপা জোটে তার জন্য হা-পিত্যেশ করে অপেক্ষা করেন। আর হেনরি ম্যান্টেল সেই পুরস্কারই জিতে নিলেন দু-দুবার। এ বছর ম্যান বুকার পুরস্কারের জন্য মনোনীত হয়েছে তাঁর উপন্যাস 'ব্রিং আপ দ্য বডিজ'। যে মূল উপন্যাসের এটি সিক্যুয়েল, সেই 'উলফ্‌ হল'-এর জন্য তিনি বুকার পেয়েছিলেন ২০০৯-এ। এর আগে মাত্র তিনজন লেখক দ্বিতীয়বারের জন্য এই পুরস্কার পেয়েছিলেন। তবে তাঁরা কেউই উপন্যাসের দ্বিতীয় পর্ব লেখার জন্য তা পাননি।

জে কে রাওলিং

বড়দের জন্য রাওলিং

হ্যারি পটার চরিত্রের স্রষ্টা জে কে রাওলিং প্রথমবার কলম ধরলেন বড়দের জন্য। উপন্যাসের নাম 'দ্য ক্যাজুয়াল ভ্যাকেন্সি'। প্রকাশমাত্রই বেস্টসেলার তালিকায় অবধারিত ভাবে স্থান পেয়ে যাওয়া বইটির প্রাক-প্রকাশ বুকিং-ই হয়েছে ৬ মিলিয়ন কপি। তবে উপন্যাসটি নিয়ে পাঠকমহলে দেখা দিয়েছে মিশ্র প্রতিক্রিয়া। দ্য গার্ডিয়ান পত্রিকা লিখেছে, উপন্যাসটি মাস্টারপিস না হলেও খারাপ নয়। বুদ্ধিদীপ্ত, আবার কখনও কখনও বেশ মজাদার। যদিও দ্য নিউইয়র্কার বলেছে, উপন্যাসটির মূল সমস্যা হল, ঘটনাপরম্পরাকে খুব সহজেই অনুমান করে নিতে পারেন পাঠক।

ধারাবাহিক ভ্রমণকথা : ৬

আসমুদ্রককেশাস

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

জর্জিয়ার প্রাচীন জনপদ

সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যাবার এক দশক পর কৃষ্ণসাগরের কূলে, ককেশাস পাহাড়ের কোলে প্রাচীন এক দেশের নবীন সুখ-দুঃখের সন্ধানে ধারাবাহিক ভ্রমণকথা। এই সংখ্যায় শেষ।

ডাইনোসরের পায়ের ছাপ

পশ্চিম জর্জিয়ায় ইমেরেথি রিজিয়নের রাজধানী কুতাইসি থেকে চলেছি কৃষ্ণসাগরের তীরে, গ্রিগোলেথিতে। পথে সাতাপ্লিয়ার জঙ্গলে জীবনে প্রথম ডাইনোসরের পায়ের ছাপ দেখলাম। যতই দেখি, বিস্ময় যেন আর শেষ হয় না। পৃথিবী থেকে সম্পূর্ণ অবলুপ্ত বিরাটাকার এই প্রাণী কত লক্ষ বছর আগে ঠিক এইখানে, এই জঙ্গলে ঘুরে বেড়াত, জঙ্গলও তখন কী বিশাল আর কী গভীর ছিল ভেবে কূল-কিনারা পাই না। কেমন ছিল সেই প্রাগৈতিহাসিক পৃথিবী?

জঙ্গলের আরও ভেতরে লক্ষ কোটি বছরের প্রাচীন গুহা। অন্ধ্রপ্রদেশের বোরাগুহার মতো, তবে— তার চেয়ে অনেক বড়। টিমটিমে বৈদ্যুতিক আলোয়, বিরাট বিরাট অদ্ভুত সব প্রাকৃতিক ভাস্কর্য, অনেক জায়গায় রীতিমতো জলের ধারার ওপর দাঁড়িয়ে দেখতে হয়।

ঘণ্টাখানেক পর গুহা থেকে উঠে এসে দেখি সামনেই একটা পুলিশের গাড়ি, গাড়ির গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন দুজন পুলিশ অফিসার। যেন আমাদেরই অপেক্ষায়। ভঙ্গি দেখে মনে হল গ্রেপ্তার করবে না কি?

আজ সাপ্তাহিক বন্ধের দিন গুহায় ঢোকা

কৃষ্ণসাগরের কাছে সামুদ্রিক মাছের গ্রামীণ বাজার। ছবি: লেখক।

নিষেধ। প্রহরীর কাছে বাধা পেয়ে আমরা ফিরেই যাচ্ছিলাম, পথে দেখা হয়ে গেল গুহা রক্ষণাবেক্ষণ অফিসেরই উচ্চপদস্থ কর্মচারীর সঙ্গে। তাঁরই হস্তক্ষেপে নিয়ম ভেঙে আমাদের গুহা দর্শনের অনুমতি দেওয়া হল, বিদ্যুৎ সংকট সত্ত্বেও গুহার আলোও জ্বালানো হল, সবই সাহিত্যিকের প্রতি জর্জিয়ানদের শ্রদ্ধা-ভালোবাসার প্রকাশ, অত বড় লেখক নোদার দুমবাদজের মেয়ে স্বয়ং এসেছেন, সঙ্গে আবার ভারতীয় অতিথি, গুহা না দেখেই তাঁরা ফিরে যাবেন?

এপর্যন্ত ভালোই ছিল, কিন্তু নিষিদ্ধ গুহাপ্রবেশ হয়তো পুলিশের মনঃপূত নয়, যে-কোনও ভাবেই হোক তাঁরা খবর পেয়ে এখানে চলে এসেছেন! যেখানে এখনও প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীদের পায়ের ছাপ ছুঁয়ে দেখা যায়, আদিম কালের গুহায় কোটি কোটি বছরের প্রাচীন প্রাকৃতিক ভাস্কর্য চাক্ষুষ করে এলাম, মনে এখনও তার রেশ কাটেনি, সেখানে হঠাৎ পুলিশের আবির্ভাব! মানানাও মনে হয় একটু দমে গেছে।

পুলিশ অফিসার দুজন দ্রুত এগিয়ে এসে আমাকে সহাস্য স্বাগত জানালেন। আমাকে তাঁরা টিভিতে দেখেছেন, কে একজন জর্জিয়ান সাংবাদিক আমাকে তাঁদের দেশ দেখিয়ে বেড়াচ্ছেন, মানানাই কি সেই জর্জিয়ান সাংবাদিক?

মানানা পুলিশের কথাগুলো ইংরিজি করতে করতেই হেসে বলল, 'তোমাকে দেখেই চিনেছে, আমিও তোমার সব টিভি প্রোগ্রামেই ছিলাম, আমাকে চিনতে পারল না।'

'তার কারণ একটাই। রোজই টিভিতে অসংখ্য জর্জিয়ান মহিলাকে দেখা যায়, আর ভারতীয় বলতে শুধুই আমি। মনে তো থাকবেই।'

যাইহোক, পুলিশের আগমনের কারণ জেনে আমি তো হতভম্ব, এপথ দিয়ে যাচ্ছিলেন, আমি এখানে এসেছি শুনেই চলে এসেছেন আমাকে দেখতে!

কৃষ্ণসাগরের তীরে

সাতাপ্লিয়া থেকে দুপুরে বেরিয়ে সন্ধেবেলা জনমানবহীন একটা রাস্তায় ড্রাইভার জানাল, গ্রিগোলেথির রাস্তা সে হারিয়ে ফেলেছে।

এরপর কয়েক ঘণ্টা শুধু ভয়ে ভাবনায়

দিশেহারা অবস্থা। একবার একটা রাস্তায় পঞ্চাশ-একশো কিলোমিটার এগিয়ে রাস্তা না পেয়ে আবার ফিরে এসে অন্য রাস্তা ধরা, সেখানেও চেনা রাস্তার সন্ধান মেলে না, আবার অন্য রাস্তা। কাছাকাছি মানুষের ঘরবাড়িও নেই। তা সত্ত্বেও মাঝেমাঝেই ড্রাইভার গাড়ির হর্ন বাজিয়ে, মুখের সামনে দুহাতের তালু দিয়ে ঘিরে গলার জোরে সাহায্যের জন্য চিৎকার করে যাচ্ছে। আমি রীতিমতো ভয় পেয়ে গেলাম। এসব জায়গায় আজকাল নাকি দেশের প্রবল অর্থসংকটের ফলে খুব ডাকাতিও হচ্ছে। মানানা বোধহয় উদ্বেগ আর সহ্য করতে পারছিল না, তার মোবাইল এখানে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় দেখেও মাঝে মাঝেই সে নানারকম নম্বর ডায়াল করে যাচ্ছে।

শেষ পর্যন্ত মধ্যরাতে কৃষ্ণসাগরের তীরে পৌঁছে খুবই হতাশ হলাম। সাগরসৈকত ও তার ধারের রিসর্ট এলাকা অন্ধকারে ডুবে আছে। এখন অফ-সিজন, তার ওপর এনার্জি ক্রাইসিস, জেনারেটর একেবারেই চালানো হয় না। মানানা আর ড্রাইভার অনেক চেষ্টায় রিসর্টের অফিসের দুজন মহিলা কর্মচারীকে জাগিয়ে আধঘণ্টার জন্য জেনারেটর চালাবার ব্যবস্থা করল। গাছপালার মধ্যে তাঁবুর আকারে একটু দূরে দূরে পর পর বেশ কয়েকটা কাঠের ঘর। তারই একটা ঘর খুলে ড্রাইভার আমার স্যুটকেসটা ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়ে চলে গেল। মানানা আরেকটা ঘরে বাক্স রেখে এসে আমাকে পথকষ্টের জন্য সহানুভূতি ও রাতের জন্য ঘরে শুয়েই কৃষ্ণসাগরের সংগীত শোনার নিশ্চয়তা জানিয়ে বাইরের অন্ধকারে হারিয়ে গেল।

শোবার জন্য তৈরি হতে হতেই জেনারেটরের মেয়াদ শেষ। অন্ধকারে কাঠের দেওয়াল থেকে মাথা বাঁচাতে শুধু হাত দিয়ে দিয়ে দেওয়ালের ত্রিভুজ সামলে কোনক্রমে শয্যাগ্রহণ করা গেল।

পরদিন ঘুম থেকে উঠে বাইরে এসে কোথাও কারও সাড়া শব্দ না পেয়ে হাঁটতে হাঁটতে কৃষ্ণসাগরের বালুকাবেলায় গিয়ে দাঁড়াই। হাওয়ায় গায়ের শার্ট, কাঁধের ক্যামেরা উড়িয়ে নিয়ে যাবে মনে হল।

প্রায় টলতে টলতে এগিয়ে গেলাম সুপসা নদীর মোহনা দেখতে। এখানে আসবার পথেই গুরিয়ায় পাহাড়-জঙ্গলের মধ্যে সুপসা নদীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল, বেশ অনেকটা সময়, তখনই শুনে এসেছি সুপসা গ্রিগোলেথিতে গিয়ে কৃষ্ণসাগরে পড়েছে।

দেখে মন খারাপ হয়ে গেল। এই সেই আমাদের বাল্যের ভূগোলবই-বিখ্যাত কৃষ্ণসাগর, এই নাকি একটা নদীর মোহনা!

এখানেই দেখা হল মানানা আর তার ড্রাইভারের সঙ্গে। শুনলাম, আমি দেরি করে এসেছি বলে সমুদ্রের ভোরের সৌন্দর্য দেখা হল না। যদিও কৃষ্ণসাগরের সেরা সৈকতও নাকি এটা নয়। তবে আমরা এত কষ্ট করে এখানে এলাম কেন? মানানার অকপট উত্তর— এখানে আমার একটা নিজস্ব রিসর্ট আছে, সারি সারি কাঠের তাঁবুর মতো যেগুলো দেখলে, তারই একটা। চলো তোমাকে দেখাব।

মানানা কাল রাতে সেখানেই ছিল। দরজা খুলে আমাকে ভেতরে নিয়ে গেল। দেড়তলা কাঠের কুঁড়ে। মানানা বলল, এটা আমার নিজের কেনা না। বছর দুয়েক আগে বাবার ৭০তম জন্মবার্ষিকীতে বাবার লেখার একজন ভক্ত, তিনিই এইসব কটেজের মালিক, আমাকে এইটা দান করেছেন। এমনিতে আমরা সাধারণ মধ্যবিত্ত, সমুদ্রসৈকতে ছুটি কাটানোর সামর্থ কই?

গুরিয়ার আরাচা পাহাড়ের জঙ্গল আর নদী ছাড়াও সেখানকার সরল সুন্দর সাধারণ মানুষজন আমার মনকে বড্ড স্পর্শ করেছিল। ওই পাহাড়িয়া গ্রামের ছোটদের মুখগুলো তো আমার মনে আঁকা হয়ে আছে। আহারে, আর কখনও ওদের সঙ্গে আমার দেখা হবে না! সেখানে জঙ্গলের মধ্যে, দূর সমুদ্রের একলা দ্বীপের মতো একটা প্রাচীন গির্জারও যেন হৃদয় আছে। নির্জন জঙ্গলে এ যেন কাঠ-পাথরের তৈরি একটা ছোট্ট কুঁড়েঘর।

গুরিয়ায় বহু প্রাচীন ও বিখ্যাত একটি স্কুলের এক ইংরিজি জানা অল্পবয়সী শিক্ষক আমাকে গুরিয়ার কথা শোনাছিলেন, তার সঙ্গে ছিলেন ওই স্কুলের ইতিহাসের শিক্ষক, গুড়িয়ার ইতিহাস তাঁর নখদর্পণে, কিন্তু ইংরিজিটা ভালো জানেন না বলে ইংরিজি জানা সহশিক্ষকের মাধ্যমে আমাকে গুরিয়ার পাঠ দিচ্ছিলেন। প্রাচীন গির্জাটি নাকি ষষ্ঠ শতাব্দীর। এটি গুরিয়ার বিখ্যাত সেমকস্মোদি চার্চ।

গুরিয়ার তোরণে বাবার কবিতার উদ্ধৃতি দেখে মানানা আমাকে তার ইংরিজি শোনাল, বাংলা করলে এইরকম হবে— "আমার ছোট্ট গুরিয়া দেবতাদের জন্মভূমি।"

আরেকটা তোরণে আনা কালান্দাজের কবিতা থেকে উদ্ধৃতি খোদাই করা। আমাদের বাংলার গ্রামে শহরে এরকম করা যায় না?

জর্জিয়ার দুই তরুণী। ছবি: লেখক

কৃষ্ণসাগরের উড়ন্ত চুমু

বিদায় নেবার দিন যত ঘনিয়ে আসছে, মনের মধ্যে ততই যেন ব্যথার বোধ। কৃষ্ণসাগরের শ্রেষ্ঠ সৈকতভূমি বাতুমি দেখা হল না, তা নিয়ে আর আপসোস নেই। ককেশাস পর্বতমালার শ্বাসরোধী সৌন্দর্যের বাসভূমি গুদায়ুরিতে যাওয়া হল না, তা নিয়েও কোনও দুঃখ নেই, দুঃখ শুধু, ছেড়ে যাবার দিন আসন্ন।

কৃষ্ণসাগর থেকে সেদিন সকালেই ফেরার পথে অদ্ভুত একখানা ব্রেকফাস্ট হল। রাস্তার ধারে পাহাড়ের নিচে দাঁড়িয়ে সাগরের মাছ ধরে এনে বিক্রি করছে মেয়েরা, আমাদের দেখেই হই হই করে এগিয়ে এল, সবাই মানানাকে চেনে। সঙ্গের এই পরদেশী অতিথিটি ভারতীয় জেনে এবার তাদের আনন্দ আর ধরে না। একটি মেয়ে বার কতক চেষ্টা করে আমার নামের উচ্চারণও রপ্ত করে ফেলল। ঠিক হল এখান থেকে মাছ কিনে রাস্তার

কৃষ্ণসাগরের কাছে সামুদ্রিক মাছের সঙ্গে পাখির মাংসও বিক্রি হচ্ছে। ছবি: লেখক

দোকান চালায় দুই প্রৌঢ়া, প্লেটে সালাদ, চিজ, সস, বেতের টুকরিতে জর্জিয়ার রুটি, পাউরুটি সাজিয়ে টেবিলে রেখে গেল। তারপর একে একে এল আস্ত আস্ত ট্রাউট মাছ ভাজা, পমফ্রেট ভাজা...

উল্টোদিকের ছোট্ট খাওয়ার দোকান থেকে সেই মাছ ভাজিয়ে সেখানে বসেই সকালের জলখাবার সারা হবে। কয়েকটা মাছ মানানা বাছল, ওরাও কয়েকটা বেছে দিল। ছোট ছোট ট্রাউট, এক ধরনের পমফ্রেট বা ওই জাতীয় মাছ, আরও দুয়েকটা কী যেন। সেগুলো কেটে ধুয়ে পরিষ্কার করে ওরাই দোকানে পৌঁছে দিল।

দোকান চালায় দুই প্রৌঢ়া, ভারি যত্ন করে প্লেটে সালাদ, চিজ, সস, বেতের টুকরিতে জর্জিয়ার রুটি, পাউরুটি সাজিয়ে টেবিলে রেখে গেল। তারপর একে একে এল আস্ত আস্ত ট্রাউট মাছ ভাজা, পমফ্রেট ভাজা, আরও দুয়েকটা কুচো মাছ। তিনজনের পক্ষে খুবই বেশি। যাইহোক, কফি দিয়ে প্রাতরাশ শেষ হল।

মানানা বাড়ির জন্যও আরও কিছু মাছ কিনে গাড়িতে উঠতে যাচ্ছে, তার পিছনে আমি, পিছন থেকে হঠাৎ একটা মেয়ে আমার নাম ধরে ডেকে উঠল, ঘাড় ফিরিয়ে দেখি, তার এক হাতে একটা মাছ, আরেক হাতে আমার উদ্দেশে তার চুমু উড়িয়ে দিল, মুখের হাসির মধ্যে মনের প্রীতি ছড়ানো।

এপথেই এযাত্রায় খুব ভালো একজন বন্ধু পেয়েছিলাম, ভদ্রলোকের কার্ড হারিয়ে ফেলেছি, নামও লিখে রাখা হয়নি ভেবে এখন খারাপ লাগে।

বোধহয় আধঘণ্টা পর পর মানানাকে ফোন করে জানতে চাইছেন আমরা এখন ঠিক কোন পর্যন্ত এসেছি, সেইমতো হিসাব করে ভদ্রলোক ঠিক সময়ে হাসুরিতে চার রাস্তার মোড়ে পৌঁছে আমাদের জন্য অপেক্ষা করবেন যাতে সেখান থেকে ৎরোমি-তে সপ্তম শতাব্দীর একটা বিখ্যাত গির্জায় যেতে আমাদের রাস্তা খোঁজাখুঁজি করতে না হয়। ভদ্রলোক হাসুরির একটি সংবাদপত্রের প্রধান সম্পাদক, আজ মধ্যাহ্নভোজে আমরা তাঁর অতিথি।

চার রাস্তার মোড়ে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিল মানানা। ভদ্রলোক আমাকে তাঁর গাড়িতে তুলে নিয়ে সেই প্রাচীন গির্জা, একদা সমৃদ্ধ ৎরোমি ও হাসুরির নানা কথা শোনাতে শোনাতে গাড়ি চালাচ্ছেন। পিছনে মানানার গাড়ি।

গির্জায় পৌঁছে দেখা গেল গির্জা বন্ধ। অনেকটা এলাকা নিয়ে বেশ বড় গির্জা। বন্ধ দরজার সামনে একটা পাগলী গান গাইছিল, আমাদের দেখে এগিয়ে এসে হাসিতে ভেঙে পড়ল। কিছুতেই তার হাসি আর থামে না। তার মধ্যেই সে কোনওক্রমে যা জানাল, সম্পাদকমশাইয়ের ইংরিজি অনুবাদে তার সারসংক্ষেপ এই যে, আজ অন্য কী একটা গ্রামের গির্জায় নেমন্তন্ন, সেখানে বাদ্যিবাজনা পান-ভোজনের ঢালাও আয়োজন, এখানকার সবাই তাই এই গির্জা বন্ধ করে সেখানে গেছে।

গাড়ি ঘুরিয়ে শহরের একটা চমৎকার রেস্তোরাঁয় এলাম। ভেতরে ঢুকে আরও দুজনের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেওয়া হল। এঁরাও এই পত্রিকার সাংবাদিক। দলের মধ্যে মহিলা বলতে একা মানানা। মোট ছজনের জন্য বিরাট টেবিল সাজানো হয়েছে। ড্রাইভার সহ আমরা তিনজন, প্রধান সম্পাদক সদলে তিনজন।

নানারকম ভোজ্য-পানীয় আসতে লাগল। দেখলাম কাউকে কিছু আদেশ করতে হচ্ছে না, একের পর এক সব আপনা থেকেই টেবিলে পরিবেশন করে যাচ্ছে। তার মানে আগে থেকে সব ঠিক করা আছে।

গলায় গিটার ঝুলিয়ে একজন এসে গানও শোনাতে লাগল। একটু পরে প্রধান সম্পাদক গিটারটি চেয়ে নিয়ে নিজেই একটা গান

ধরলেন, ভদ্রলোক অতি সুদর্শন, প্রথম আলাপেই তাঁর হৃদয়ের উষ্ণতা বোঝা যায়, কী খাচ্ছি, কী খাচ্ছি না সে বিষয়ে তাঁর সযত্ন নজর দেখেও আমি তো অবাক। তার ওপর তাঁর ভরাট সুরেলা গলার গান শুনে ভারি আনন্দ হল— ভ্রমণপথে এমন বন্ধুও তবে মেলে! এমন আকস্মিক!

এরপর তাঁর সঙ্গে নানা বিষয়ে আলোচনায় গাল-গল্পে একেবারে জমে গেলাম। মধ্যাহ্নভোজন গড়িয়ে গেল নৈশভোজের দিকে। অথবা এটাও হয়তো আদপে নৈশভোজনেরই নিমন্ত্রণ! জর্জিয়ায় এর আগেও যেমন হয়েছে।

বন্ধু হঠাৎ বললেন, মানানা, অমরেন্দ্রর সঙ্গে আগে কেন আমার আলাপ করাওনি? আজ তোমরা যেতে পারবে না।

মানানা তাঁর অনেক দিনের বন্ধু।

এরপর মাতৃভাষায় মোবাইল ফোনে কার সঙ্গে প্রায় দু-তিন মিনিট কথা বলে আমাকে বললেন, আমার স্ত্রী তোমার জন্য আমাদের সবচেয়ে সুন্দর ঘরটা সাজিয়ে রাখছেন—।

আজ রাতেই ৎবিলিসি পৌঁছতে হবে, কাল বিকেলে জর্জিয়া থেকে বিদায় একথা আমি ও মানানা প্রায় একসঙ্গে জানাতে আমার বন্ধুর চটজলদি মীমাংসা— কাল আমি নিজে তোমাদের সোজা এয়ারপোর্টে পৌঁছে দেব। ৎবিলিসি এখান থেকে দেড়শো কিলোমিটারের বেশি নয়।

আমার বইপত্র? জামাকাপড়?

মানানাদের বাড়ি হয়ে যাব, পনেরো মিনিটে সব গুছিয়ে নেবে। আজ রাতে, চলো, আমরা জর্জিয়ার ভবিষ্যৎ নিয়ে আমাদের স্বপ্নের কথা বলব। ইংরিজিতেও তিনি জর্জিয়ার বদলে 'শাখার্ৎবেলো' বললেন।

রাস্তার ধারে গায়ক-ভিক্ষু। ছবি: লেখক

এর কী উত্তর? আমি তাঁর একটা হাত মুঠোয় নিয়ে বলি, এত কষ্ট, এত দারিদ্রের মধ্যে কতদিন তোমাদের স্বপ্ন বেঁচে থাকবে জানি না!

দারিদ্রের আলোচনা আজ করব না। এ দেশের দারিদ্রের চেয়েও বড় শত্রু কী জানো? আমাদের দুর্নীতি! প্রশাসনের সর্বত্র লাগামছাড়া দুর্নীতি। চলো, আজ আমরা ডেভিডের কথা বলব, কুইন ঠামারের গান গাইব, সোতা রুসতাভেলির কবিতা পড়ব। আজ তোমাকে ছাড়ছি না।

কুইন ঠামারকে জর্জিয়ার মানুষ বলে কিং ঠামার। দ্বাদশ শতাব্দীর রানি ঠামারের শাসনে জর্জিয়া হয়ে উঠেছিল এক অতি সমৃদ্ধ দেশ। জর্জিয়ার মহাকবি সোতা রুসতাভেলিও ছিলেন এই সময়কার। মহাকবির সঙ্গে মহারানির গভীর বন্ধুত্ব, বা কেউ কেউ যেমন বললেন— ভালোবাসা, সেও এক গৌরবজনক ইতিহাস।

ৎবিলিসি পৌঁছলাম মধ্যরাতে।

ভাজিক জেগে ছিল, দরজা খুলে দিয়েই বলল, শুতে যাবার আগে তোমার এয়ার টিকিটটা আমাকে দিয়ে যেও, কাল সকালেই আমি তারিখ বদলিয়ে আনব। নভেম্বরের তিন বা চার তারিখে গেলে চলবে না?

কী ব্যাপার? না দুদিন পরই ৎবিলিসি উৎসব— তিবিলিসোবা। তাছাড়া জর্জিয়ায় এসে গুদায়ুরি আর বাতুমি না দেখে ফিরে যাওয়া— সে শুধু মানানাই ভাবতে পারে!

মানানা তার বিড়ালের সঙ্গে কথা বলায় ব্যস্ত, ভাজিকের খোঁচা বোধহয় শুনতে পায়নি, একবার মুখ তুলে শুধু বলল, কাল তোমার জন্য 'উখা' করব। উখা কী জানো? বিখ্যাত রাশিয়ান স্যুপ। এটা আসলে জেলেদের স্যুপ (ফিশারমেন'স স্যুপ)। ব্ল্যাক সির মাছ তো সেইজন্যই এনেছি।

গোছগাছ শেষ করে শুতে গিয়ে আর ঘুম আসে না। সকালে অনভ্যস্ত, অভিজাত নারীকণ্ঠে ফেরিওলার ডাক শুনে জেগে উঠে বুঝি একসময় নিশ্চয়ই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

জর্জিয়ায় আমার প্রথম রাতের ঘুমও ভেঙে ছিল এই ক্লান্ত বিষণ্ণ ক্লিষ্ট নারীকণ্ঠের জিনিস ফিরি করার ডাকে।

এ যেন এক করুণ বাঁশির সুর। সমস্ত জর্জিয়ার কষ্ট ও অভিমান এর মধ্যে জড়িয়ে আছে। এদের শিল্পসাহিত্য, গর্ব-গৌরব, সাধ আহ্লাদ, ঐতিহ্য অঙ্গীকার নিয়ে এরা আবার কবে রানি ঠামারের আমলের সুখ-সমৃদ্ধির শিখরে পৌঁছবে জানি না। বিদায় বেলায় ভেবে পাই না, এই ছোট্ট দেশটা আমার সমস্ত হৃদয়ের শিরা-উপশিরা ধরে এমন টান দিচ্ছে কেন। (শেষ)

দানিয়েল পেনাক-এর কিশোর উপন্যাস

নেকড়ের চোখ

মূল ফরাসি থেকে অনুবাদ **মৈত্রেয়ী নাগ**

মানুষের চোখ

৫

তোয়া চলে যাবার পর, আফ্রিকা ঘণ্টার পর ঘণ্টা খুঁজেছিল বাসনকোসনকে। খুঁজে পায়নি।

— কিন্তু ও তো শহর ছেড়ে যেতে পারে না, আমাকে ছাড়া তো ও এক পাও নড়বে না! ও যে কথা দিয়েছে আমায়!

ও পথচারীদের জিজ্ঞেস করে। তারা জবাব দেয়:

— খোকা, এখানে তো রোজ দু'হাজার উট বিক্রি হয়!

সমবয়সী বাচ্চাদের জিজ্ঞেস করে:

— তোমরা কোনও উট দেখনি, যে স্বপ্ন দেখে?

বাচ্চারা হাসে:

— সব উটই তো স্বপ্ন দেখে!

উটদেরকেও জিজ্ঞেস করে:

— বালিয়াড়ির মতো উঁচু একটা উট!

উটেরা অনেক ওপর থেকে ওর দিকে চেয়ে দেখে:

— আমাদের মধ্যে কোনও খাটো উট পাবে না, শুধুই সুদর্শন উট ...

আর বলাই বাহুল্য, উট যারা কিনছে তারাও বাদ যায় না:

— বেলে রঙের একটা সুন্দর উট, তোয়া ব্যাপারি বেচেছে ...

— কতয়? জানতে চায় খদ্দেররা। আর কোনও বিষয়ে তাদের আগ্রহ নেই।

যতক্ষণ পর্যন্ত না ছাগলদের রাজা ক্ষেপে গেল:

— আচ্ছা আফ্রিকা, তুই কি এখানে উট খুঁজতে এসেছিস, না আমার ছাগলদের দেখাশোনা করতে?

এই ছাগলদের রাজার কাছেই তোয়া বেচে দিয়েছে আফ্রিকাকে। ছাগলদের রাজা লোক খারাপ না। সে কেবল তার ভেড়া-ছাগলদের জগতের আর সব কিছুর চেয়ে বেশি ভালোবাসত। তার ওপর তার চুল ছিল সাদা ভেড়ার লোমের মতো কোঁকড়া, ছাগলের দুধের তৈরি চিজ আর ভেড়ার দুধ ছাড়া সে কিছু খেত না আর কথা বলত ছাগলপানা কাঁপা কাঁপা গলায়, যা তার লম্বা, রেশমি ছাগল-দাড়িটাকেও কাঁপিয়ে দিত। সে বাড়িতে থাকত না, থাকত তাঁবুতে, নিজে যখন ছাগল চরাত সেই সময়ের স্মৃতি আঁকড়ে, আর নিজের কালো কোঁকড়া উলের তৈরি বিশাল বিছানা ছেড়ে কক্ষনো নড়ত না।

— হ্যাঁ, বড্ড বুড়ো হয়ে গেছি, নইলে আমার রাখালছেলের দরকার পড়ত না।

কোন ভেড়ার একটু অসুখ করেছে, কি একটু পা ভেঙেছে বা একটা ছাগল হারিয়েছে, ব্যস, অমনি সে রাখালকে বিদেয় করে দিত।

— ঠিকঠাক বুঝেছিস তো আফ্রিকা?

ছেলেটা ঘাড় কাত করে, বুঝেছে।

— বেশ, তবে ব'স আর শোন।

ছাগলদের রাজা ছেলেটার দিকে চিজের একটা বড় টুকরো আর এক ঘটি গরম তাজা দুধ এগিয়ে দিয়ে ওকে রাখালের কাজ শিখিয়ে দেয়।

আফ্রিকা পুরো দু'বছর ছাগলদের রাজার কাজ করেছে। ধূসর আফ্রিকার লোকেদের তো বিশ্বাসই হচ্ছিল না।

— সাধারণত, বুড়ো তো দিন পনেরোর বেশি কোনও রাখালছেলে রাখে না। তুই কি কোনও জাদু জানিস?

আফ্রিকা কোনও জাদু জানত না। রাখাল হিসেবে ভালো ছিল, এই পর্যন্ত। ও একটা খুব সহজ জিনিস বুঝে গেছিল: ভেড়া-ছাগলদের কোনও শত্রু নেই। মাঝেসাঝে যদি সিংহ বা চিতায় একটা ছাগল খেয়ে ফেলে, তার কারণ তার খিদে পেয়েছে। এই কথাটা আফ্রিকা ছাগলদের রাজাকে বুঝিয়ে বলেছিল।

— রাজা, সিংহরা তোমার ভেড়া-ছাগলদের ধরে খাক, যদি না চাও, তবে তোমাকেই ওদের খাওয়াতে হবে।

— সিংহদের খাওয়াতে হবে?
ছাগলদের রাজা নিজের দাড়িটা পাকাতে থাকে।
— ঠিক আছে, আফ্রিকা, এটা মন্দ বলিসনি।
তারপর থেকে, যেখানেই আফ্রিকা ছাগল চরাতে যাক, ওর সঙ্গে শহর থেকে কেনা বড় বড় মাংসের টুকরো থাকবেই।
— এই তোর ভাগ রইল, সিংহ, আমার ভেড়াদের ছুঁসনি যেন।
ধূসর আফ্রিকার বুড়ো সিংহ মাংসের চারপাশ দিয়ে ধীরেসুস্থে ঘোরাফেরা করত।
— তুই কিন্তু ভারি মজাদার লোক, রাখাল, সত্যিই মজাদার।
আর তারপর খেতে বসে যেত।
চিতার সঙ্গে আফ্রিকার বেশ লম্বা বাতচিৎ চলেছিল। এক সন্ধেবেলা, যখন চিতাটা খুব সন্তর্পণে গুঁড়ি মেরে ভেড়ার পালের দিকে এগোচ্ছিল, আফ্রিকা বলে উঠেছিল:
— সাপের মতো আর গুঁড়ি মারতে হবে না, চিতা, আমি তোর আওয়াজ পেয়ে গেছি।
স্তম্ভিত হয়ে শুকনো ঘাসের মধ্যে থেকে মাথাটা বের করেছিল চিতা।
— কী করে পেলি রাখাল, কক্ষনো তো কেউ আমার শব্দ শুনতে পায় না!
— আমি আসছি হলদে আফ্রিকা থেকে। সেখানে কোনও শব্দ নেই, তাতেই কান তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে। যেমন ধর, আমি তোকে বলে দিতে পারি যে, দুটো ছারপোকা তোর কাঁধে চড়ে মারামারি করছে। এক কামড়ে চিতাটা দুটো ছারপোকাকেই খেয়ে ফেলল।
— তো, বলল আফ্রিকা, তোর সঙ্গে একটু কথা ছিল।
ভারি অবাক হয়ে চিতাটা বসল এবং শুনল।
— তুই হলি ভালো শিকারি, চিতা, অন্যান্য জন্তুদের চেয়ে তুই জোরে ছুটিস, বেশি দূর অব্দি দেখতে পাস। এ সমস্ত একটা ভালো রাখালেরও গুণ।
সব চুপচাপ। একটা হাতির ডাক শোনা গেল, তারপরেই বন্দুকের আওয়াজ।
— বিদেশি শিকারি ... বিড়বিড় করে আফ্রিকা।
— হ্যাঁ, ওরা ফিরে এসেছে, বলে ওঠে চিতা, কালকেই দেখেছি ওদের।
তারপর একটা বিষণ্ণ মুহূর্ত।
— চিতা, আমার সঙ্গে রাখালের কাজ করবি?

— তাতে আমার কী লাভ হবে?
আফ্রিকা অনেকক্ষণ ধরে চিতার মুখের দিকে চেয়েছিল। পুরনো চোখের জলের ধারা ওর ঠোঁটের কোণা পর্যন্ত দুটো কালো দাগ রেখে গেছে।
— তোর দরকার একটা বন্ধুর, চিতা, আর আমারও তাই।
ব্যস, চিতার সঙ্গে সম্পর্ক এইভাবেই গড়ে উঠেছিল। আফ্রিকা আর চিতা একেবারে হরিহর আত্মা বন্ধু হয়ে গেছিল।

৬

অনেক দূরের সব মাঠে চরতে যাওয়ার সময় খুব ছোট্ট ছাগলছানারা দলের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারত না। ওরা ক্লান্ত হয়ে পড়ত, পিছিয়ে পড়ত। আর হায়েনারা, যারা সর্বদা কাছেপিঠেই থাকত, মহানন্দে নিজেদের ঠোঁট চাটত। হায়েনা তাড়াতে গিয়ে চিতাকে কম ছুটোছুটি করতে হয়নি। সবচেয়ে দুর্বল ছাগলছানারা আবার ছিল সবচেয়ে সুন্দর এবং সবচেয়ে দুর্লভ। সে এক বিশেষ জাত, ছাগলদের রাজা ওদের "আমার আবিসিনিয়ার শ্বেতকপোত" বলে ডাকত। ওদের কোনও ক্ষতি হতে পারে ভেবে রাত্তিরে তার ঘুম হত না।

— রাজা, শ্বেতকপোতদের রক্ষা করার এক উপায় এসেছে মাথায়।

আফ্রিকা বুঝিয়ে বলে।

— সবচেয়ে ছোটগুলোকে রাখতে হবে একদম পিছনে।

ছাগলদের রাজা নিজের তিনটে দাড়ি ছিঁড়ে ফেলল।

— একদম একা, পিছনে, পাগল নাকি? আর হায়েনাগুলো!

— সেখানেই তো বুদ্ধি খেলাব: ছাগলছানাদের রাখব সবচেয়ে উঁচু কাঁটাঝোপের মধ্যে, তাহলেই হায়েনারা আর ওদের ছুঁতে পারবে না।

ছাগলদের রাজা চোখ বন্ধ করে খুব দ্রুত চিন্তা করে: "আচ্ছা দেখা যাক, সব ছাগলই কাঁটা চিবোয়, ওদের যা চোয়াল তাতে পেরেক গুঁড়ো করা যায়, কাঁটায় ওদের লোমের ক্ষতি হবে না, আর হায়েনার সয় না, এমন কিছু যদি থাকে, তো সে কাঁটাগাছ, নিঃসন্দেহে দারুণ বুদ্ধি।"

নিজের দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে ও আরেকবার আফ্রিকার দিকে তাকায় আর জিজ্ঞেস করে:

— আচ্ছা আফ্রিকা, তোর আগে আমার মাথায় এই বুদ্ধিটা খেলল না কেন বল দেখি?

আফ্রিকা বৃদ্ধের কুঁচকে যাওয়া, মলিন চোখের দিকে চেয়ে দেখে আর তারপর আস্তে আস্তে জবাব দেয়:

— কেননা, এখন আমি হলাম রাখাল, আর তুমি হলে রাজা।

কাঁটাঝোপের দিকে চেয়ে থাকা হায়েনার মুখটা কিন্তু দেখার মতো হয়েছিল।

— কিন্তু তা বলে, না, আফ্রিকা, আমার নাকের ডগায় এই ছাগলছানা, তাও আবার আবিসিনিয়ার শ্বেতকপোত! এরকম লোভ দেখানো, না এটা কিন্তু তুই ঠিক করছিস না!

ওর জিভ দিয়ে এমন লোল পড়েছিল, যে ওর থাবার ফাঁকে কিছু ফুলও ফুটে উঠতে পারত। আফ্রিকা ওর কপালটা ছোট্ট করে চাপড়ে দেয়:

— ফেরার সময়, তোর জন্যে সিংহের ফেলানিটুকু নিয়ে আসব। সিংহেরা সব বড়লোকদের মতো, কিছু না কিছু ফেলবেই।

চিতার আবার হায়েনার গন্ধ মোটে সহ্য হয় না, সে ভুরু কোঁচকায়:

— রাখাল, ওই "ওটার" সঙ্গে কথা না বললেই পারতিস।

— আমি সবার সঙ্গেই কথা বলি।

— ভুল করিস। "ওটার" ওপর আমার কিন্তু ভরসা নেই।

ছাগলের পাল আবার চলতে থাকে। চিতাটা শেষবারের মতো হায়েনার দিকে ঘৃণা ভরে চায় আর বলে:

— যাকগে, কোনও ক্ষতি হবে না। আমি বেঁচে থাকতে কেউ তোর একটা ছাগলকেও খাবে না।

এইভাবে সময় কাটতে থাকে। ছাগলের পাল ফুলে ফেঁপে ওঠে। ছাগলদের রাজা শান্তিতে ঘুমোয়, সক্কলে খুশি, এমনকী হায়েনাও, সে সিংহের ফেলানি পেট পুরে খায় (আবার এও দাবি করে যে, সে কাঁটাঝোপের পাশটায় থাকে কেবল আবিসিনিয়ার শ্বেতকপোতদের নিজেই পাহারা দেবে বলে। তা শুনে চিতা মাথা নাড়ে, আকাশে চোখ তোলে। "আলবাৎ বলছি", প্রতিবাদ করে হায়েনা। "আর রাখাল, শ্বেতকপোতদের যদি কিছু হয়, প্রথমে আমিই তোকে খবর দেব, বলে রাখলাম!")।

ধূসর আফ্রিকায় সব্বাই এই ক্ষুদে রাখালকে চিনত। সত্যিকারের জনপ্রিয়তা যাকে বলে।

সন্ধেবেলা আফ্রিকা যখন আগুন জ্বালাত, ওর চারধার কালো কালো ছায়ায় ভরে উঠতে বেশিক্ষণ লাগত না। চোর না, ক্ষুধার্ত পশুও না, এ ভিড় ছিল তাদের, যারা— মানুষ, পশু নির্বিশেষে— ছাগলদের রাজার ক্ষুদে রাখাল আফ্রিকার গল্প শুনতে আসত। ও তাদের বলত এক অন্য আফ্রিকার গল্প, হলদে আফ্রিকার। রহস্যজনকভাবে হারিয়ে যাওয়া উট বাসনকোসনের স্বপ্নের গল্পও তাদের শোনাত। তাছাড়া, ধূসর আফ্রিকার গল্পও বলত, যা সেখানে না জন্মালেও ও অন্যদের চেয়ে ভালো চিনে গেছিল।

— বেশ বলে না?

— কী দারুণ গল্প বলে, তাই না?

— হ্যাঁ, তা বটে, বলে ভালো!
আর ভোর হলে, সবাই যখন যে যার পথে ফিরে যেত, মনে হত ওরা সবাই একসঙ্গেই রয়েছে।

একদিন, সাভানার ধূসর গোরিলা ওর গল্পে বাধা দিল:
— আচ্ছা, রাখাল, তুই কি জানিস যে আরও একটা আফ্রিকা আছে, সবুজ আফ্রিকা, মেঘের মতো ঘন পাতায় ঢাকা উঁচু উঁচু গাছে ভরা? সেখানে আমার এক তুতো-ভাই আছে, লম্বা, গাঁট্টাগোঁট্টা, ছুঁচলো মুণ্ডু!
সবুজ আফ্রিকা? কারোরই তেমন বিশ্বাস হয় না। কিন্তু সাভানার ধূসর গোরিলাকে চট করে কেউ চটায় না ...।

আর জীবন কী আশ্চর্য! কেউ তোমায় কিছু বলল, যা তুমি আদৌ জানো না, একটা অকল্পনীয় কিছু, বিশ্বাস করা প্রায় অসম্ভব, আর, যেই না বলেছে, অমনি তুমি নিজেই তার হদিশ পেয়ে গেলে। সবুজ আফ্রিকা ... ছেলেটা শিগগিরই দেখতে চলেছে, সবুজ আফ্রিকা!

৭

সেটা ঘটেছিল এক রাতে। আফ্রিকা গল্প বলছিল। জীবজন্তুরা শুনছিল, হঠাৎ চিতা শিসিয়ে ওঠে:
— শ্ শ্ শ্!
অনেক দূর থেকে হায়েনার হাসির শব্দ ভেসে আসে। কিন্তু একটা অস্বাভাবিক হাসি। একটা ক্ষ্যাপা রাগের হাসি।
— আবিসিনিয়ার শ্বেতকপোতদের কিছু একটা হয়েছে!
চিতাটা লাফিয়ে ওঠে।
— আমি চললাম! রাখাল, ভেড়া-ছাগল নিয়ে ওখানে আমার কাছে চলে আসিস।
তারপর হাপিস হয়ে যাওয়ার ঠিক আগে:
— আমি তোকে আগেই বলেছিলাম: "ওটা"কে বিশ্বাস না করতে!
খুব ভোরে, আফ্রিকা যখন কাঁটাঝোপের কাছে পৌঁছল, ওর হৃৎপিণ্ডের ওঠাপড়া বন্ধ হয়ে গেছিল। ঝোপ খালি! হায়েনা উধাও। চিতারও দেখা নেই। চারদিকে কেবল মারামারির চিহ্ন ... আর বলাই বাহুল্য, কেউ কিচ্ছুটি জানে না। ছাগলদের রাজা তো প্রায় মরতে বসেছিল।
—আমার আবিসিনিয়ার শ্বেতকপোত! রূপের ডালি! ভুবনমোহিনী চলনফেরন! আমার চোখের মণি! এমন কী আর দুটো মেলে! চিতাদের সঙ্গে মেলামেশা করলে এই হয়! খেয়ে তো ফেলবেই! হতচ্ছাড়া রাখাল, আজই বেরো, তুই আর তোর কাঁটাঝোপের কেরদানি! দূর হ! তোর টুঁটিটা টিপে দেওয়ার আগেই পালা এখান থেকে!
এরপর ধূসর আফ্রিকায় থেকে যাওয়া? অসম্ভব। বড় কষ্টের। হলদে আফ্রিকায় ফিরে যাওয়া? বাসনকোসনকে ছাড়া? না। ছেলেটা আবার সাভানার ধূসর গোরিলার কথা ভাবে। সবুজ আফ্রিকা, "সেখানে আমার এক তুতো-ভাই থাকে ..."

— আর পথ খরচা কী করে দিবি? জানতে চেয়েছিল ট্রাকচালক।
— তোমার গাড়ি সাফ করে দেব, জবাব দিয়েছিল আফ্রিকা।
— সাফ-টাফ করার দরকার নেই। ইঞ্জিন ঠিক থাকলেই হল।
— তোমার খাবার তৈরি করে দেব।
— আমার খাবার তৈরিই আছে (কালো কালো বানরুটি আর সাদা চিজের রসদ দেখিয়ে বলেছিল ট্রাকচালক)।
— তোমাকে গল্প শোনাব।
— বাঃ, গল্প বেশ লাগে। আর তাতে জেগেও থাকা যাবে। উঠে পড়। আর যদি ফালতু বকিস তো জানলা দিয়ে ছুড়ে ফেলে দেব।
ব্যস। এইভাবেই ওরা ধূসর আফ্রিকা ছেড়ে চলে গেল। চালক যতক্ষণ গাড়ি চালাত (প্রচণ্ড গতিতে), আফ্রিকা গল্প বলত। কিন্তু বলতে বলতে ও

অন্য কথা ভাবত: ছাগলছানা, চিতা আর হায়েনার কী হল? "আমি কি এক এক করে সব বন্ধুই হারিয়ে ফেলব? আমি কি অপয়া?"
সূর্য ওঠে। অস্ত যায়। কষ্টের যাত্রা। লম্বা যাত্রা। বড্ড লম্বা। বড্ড একঘেয়ে।
ট্রাকটা ছিল একটু মিনিবাস গোছের, ভয়ানক লঝ্ঝর। তাতে আরও অন্য যাত্রীরাও উঠেছিল। চালক তাদের থেকে পয়সা নিত। অনেক পয়সা ("আমার এখানে এক গল্প বলিয়ে ছেলে আছে!")। ও অনেক লোক তুলেছিল। বড়ই বেশি। আফ্রিকা সে কথা বলেছিল চালককে:
— তোমার গাড়িতে তো অনেক লোক হয়ে গেছে, আর তুমি চালাও বড্ড জোরে ...
— চুপচাপ গল্প বলে যা!
আফ্রিকা বলে চলে। রাত দিন। রাত্রিবেলা ও দেখত সব চোখেরা ওর গল্প শুনছে।
তারপর এক সকালে, সকলের বুকের ভেতর থেকে বিরাট এক চিৎকার বেরিয়ে এল। ওই ওখানে, শুকনো ফাটা মাটির সমুদ্রের ওপারে, ক্রান্তীয় অরণ্যের সবুজ চুড়োটা দেখা দিয়েছিল। সবুজ আফ্রিকা! সাভানার ধূসর গোরিলা তবে মিথ্যে বলেনি।
আনন্দে চিৎকার করতে করতে সকলে জানলায় হুমড়ি খেয়ে পড়ল। চালক গতি আরও বাড়িয়ে দিল। প্রচণ্ড গতিতে ওরা ঢুকে পড়ল বনের মধ্যে। আর তারপর যা হয়, বিশাল বিশাল ফার্নে ঘেরা একটা বাঁকে এসে মিনিবাসটা পথ থেকে ছিটকে গিয়ে পড়ল উল্টে। লোহালক্কর আর ইঞ্জিনের বিকট আওয়াজ।
জ্ঞান হারানোর আগে আফ্রিকা শেষ যে দৃশ্য দেখেছিল, তা হল মিনিবাসটা, বুড়ো একটা গুবড়ে পোকার মতো চিৎপটাং, তার দুমড়ে যাওয়া চার চাকা শূন্যে ঘুরছে।

ছবি: কুরচি দাশগুপ্ত

ক্রমশ

হেঁয়ালির ছন্দ

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

মহাভারতকার তাঁর আঠারো-পর্ব কাব্য বলবেন মুখে মুখে, গণেশ ঠাকুর লিখে তুলবেন পুঁথি করে—এই ছিল কথা। কিন্তু যদি বলায় ছেদ পড়ে একবারও? গণেশ বললেন, তখুনি ইতি বলে উঠে পড়বেন তিনি পুঁথিপাটা ছেড়ে। তাই সই। তবে ঠাকুর, একটা ধারা জোড়া হোক— মাছিমারা নকল চলবে না, প্রত্যেকটি কথা বুঝে-পড়ে তবে লিখতে হবে। কিংবদন্তিতে পাই, তাইতেই মহাভারতের দশ পা না চলতে এত কূট আর হেঁয়ালি শ্লোকের ছড়াছড়ি। সর্বশাস্ত্রজ্ঞ কবি-পণ্ডিত হলেন ব্যাসদেব, তাঁর কথার জট ছাড়িয়ে গণেশঠাকুরকেও রয়ে বসে এগতে হয়, আর সেই ফাঁকে এগিয়ে চলে লেখা।

লোকস্মৃতি, যা নিয়ে ফোকলোর-বিদ্যা, তার বিপুল উপকরণের একটা বড় ভাগ ছড়া-প্রবাদ-হেঁয়ালির ভাগ। হেঁয়ালি— সেও বহুলতই হেঁয়ালি ছড়া। একটু ভাষার বাঁক আর একটু ছন্দের দোলা দুয়ে জোড়া হয়ে সে হয়েছে স্মরণযোগ্য, উপভোগ্য।

বিদেশেও হেঁয়ালির খেলা দেখতে পাই পার্লার গেমের মধ্যে। কিন্তু দেশ-বিদেশের ধাঁধা-হেঁয়ালির যত সঞ্চয় আজ স্তূপিত হয়ে উঠেছে তার প্রায়টাই পুরনো লোকস্মৃতি। লোকমুখের সেসব হেঁয়ালি-কথার ওপরে সংগ্রাহকের ভাষার ছন্দের দাগরাজি চড়েছে কোথাও, অন্তঃকরণ তাতে হয়তো বদলায়নি।

।। ১ ।।
মামার বাগান ভরে
হলুদ পাখি,
তালি দি— ওড়ে না, সে কী!
ব্যাপারটা কী!
ধাওয়া দি— ও মা সে পাখি
ফুর্তি ক'রে
দোলে, লাল হয়ে ওঠে
গাছটা ভরে!

।। ২ ।।
পোষা পাখি, তাকে খেতে দেয়া মিছেমিছি,
দুটো পা-য় পিষে খায় সে পাথর-বিচি।
দানা না, পানি না, কিছু না, কেবল তার
থেকে থেকে দুটো ঢিল-বিচি দরকার।

।। ৩ ।।
আঠা নেই, ফোঁড়া নেই,
শত পরত বাঁধা।
লাল শালটা দেবো, যদি
ভাঙতে পারো ধাঁধা।

।। ৪ ।।
কালো বাইরে, লাল মাঝটা,
চার মোড় দেয়া গোল ধাঁচটা!
কাছে যাও, চায় দাঁত খিঁচিয়ে!
সেবা করতেও নয় পিছিয়ে।

।। ৫ ।।
সাত রাজ্যির সাতাশ রাঁধনা
একাই মরে রেঁধে।
পারলে পারে খেতেও! সবাই
অমনি রাখে বেঁধে।

।। ৬ ।।
হাটে যাও যদি যেয়ো গো শিগ্রি,
কিনে এনো বাপু দুটি সামিগ্রি—
ফটিক ঝিকিমিকি পিপুল পাত,
কিনে এনো দুটো হাতির দাঁত।

।। ৭ ।।
ডোবে যেন শিলা— ভাসে যেন শোলা—
হাতে-পায়ে ঠিক যেন মানষের পোলা,
বসে যেন মামাদের গলা-উঁচু কুকুর—
ভাঙানি দেও তো খোকা? বলো দিকি খুকু?

।। ৮ ।।
তিন সন্নেসি
ঘুরছেন বনে,
তিন মধুফল
ঝুলছে বিজনে,
তিনে পেড়ে নিয়ে
গেলেন সে ফল—
দুটো ফল তাও
দুলছে তেমনই।

।। ৯ ।।
এক সে কামার— ছোটোমোটো, বিনি হাতে
রাত দিন খাটে, অসাধ্যি খাটা খাটে।
বিনি আগুনেই চুলো করে জ্বলা-নেবা।
বলে, সে-ই তার লোকসেবা, দেবসেবা।

।। ১০ ।।
সবজে হলুদ বেগনি— লাল চুঁ-য়া—
রাজা ছুঁতে পারেন না, রানীও না!
মস্ত মস্ত মন্ত্রী— তাঁরাও ফেল।
দশ গুনছি— বলো তো, দেখি আক্কেল!

।। ১১ ।।
উইঢিবির ওপরে গাছ,
গাছে পাখির বাসা,
বাসার মাঝে ডিম্ব শোভে
খাসা!

।। ১২ ।।
ঢ্যাঙা দড়ি-ঘাস দাঁতে কেটে যাস
এ মুড়ো সে মুড়ো এ পাশ সে পাশ—
বনবেড়াল না? বনবেড়ালই তো!
এত কাজ দিলি, মজুরি নিবি তো।

উত্তর:
(১) *লেবু। তামিল।* (২) জাঁতি। *মারাঠি।* (৩) বাঁধাকপি। *বিলিতি।* (৪) উনুন। *বিলিতি।* (৫) আগুন।... (৬) পান আর সাদা মুলো। *রাজবংশী।* (৭) ব্যাঙ। *রাজবংশী।* (৮) তিনে নামে এক সন্ন্যাসী। *ফরাসি।* (৯) মৌমাছি। *বিলিতি।* (১০) রামধনু। *বিলিতি।* (১১) নারকোল ছড়া।... (১২) ঘাস-মউনি কাঁচি। *শোনা।*

এক আশ্চর্য বইয়ের পরমাশ্চর্য MP3 সিডি

অবাক করা
গানে-সুরে
বাদ্যি-বাজনায়
অভিনয়ে
জমজমাট
প্রায় দু'ঘণ্টার
MP3 সিডি

হীরু ডাকাত

ছন্দে-কথায়, গানে-বাজনায়, অভিনয়ে-কথকতায়

সব বয়সের ছোটদের মস্ত বড় আনন্দের আয়োজন

মূল রচনা ও শ্রুতিনাট্যরূপ: **অমরেন্দ্র চক্রবর্তী**
সংগীত ও পরিচালনা: **দীপক চৌধুরী**
অভিনয়: **সন্তু মুখোপাধ্যায়, বিভাস চক্রবর্তী, মেঘনাদ ভট্টাচার্য, নীলকণ্ঠ সেনগুপ্ত, দ্বিজেন বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবেশ রায়চৌধুরী ও আরও অনেকে**
ভাষ্যপাঠ: **অনসূয়া মজুমদার**
গান: **স্বপন বসু ও আরও অনেকে**

অনলাইনে পেতে www.swarnakshar.in লগ অন করুন

সিম্ফনি, মিউজিক ওয়ার্ল্ড ও অন্যান্য ক্যাসেটের দোকানে পাবেন। ₹৯৯

স্বর্ণাক্ষর
Swarnakshar Prakasani Private Limited
29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-700 019
Phone: 2280-8818 **Fax:** 2287-6448
Email: books@swarnakshar.in **Website:** www.swarnakshar.in

KALER KASHTIPATHAR □ Vol. 1 No. 7 □ 16 November 2012 □ Rs. 30 Title Code: WBBEN 14529/25/1/2012-TC □ Declaration No. 185 dt. 05/09/12

ভ্রমণ

বেরিয়ে পড়ার আসল গাইড, ঘরে বসেও মানসভ্রমণ

No. 1 Travel Magazine in India with the largest readership*

Available at Newsstand, also with Newspaper Hawker, OR

Subscribe Online ▶ www.swarnakshar.in

*Source: IRS (Indian Readership Survey) 2012 Q2

Website: www.bhraman.com □ www.ebhraman.com